হাসিয়া জীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন "আচ্ছা কেশব তোর চাকুরিটি কেন গেল বল্ দেখি ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেশবের যে অত্যধিক আগ্রহ সব-সময়েই প্রকাশ পাইত, তাহা সকলেরই জানা ছিল। তাই কেশবের সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই গ্রামের লোক মজা দেখিবার জন্য তাহাকে এই প্রশ্ন প্রথমেই করিত।

কেশব বিনয়-প্রকাশ করিয়া উত্তর করিল "সে কথা আর তুলে' লাভ কি বাবু।"

"কেন-রে ?"

"যে কোন কারণেই হোক্, সে কথা আর বল্তে চাইনে। কেউ হয়ত বল্বে, দোষী আমিই ; গায়ের জোর রাখ্বার জায়গা পাইনে ; কিন্তু ভগবান্ জানেন আমি নির্দ্দোষ,—আর এতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিতও নই ! ভগবানই হয়ত আমায় চাকরি থেকে রেহাই দিয়েছেন ; চাকুরি কি বাবু মানুষে করে ?"

হাসিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "যারা চাকুরি করে, তারা কি তবে সবাই অমানুষ—কেশব ?"

অপ্রতিভ-ভাবে কেশব উত্তর করিল "সে আমি কি জানি ; যারা চাকুরি করে, তারাই, সেটা ভাল বোঝে !—তা' ছাড়া, ওটা একটা কথার কথা বল্লুম বৈ-ত নয়, ছোটবাবু !"

"তাই বুঝি চাকুরি ছেড়ে 'গাজনে' মন দিয়েছিস্?

কেশব মৌন হইয়া রহিল; জীবনকৃষ্ণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "সে ভালই, কেননা, সারাদিন খেটেখুটে একটু আমোদ করার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিকই; কিন্তু কেশব, শুনলুম এ সব গাজন-টাজনে শিবঠাকুরের নামে সিদ্ধি-টিদ্ধিরও সদ্ব্যবহার তোমরা করে থাকো?"

কেশব মাথা নীচু করিয়া মৃদু-স্বরে উত্তর করিল "সারা-দিনের খাটুনিতে—এলিয়ে পড়া দেহটাকে একটু চাঙ্গা করে নিতে—"

বাধা দিয়া, দৃঢ়তার সহিত জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "না কেশব, গাঁজা-ভাঙ্ এ গুলো খাওয়া পাপ! শরীরটাকে সতেজ রাখবার ওজুহাতে বিষ খাওয়া অভ্যাস করা কি ঠিক্?"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন "আমাদের এ গরিব দেশে সকলের একবেলা রীতি-মত অন্ন জুটে না; অনশনে-অর্দ্ধাশনে, আর ছেড়া-কাপড় পরে কোনও মতে লজ্জাসরম ঢেকে রাখ্‌তে হয়! এর উপরে উচ্ছন্ন যাবার জন্যে নেশা করাটা কি খুব দুঃখের বিষয় নয়?"

অনুচ্চস্বরে কেশব উত্তর করিল "বিলেত হতে যে সকল বোতলের আম্‌দানী হয়ে থাকে, তার সবই ত এ গরীব দেশে উজাড় হয়ে থাকে—ছোটবাবু! তার অনুপাতে আমাদের

একটু-আধটু নেশা আর তেমন কি বেশী? তবে হাঁ, সেগুলো সব বড়লোকদের ভোগের জন্য! ছোটলোক তার সোয়াদ পাবে কেমন করে?"

"আদার বেপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি কেশব? তোরা গরীব; গরীবের কথাই তোদের ভাবা উচিত? যে পয়সাটুকু নেশাতে তোদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাতে দুবেলা, চারিটি ভাত পেটভরে তোরা নিশ্চয়ই খেতে পেতিস্!"

লজ্জা পাইয়া কেশব উত্তর খুঁজিয়া পাইল না—মাথা নীচু করিয়া নীরবে রহিল।

জীবনকৃষ্ণ আর বেশী কথা না বলিয়া, গোটা দুয়েক গাজনের গান বাঁধিয়া কেশবের হাতে দিলেন;—রাত অধিক হইয়াছে বলিয়া কেশবের দল ছোট কর্ত্তাবাবুকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল।

আহ্নিক সারিয়া ঠাকুর-দালান হইতে হরিমোহিনী জীবনকৃষ্ণকে ডাকিয়া জানাইলেন "ভাত দেওয়া হয়েছে!"

হরিমোহিনী এ বাড়ীর শিষ্যা। বাল্যকালে বিধবা হইয়া স্বামীর তিনকুলে আর কেহ না থাকায়, যথা সর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়া গুরু-গৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন। জীবনকৃষ্ণের অগ্রজ জগৎকিশোরের নিকট হইতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিষ্যা হইলেও এ বাড়ীতে হরিমোহিনীর প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। পূজাপার্ব্বণে, বৈষয়িক পরামর্শে, অতিথি-অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় হরিমোহিনীর ব্যবস্থাই সকলের আগে চলিত। বহুদিন ধরিয়া বাস করায়, এ বাড়ী তাঁহার স্বগৃহেরই মত মনে হইত! দিনে ত্রি-সন্ধ্যা, প্রত্যূষে ঠাকুরের জন্য পুষ্পচয়ন, মধ্যাহ্নে গুরুদেবের চরণামৃত পান এবং আহারাদির পর অপরাহ্নে তত্ত্বকথা শ্রবণ তাঁহার অবশ্য করণীয় নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল।

---

(২)

জীবনকৃষ্ণ আহারে বসিলে বিনা-ভূমিকায়ই জগত্তারিণী বলিলেন "আচ্ছা, ঠাকুরপো, তোমায় কতকরে বল্‌ছি যে আরো একটি বিয়ে কর; কিন্তু কিছুতেই তা'তে কান দিচ্ছ না। আমাদের কথাগুলোর দাম কি কিছুমাত্র নেই?"

জীবনকৃষ্ণের পিছনে হরিমোহিনীও সেখানে আসিয়াছিলেন। কর্ত্রী-মা'র কথার সমর্থন করিয়া তিনিও বলিলেন "আমিও মা, ঐ কথাটি ওঁকে কত করে বলেছি—একটা ছেলে পিলের পিত্যেশ কে না করে?"

ঈষৎ রুষ্ট-ভাব প্রকাশ করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "অনেক অনুরোধ-উপরোধই করা হ'ল, কিন্তু কিছুতেই তা' যেন গেরাহ্যির মধ্যে আস্‌ছে না!—আজ 'সাম্‌না-সাম্‌নিই কথাটা পাড়া গেল—দেখা যাক্ কি আদেশ হয়!"

হরিমোহিনী বলিলেন "সত্যি মা, বড়কর্ত্তাপ্রভু একটি কথা বল্‌লেই ওঁর কি আর অসম্মতি হয়; দাদার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি ওঁর।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটু দুঃখিত ভাবে জগত্তারিণী বলিলেন "না-বলুন নাই; আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ; ওঁদের মনের কথার আমরা কি বুঝি!"

আহারে বসিয়াছিলেন জগৎকিশোর, তাঁহার এগার বছরের ছেলে কুমার আর জীবনকৃষ্ণ! এমনি জীবনকৃষ্ণ আলাপে ব্যবহারে জগত্তারিণীকে বিশেষ সম্ভ্রম করিয়া চলিতেন, তদুপরি দাদার সাম্‌নে ত তিনি একেবারে বলির ছাগ। জীবনকৃষ্ণ এ প্রৌঢ় বয়সেও অগ্রজের চোখে চোখে চাহিয়া কথা বলিতেন না; তাই আজ জগৎকিশোরের সাম্‌নে জগত্তারিণীর কোনও কথার উত্তর করাই জীবনকৃষ্ণের অসম্ভব হইল। নাকে-মুখে কোনও রকমে চারিটা ভাত ত্রস্তে গুঁজিয়া উঠিয়া যাওয়ার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বুভুক্ষায় পরিতৃপ্তির অন্ন তাহার কাছে বিষ বোধ হইতে লাগিল। জগত্তারিণী বুদ্ধিমতী; প্রশ্নে-প্রশ্নে জ্বালাতন করিয়া তুলিলেও এক্ষেত্রে যে বিন্দুমাত্র উত্তরের প্রত্যাশা করেন না, ইহা তিনি আগে হইতেই জানিতেন! সুতরাং আর বিশেষ কিছুই বলিলেন না, শুধু পরিবেশন করিতে করিতে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন কেমন করিয়া তিনটি প্রাণীর অত্যধিক মনোযোগের সহিত নীরবে আহার-কার্য্য সমাধা হইতেছে; আর, একটা কথাও

দেবী

বলিতে না পারার উদ্বেগ কিরূপে জীবনকৃষ্ণের আহার পং করিয়া কঠোর পীড়া দিতেছে!

এতগুলি কথাবার্ত্তার মধ্যেও কিন্তু জগৎকিশোর টুঁ শব্দটি করিলেন না। সময়ে সময়ে তিনি একটু বেশীরকমেই গম্ভীর হইয়া পড়িতেন, এবং তাঁহার এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য জগ-ত্তারিণীকে অল্প-বিস্তর পীড়িত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিত।

কর্ত্তাদের আহার হইয়া গেলে, জগত্তারিণী স্বামীর পাতে ভাত বাড়িয়া লইয়া, খাইতে বসিলেন; কিন্তু খাইতে বসিয়া একা তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, ছোট-জা কল্যাণীর আজ পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়ার দরুণ মন খানা কেমন শূন্য বোধ হইতেছিল।

খাইতে রুচি না হওয়ায় জগত্তারিণী আন্‌মনে বসিয়া মাখা ভাতগুলি থালার উপর হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে সন্তর্পণে জীবনকৃষ্ণ ঘরে ঢুকিলেন। জগত্তারিণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"একি ঠাকুরপো! এখনও ঘুমোও নি যে?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "বৌদি! একটা কথা তোমায় বল্‌বো—অপরাধ নেবেনাত?"

"অপরাধের না হলেও, অপরাধ নেওয়ার মতন ততটা পাগল ত আর আমি এখনও হইনি"।

"অপরাধের না হলেও, খুব স্বাভাবিকও নয় বলেই, কথাটা বল্‌তে একটু বাধা-বাধা ঠেক্‌ছে।"

জগত্তারিণী উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নীরব রহিলেন; জীবনকৃষ্ণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "বৌদি! মাঝখানে একটা বাজে কথা তোমায় বলি;—একজন ইংরেজ কবি একখানা খুব বই লিখেছেন; সে খবর তুমি অবশ্য জান না; তবে এটা হয়ত তোমার বুঝতে বেগ পেতে হবে না যে, তিনি তাতে দেখিয়েছেন—একটা প্রবল আবেগ মানুষের বুকে চেপে রাখ্‌লে তার প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হতে পারে!"

অসহিষ্ণু হইয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তোমার অত শত ভূমিকা সরিয়ে রেখে, আসল কথাটা কি খুলেই বলে ফেলো শুনি!"

জীবনকৃষ্ণ কথাটা একচোটেই বলিয়া ফেলিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে গিয়া কথাটা তাঁহার কাছে এমনি বে-মানানো লাগিতেছিল যে কিছুতেই সহজে ইহা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল না; তাই আরম্ভ করিতে গিয়াই অনেকগুলি বাজে কথা বাহির হইয়া পড়িল। তবু আজ তার বলা চাই-ই! তাই কাসিয়া গলাটাকে একটু সরল করিয়া তিনি বলিলেন "আচ্ছা বৌ-দি, কেউ যদি এসে তোমায়

বলে, দাদা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তোমার আরও একটি বিয়ে হোক্, এ তা'হলে তোমার কেমন লাগে ?"

"এই অপ্রিয় কথাটা বল্‌বার জন্যই বুঝি তোমার অত ভূমিকা করা হচ্ছিল ?"

"আমার স্ত্রী বর্ত্তমান থাক্‌তে তবে, আরও একটি বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি কেন কর শুনি ?"

"ছেলেপিলে না হলে, পুরুষমানুষ অনেকবারই বিয়ে করতে পারে, সেত শাস্তরেরই কথা ; কিন্তু স্বামী থাক্‌তে মেয়েদের অনেক বিয়ে, এ অনাছিষ্টি কথা তোমায় কে শেখালে বল্‌তে ?"

কথাগুলি যদিও তীব্র বিতৃষ্ণার ভাবেই জগত্তারিণী বলিয়াছিলেন, তথাপি সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "শোন বৌ-দি! পদে পদে শাস্ত্রের সমাজের-ধর্ম্মের কথা তোমরা আওড়াও, যেন তোমরা জাননা এমন কিছুই এ জগতে নাই। কিন্তু যদি বুঝতে, কত'টা তোমাদের জানার বাইরেও রয়েছে, তা'হলে আর এসব আজগুবি কথা বল্‌তে ইচ্ছা হতো না। তোমরা কি মনে কর, শাস্ত্র, যুক্তি তর্কের বাইরে—একটা যাচ্ছেতাই, খামখেয়ালী। কিন্তু, তা' নয়, শাস্ত্র, যথার্থই নানা বহুদর্শিতার, নানা চিন্তা গবেষণার ফল। সুতরাং ইহা যুক্তিতর্কের

বাহিরে নয় ; যা কিছু ব্যতিক্রম, তা আমাদের আচরণের জন্যেই হয়ে থাকে।

অবাক্ বিস্ময়ে জগত্তারিণী বলিলেন, "তবে কি যা' সমাজ করে তা' শাস্ত্রে বলে না ?"

"বলেনা ঠিক নয় ; তবে অনেকটা বলে আর অনেকটা না ? যেটা আমাদের স্বার্থ-সিদ্ধির প্রতিকূল, তার জন্য আমরা একটা মনগড়া শাস্ত্র তৈয়ারী করতে কিছুমাত্র ইতঃস্তত করিনে !"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন" এই ধর-না তোমাদের নারী-জাতির কথা ; সমাজে তোমরা পুরুষের বিলাস-সামগ্রী, আর শাস্ত্রে তোমরা জগদ্বিকাশের আদিরূপা !—নিজ স্বার্থসিদ্ধির এমন অমোঘ অস্ত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে বলতো ?"

এ সব কথার উত্তরে কি বলিবার আছে স্থির করিতে না পারিয়া জগত্তারিণী অবাক নেত্রে জীবনকৃষ্ণের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, আর জীবনকৃষ্ণ অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিলেন "মেয়েদের উন্নতির পথ থেকে বঞ্চিত করে যে কি ঘোর অহিত-সাধন আমরা নিজেদের করছি ; আজিকার এই নানা সমস্যার দিনে, তা আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দরকার করে না বৌ-দি !"

"সে অহিতটা কি ঠাকুর পো ?"

অহিত অনেক কিছু। তবে একটা কথা বলি শোন ছোট ছোট শিশুরাই বড় হয়ে দেশের ভবিষ্যৎ তৈরী করে আর, তাদের শিক্ষার দায়িত্ব প্রথমে তোমাদেরই হাতে থাকে তাই দেশের উন্নতির জন্য তোমাদের কর্ত্তব্য কত গুরুত্ব ভেবে দেখ দেখি ? আর তোমরাই যদি ঠিক্-ঠিক্ তৈরী না হও, তবে তারাই বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠবে কেমন করে ?"

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া জীবনকৃষ্ণ আবেগের সুরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন "বল্‌তে মনে দুঃখ হয়, সংসারকে সমাজকে সুদৃঢ় কর্‌তে হলে, চলনশীলতার ঘাত প্রতিঘাত সয়ে যাওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তা আমাদের মোটেই নেই বলেই অভাবটা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে !"

বিরক্তির সুরে জগত্তারিণী বলিলেন "ও সব বক্তিমা ছেড়ে দিয়ে, কথাটা স্পষ্ট করে বল্‌লে কিছু দোষ নেইত ?"

"স্পষ্ট আর কি বল্‌বো ! এই ধর-না, আমার এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাক্‌তেও আর এক বিয়ের জন্য তোমরা পীড়া-পীড়ি কর্‌ছো ! কিন্তু এতে পরে যে কি ভীষণ বিষের সৃষ্টি হতে পারে, সে চিন্তাত কস্মিন্ কালেও তোমাদের মনে জাগে না আমাদের মাঝে সব চেয়ে বড় ধার্ম্মিক সে, যার "ষাট্‌-বছরে

আছে পঞ্চম পক্ষ ;" আর তিনি অসতী, যিনি সঙ্গত কারণে আবার বিবাহিত হতে ইচ্ছে করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত আন্দোলন উদ্দাম হয়ে ওঠে !"

"বিধবার বিবাহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর ?"

"মঙ্গলকর কি নয়, সে কথা আলোচনা করার সময় এ নয়, তবে একথা জোর করে বলা চলে যে, বিধবা-বিবাহ সত্যি সত্যিই যদি সমাজের মঙ্গল-সাধনের অন্তরায় হয়, তবে পুরুষের বহু বিবাহও কোনও দিক দিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করে না।"

"তা যেন হলো, কিন্তু যদি কারো সন্তানাদি না হয় ?"

জগত্তারিণী আন্তরিক বিশ্বাসের সহিতই কথাটা বলিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ কথাটাকে এমনি হাল্কা ভাবে গ্রহণ করিলেন যে, বস্তুতঃ ইহার একটা কিছু বিদ্রোহ সূচক উত্তর দিবার প্রেরণা তাঁহার মনেই আসিল না ; তাই অনাকৃষ্ট ভাবে তিনি বলিলেন "সে'ত ভগবানেরই অভিপ্রায়, তার জন্য একটা নিরীহ প্রাণীকে প্রত্যাখ্যান কিংবা উপেক্ষা করা কি উচিত ?"

তারপর জগত্তারিণীর কথায় তাঁহার সম্বন্ধে একটা গোপন ইঙ্গিত অনুভব করিয়া একটু সলজ্জ হাসিয়া তিনি বলিলেন

"বুঝেছি বৌ-দি! আমার পরকালের নরকযন্ত্রণার আতঙ্কই তোমাদের এমনধারা ব্যাকুল করে' তুলেছে; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে গুলো থাকা সত্বেও কি পুন্নাম-নরক হতে আমার পরিত্রাণ হবে না?"

বিরাট্ ঝঞ্ঝাবর্ত্তের অবসানে মহাসাগর যেমন শান্ত প্রকৃতি ধারণ করে, জীবনকৃষ্ণও উদ্দাম আবেগ নিঃশেষে উদ্গীরণ করিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাহার আরো বক্তব্য থাকিলেও তিনি কিছুতেই যেন কথা বলিতে পারিতেছিলেন না—ক্লান্তিতে তাঁহার চোখ দুটিও ঢুলিয়া পড়িতেছিল! জগত্তারিণী এ ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন "তোমার যুক্তি-তর্কের ভাঁড়ারটা আজই সমুদয় উজাড় করে দিয়োনা যেন —ভবিষ্যতের প্রয়োজন কতক সঞ্চয় রাখা মন্দ নয়! রাত অনেক হয়েছে এখন শোওগে যাও!"

———

(৩)

জগৎকিশোর ও জীবনকৃষ্ণ সহোদর ভাই। জগৎকিশোরের জন্মের পর তাঁহার আরও চারি ভগ্নীর জন্ম হয়। জীবনকৃষ্ণ সর্ব্ব কনিষ্ঠ, তাই তিনি অগ্রজ হইতে প্রায় সতের বছরের ছোট। তাঁহাদের নিবাস শ্রীহট্ট জিলায়—ভট্টপল্লী গ্রামে। প্রচলিত কথায় লোকে ইহাকে ভট্-পাড়া বলিয়া থাকে।

গ্রামখানি দেখিতে মনোহর, এবং স্বাস্থ্যকরও বটে। গ্রামের মাঝখানে দিয়া যে বড় রাস্তা গিয়াছে, তাহারই দুই ধারে সারিবদ্ধ-ভাবে সাজানো বাড়ীগুলি; তাহাতে ইট্-কাঠের ইমারত্ নাই—অভ্রভেদী প্রাসাদ-রাজি ধনীর গর্ব্ব প্রকাশ করে না; ইহারা সহজ সরল কুটিরাবলী,—দারিদ্র্যের ব্যঞ্জক! গ্রামটি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে অবস্থিত এবং সেইজন্য বর্ষার বারি বর্ষণে যখন সমস্ত আবর্জ্জনা ধুইয়া লইয়া যায়, তখন গ্রামখানাকে একখানা বসন্ত-প্রাতের কুসুমোদ্যানের মত সতেজ ও হাস্যময় দেখায়! প্রকৃতির এই বিমোহনী সহজ শোভা পথিকের চিত্ত আকর্ষণ না করিয়া ছাড়েনা।

গ্রামের মাঝে ধানের ক্ষেত নাই ; তা' সত্ত্বেও 'রৌদ্র-ছায়ার' লুকোচুরি খেলার অভাব এ গ্রামে অনুভূত হয় না ; স্থানে স্থানে বায়ুর হিল্লোলে যখন বাঁশবন নাচিয়া উঠে, তখন ঐ বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে যেন 'রৌদ্র-ছায়া' পুলকে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিয়া দেয়। পুকুর-পাড়ের সারি-সারি কদম্ব-ফুলের গাছ হইতে ফুলের রেণু জলের উপর ঝরিয়া পড়িয়া, এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটাইয়া তুলে! তদ্ভিন্ন, দিবানিশি মাথায় 'জট' ধারণ করিয়া একটি প্রধান বটও সে গ্রামে আছে, আর কোন কালের ভূমিকম্পে ধ্বংস-প্রাপ্ত শিবমন্দিরের একটি লতা-গুল্মে জড়িত ইষ্টক-স্তূপ তাহারই পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যায়।

এই গ্রামেই জগৎকিশোরের বাস। অবস্থায় না হউক বিদ্যার গৌরবে জ্ঞাতি চারি ঘরের মধ্যেই জগৎকিশোরের ঘর-খানা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। শৈশবে জগৎকিশোর পিতার টোলেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিষ্য-সেবকে যাজনাদির দ্বারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহে তিনি পিতার সাহায্য করিতেন এবং পিতৃবিয়োগের পরে নিজেই এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া কিছুদিন অধ্যাপনা কার্য্যও করিয়াছিলেন।

কাব্য-সাহিত্যে জগৎকিশোরের জ্ঞান ছিল অগাধ। তিনি নিজেও ছিলেন একজন কবি ; তাঁহার রচনা ছিল প্রাঞ্জল

ভাব ছিল গম্ভীর এবং সুললিত, আর তাঁহার চরিত্র ছিল অনন্য সাধারণ মহৎ! অর্থের অসচ্ছলতা, পরিবারের অন্ন-সংস্থান-চিন্তা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ ব্যস্ত করিলেও ব্যাকুল করিতে পারিত না। প্রত্যূষে উঠিয়া ঠাকুরের পুষ্পচয়ন, সাজ-সজ্জা, পূজা অর্চ্চনাদিতেই দিবসের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত, অবশিষ্ট সময়টুকু তিনি কবিতাদি রচনা করিয়াই কাটাইয়া দিতেন। বাড়ীর কাহারও মারাত্মক অসুখ-বিসুখ পর্য্যন্ত তাঁহাকে টলাইতে পারিত না; শুধু 'মদনমোহনের' দুয়ারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ধৈর্য্যে আপনার আর্ত্ততা নিবেদন করিয়া দিতেন! ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া তিনি যে নানা প্রকার ফুল তুলিয়া আনিতেন, শিষ্যা হারমোহিনী ভক্তির সহিত সেইগুলি দিয়া সুন্দর মালা গাঁথিতেন, আর সেই মালা জগৎকিশোর মদনমোহনের গলায় পরাইয়া দিয়া পরমানন্দে ঠাকুরের রূপ-সুধা পান করিতেন! দাস্য অপেক্ষা সখ্য ভাবই তাঁহার ভক্তিতে অধিক মাত্রায় প্রকট হইত।

জগৎকিশোরের প্রথমা ভগিনী হৈমবতী, স্বামী কি বস্তু চিনিবার আগেই ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পরপর দুইটি মৃত সন্তান প্রসব করার পর জীবনকৃষ্ণের আগে জগৎ-কিশোরের মাতা মহামায়াকে পান। ভগিনীদের মধ্যে এখন একমাত্র মহামায়াদেবীই বাঁচিয়া আছেন। জীবনকৃষ্ণ যখন

জন্ম গ্রহণ করেন তখন অনবরত দুর্ভিক্ষে ও রাজনৈতিক বিপ্লবাদিতে দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই জগৎকিশোরের পিতা রামলোচন বিদ্যানিধি পৈতৃক জমী-জমা কতক বিক্রী, কতক বন্ধক ইত্যাদি দ্বারা কষ্টে সংসার চালাইতেছিলেন।

জীবনকৃষ্ণের প্রতিভা ছিল অসাধারণ! ইহা লক্ষ্য করিয়াই অর্থের অসচ্ছলতা সত্ত্বেও গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মনোবৃত্তির প্রতিকূলে বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহাকে ইংরেজী স্কুলে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এন্ট্রেন্স-পরীক্ষা দিবার মুখেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং দিনকয়েকের মধ্যেই তাঁহার মাতাও স্বামীর অনুগমন করেন। পরপর এই দুইটি দুর্ঘটনায় জগৎ-কিশোর দারুণ ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন; কাজেই বাধ্য হইয়া জীবনকৃষ্ণকে পড়াশুনা ছাড়িয়া সংসারের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইল।

ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে জীবনকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল। অন্নের সংস্থান থাকুক আর নাই থাকুক বাঙ্গালী-পরিবারে বিবাহ জিনিষটার অসদ্ভাব নাই, বরং তৎপ্রতি একটা চমৎকার মোহই আছে! ছেলে জন্মিবামাত্রই, রাঙ্গাপাণা বৌ আনার কল্পনা পরিবারস্থ লোকের মনে জাগে। তাই, জগৎ-কিশোরের সংসারে যদিও বিপুল অভাব অনটন ছিল, অর্থাভাবে

যদিও জীবনকৃষ্ণের পড়াশোনা পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল, তথাপি যখন শুভ মুহূর্তে জীবনকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল, তখন তাহার বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর !

জীবনকৃষ্ণের বিবাহের দুই বৎসর অতীত হইলে, জগৎ-কিশোরের প্রথমা কন্যা অন্নপূর্ণার জন্ম হয়, তৎপর একটি পুত্র জন্মে, তাহার নাম জয়কুমার ; সে এখন এগার বছরের। তার পরে আর একটি শিশুপুত্রের জন্ম হয়, যাহাকে দত্তক নেবার জন্য নিঃসন্তান জীবনকৃষ্ণ জগত্তারিণীর সহিত একদিন সবিষাদ রসিকতা করিয়াছিলেন।

জীবনকৃষ্ণের ইহা সৌভাগ্যই বলিতে হইবে, যে পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহারা যখন নিদারুণ অর্থাভাবে পড়িয়াছিলেন, তখন গ্রামের দশজনের সুপারিশে তত্রত্য ইংরাজী ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে নিয়োজিত হইলেন। সেই অবধি তিনি সেই ইস্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন।

চৈত্রের এক রুদ্র অপরাহ্ণে ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনকৃষ্ণ আপনার ঘর্ম্মসিক্ত জামা কাপড়গুলি, অতিষ্ঠ হইয়া ছাড়িয়া ফেলিতেছিলেন, এমন সময় হাসিতে হাসিতে মহেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ; জীবনকৃষ্ণের সমবয়স্ক ও এক গ্রামবাসী। কোনও বিশেষ রক্ত-সম্পর্ক না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে আবাল্য এক অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতার বন্ধন ছিল।

মহেন্দ্রনাথকে গ্রামের অনেকেই সুনজরে দেখিতেন না। বোধ হয়, ইহা মহেন্দ্রনাথের পরোপকার—প্রবৃত্তি বলিয়া একটা গুণ ছিল বলিয়াই! গ্রামের শিশু-বৃদ্ধ-যুবক, সকল

মহলেই তাঁহার সমানভাবে অবাধগতি ছিল। বক্তব্য থাকুক আর নাই থাকুক সভাসমিতিতে বক্তৃতাদান, সেবা-সমিতি সদনুষ্ঠানের চাঁদা সংগ্রহ, রোগীর সুশ্রূষায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ তাঁহার যেমনটি ছিল, তেমনটি প্রায় সচরাচর দেখা যাইত না। নিজের অবস্থা যদিও সচ্ছল ছিল না, তবু, সেদিকে ভ্রূক্ষেপের অবসর তাহার কমই থাকিত; সারা গ্রাম ঘুরিয়া নিঃস্ব গরিবদের খবর নেওয়া তাঁহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল। তথা-কথিত শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহার হইয়া না উঠিলেও, জানিবার একটা দুর্ব্বার প্রবৃত্তি তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল, আর মহতের অনুকরণ করিয়া মহৎ হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তাঁহার মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার অত্যধিক পবিত্র সারল্যের জন্য লোকে অনেক সময় তাঁহাকে পাগল বলিত, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সারল্যমণ্ডিত বহু কাল্পনিক বাক্যালাপ শুনিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

মহেন্দ্রনাথকে সহাস্যমুখে আসিতে দেখিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "কিহে মহেন্দ্র! বড্ড হাসছ যে? গরমেত ভাই, আমার প্রাণটা প্রায় ওষ্ঠাগত।"

"বলকি জীবনদা! আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন শীতে

কাঁপছি!" এই ব্যঙ্গোক্তির বিনিময়ে জীবনকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিলেন "বিচিত্র কি!" কথাটার অন্তরালে বিশেষ কিছুই ইঙ্গিত না থাকিলেও, কি খেয়ালে জানি না, মহেন্দ্র খপ্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "অর্থাৎ পাগলের আবার কথা! তার আবার মূল্য!—বলেই ফেলনা জীবনদা! কথাটা আর ভেতরে রেখেই বা লাভ কি?"

মহেন্দ্রনাথের স্বতঃপ্রফুল্ল মুখ মলিন দেখিয়া জীবনকৃষ্ণ কাঁধে একখানা চাদর ত্রস্তে ফেলিয়া বলিলেন "চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্; দেখি একটু হাওয়া পাওয়া যায় কি না।"

এই বলিয়া জীবনকৃষ্ণ অগ্রসর হইলেন, মহেন্দ্র নীরবে তাঁহার অনুগমন করিলেন! গ্রামের যেখানে প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় শিবমন্দিরের ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ পড়িয়াছিল, উভয়ে সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। লালরং এর একখানা বড় থালার মতন সূর্য্য যখন পশ্চিমের এক অজানার সাগর কোলে ঢলিয়া পড়িতেন, তখন বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে অস্তরবির এই কিরণলেখা প্রকৃতির গায়ে যে রক্তচ্ছবির আলিপনা আঁকিয়া দিয়া যাইত, সেই মাধুরীমণ্ডিত দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রত্যহই এ সময়ে উভয়ের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। ভগ্ন মন্দিরের এই সমাধিস্তূপে বসিয়া কত সন্ধ্যা তাঁহাদের আকাশকুসুমের

কল্পনায় কাটিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সিপাহীরা ইংরেজের সহিত লড়াই করিয়াছিল, পুষ্পরথের কথা রামায়ণে পড়িতে পড়িতে বিদেশীরা কেমন করিয়া এরোপ্লেন্ আবিষ্কার করিয়াছিল, শা-জাহানকে মমতাজ মরিবার আগে কি অনুরোধ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি কত শত গল্প যে তাঁহাদের মধ্যে হইত, ইহার খবর কেহ রাখিত না, তাহারাও বড় একটা এসব কথাও স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা মনে করিতেন না।

—যাইতে যাইতে হঠাৎ মহেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন "না জীবনদা, আজ ওদিকে যাওয়া হবে না!

বিস্মিত জীবনকৃষ্ণ উত্তর করিলেন "কেন?"

"ভাল লাগছে না।"

জীবনকৃষ্ণ অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোমার কি হয়েছে মহেন্দ্র?"

"কিছু না।"

"বেশ, যে দিকে তোমার অভিপ্রায় হয়, চল!"

ভ্রমণের গতি ফিরিল বটে, কিন্তু অন্যদিনের মত জমাট্ হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া তাঁহারা চলেন নাই; কেননা আলাপটা জমাইতেন মহেন্দ্রনাথ; তিনি যখন বিমনা, তখন জীবনকৃষ্ণকেও বাধ্য হইয়াই নির্ব্বাক্ হইয়া চলিতে হইতেছে।

রাস্তার ধারে একটা মাথা-ভাঙ্গা তেঁতুল গাছের তলায় যাইতেই মহেন্দ্রনাথ হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "এখানেই বস জীবনদা, চল্‌তে আমার ভাল লাগ্‌ছে না।" জীবনকৃষ্ণ বসিলে তাঁহার গা-ঘেসিয়া বসিয়া মহেন্দ্রনাথ ব্যাকুল-আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "সবাই আমায় পাগল, অকেজো ইত্যাদি বলে, তুমিও কি আমায় তাই ভাব, জীবনদা!"

"সবাই তোমায় যা বলুক, আমি তোমায় মহৎ বলেই জানি মহেন্দ্র!"

"কিন্তু সবাই যে আমায় পাগল বলে ক্ষ্যাপায়!"

"ক্ষ্যাপাক না, তাতে তোমার কি? পাগল বস্তুতঃ তারাই, যারা আপনাকে পরের কারণে বিলিয়ে দিতে পারে। দেখ্‌ছনা, শিব পাগল; কেননা, সাগরমন্থনে উদ্ভূত রাশি রাশি জিনিসপত্র সকল দেবতা মিলে ভাগ করে নিলেন; তার সঙ্গে যে কালকূট উঠেছিল, সেটাকে কণ্ঠে ধারণ করে সকল দেবতাকে বাঁচিয়েছিলেন ঐ পাগল মহেশ্বর; তেমনই চৈতন্য পাগল, কবীর-নানক পাগল—আধুনিক যুগে [redacted] পাগল!"

"কিন্তু আমি যে লেখাপড়াও শিখিনি আমি যে, একবারে মূর্খ জীবনদা!"

"কতকগুলো ইস্কুলের বই মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব পেলেই যে কেবল শিক্ষিত হয় সে-টা আমি মনে

করিনে! মানব-প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে যাঁরা উন্নত প্রণালীর পথে চলার ক্ষমতা লাভ করতে পেরেছেন, তাঁরাই যথার্থ শিক্ষিত!"

জীবনকৃষ্ণ, মহেন্দ্রনাথের কতকগুলি খাপ্‌ছাড়া কথার মধ্যে আদত ইঙ্গিতটা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। অনেক জিজ্ঞাসা-বাদ করিয়া তবে বুঝিতে পারিলেন—গ্রামের একটা দুশ্চরিত্র ছেলের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়া মহেন্দ্র তাহাকে সদুপদেশ দিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু ছেলেটা উত্তরে তাঁহার অনধিকার চর্চ্চার কথা শুনাইয়া শাসাইয়াছিল। ইহাতেও মহেন্দ্র নাথের মনে বিশেষ কিছু লাগে নাই। কিন্তু যখন ছেলেটির বাবাও ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়া 'মায়ে-তাড়ানো-বাপে খেদানো' তাঁহাকে 'নিজের চরকায় তেল দিতে' কড়া আদেশ করিলেন, এবং 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' সেজে পাড়া জুড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ানো তাঁহার উচিত নয়, ইত্যাদি কটু-কাটব্য করিলেন তখন মহেন্দ্রনাথ অন্তরে যথার্থই ব্যথা পাইলেন! একটা অপগণ্ড শিশুর সামনে তাহারই পিতা কর্ত্তৃক এই প্রকার অবমাননা, মহেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল, এবং ইহারই ফলে, জীবনকৃষ্ণের নিকট তাঁহার অন্তকার এই অভিমান-মিশ্রিত খেদ!

এই অবান্তর চিন্তা হইতে মহেন্দ্রনাথকে ফিরাইতে জীবন-কৃষ্ণ নানা কথা বলিলেন, 'দেখ মহেন্দ্র, উপকার করাই যাঁহাদের

জীবনের ব্রত, কোন রকমের বাধা বিঘ্ন দেখেই তাঁরা দমে যান্ না, কোন প্রকার নিন্দা কুৎসায় তাঁহারা ব্যথিত হন না—তাঁ'রা প্রশংসা নিন্দার অতীত! নিত্যানন্দ মারখেয়েও জগাই মাধাইকে কোলে করেছিলেন; যিশু এক গালে চড় খেয়ে অপর গাল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন!) অল্পেতেই এমন দমে গেলে দেশের কাজ করতে পারবে কেন'?

একটা দুর্দ্দান্ত ছেলের দ্বারা অপদস্থ হইয়া অবধি মহেন্দ্রনাথের কেবলই মনে জাগিতেছিল, ভাল করিতে গিয়া কেন তিনি এমন ধারা অপমানিত হইবেন! কিন্তু ভাল করিতে গেলেই যে অনেক সইতেও হয়, ইহা তখন পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণায় আসে নাই। কিন্তু জীবনকৃষ্ণের কথায় তাঁহার কাছে এ বিষয় এমনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে ছিল যে, লজ্জায় বন্ধুর চোখে-চোখে চাওয়াই তাঁহার পক্ষে যেন অসহ্য হইয়া পড়িল!

এক প্রকার মানুষ আছে, যাহারা বিষ ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াও বেশ চলিতে পারে, বাহিরে উহার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায় না! কিন্তু আর এক রকমের লোক তা' কিছুতেই পারে না, হয় বিষ-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া শেষ হইয়া যায়, নতুবা উহা উদ্গার করিয়া তবে নিস্তার পায়! মহেন্দ্রনাথ ছিলেন, এই শেষোক্ত প্রকারের লোক। জঞ্জাল ভিতরে

জোর করিয়া আট্‌কাইয়া রাখা কোনও কালেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাই আজিকার জমাট্ আবর্জ্জনা জীবনকৃষ্ণের সম্মুখে উদ্গার করিয়া তবে তিনি সোয়াস্তি পাইলেন।

(৫)

কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায় রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছিল ! তখন তারকা-খচিত নীল আকাশ-চন্দ্রাতপতলে শান্ত ধরিত্রীর শ্যামল অঙ্গনে চন্দ্রকর বিশ্রাম-লাভ করিতেছিল আর মুক্ত হাওয়া আপনার লুপ্ত পুলক ফিরিয়া পাইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে চঞ্চল নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

অভিমান দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মহেন্দ্র আপনার স্বভাব-সুলভ প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইতেছিলেন ; তাই উৎফুল্লভাবে তিনি বলিলেন "চল-না জীবনদা" আমাদের বাড়ীতে, মা যে আজ খুব চমৎকার ঘুগ্‌নিদানা বানিয়েছেন !"

"আজ থাক মহেন্দ্র ! আর একদিন হবে ।"

"না আজই ! এখনই !"

মহেন্দ্রনাথের মনটা সরস হইয়া আসিতেছিল, তাই তাহার কথাটা উপেক্ষা করিয়া পুনরায় অভিমানের অভিনয় সৃষ্টি করার অভিপ্রায় জীবনকৃষ্ণের হইল না—কাজেই মহেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

উভয়ে বাড়ী পৌঁছিলে, রাত অধিক হইয়া গিয়াছে বলিয়া মহেন্দ্রনাথের মাতা জীবনকৃষ্ণকে খাইয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ! কাজেই গত্যন্তর না দেখিয়া উভয়ে খাইতে বসিলেন। খাইতে বসিয়া মহেন্দ্রনাথের কল্পনার বস্তা খুলিয়া গেল, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন "একটা কথা সব সময়েই আমার মনে হয়, জীবনদা ! সবদেশের সবজাতির মাঝেই যাতে প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ রেখাটা মুছে না যায়, তার জন্য উদ্যম দেখা যায় ; কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীনতার গৌরব সব চেয়ে বেশী থাকিলেও, এ বিষয়ে আমাদেরই সর্ব্বাধিক উপেক্ষার ভাব দৃষ্ট হয়। আমাদের এ নিশ্চেষ্টতার কি কোন কৈফিয়ৎ আছে, জীবনদা ?"

জীবনকৃষ্ণ ইহার উত্তরে কিছুই বলিলেন না ; মহেন্দ্রনাথ অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিলেন "ভাই, এক-এক সময় আমার খেয়াল হয়, দেশের লুপ্ত পুঁথিগুলি সংগ্রহ করে, একটা ছোট খাট লাইব্রেরী করি। শুনেছি এমন অনেক পুঁথি আমাদের ছিল যার কতক একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে, আর কতক বিদেশীদের পুস্তকালয়ে স্থান লাভ করেছে !

"তা সত্যি বটে ! তবু মনে হয়, মধ্যযুগের আমাদের হারাইয়া যাওয়া 'স্ব'কে, বাস্তব বৈশিষ্ট্যকে, চিনে নেবার সুযোগও বিদেশীরাই আমাদের দিয়েছেন।"

"অপকারও তারা কিছু কম করেন নি জীবনদা! পরের উপকার করতে গেলে নিজের স্বার্থকে বলি দিতে হয়; তা'ত তুমিই বল্লে! কিন্তু তাঁদের মধ্যে উপকারের ভাব যতটুকু ছিল, স্বার্থপরতা ছিল, তার অন্তরালে তদপেক্ষা অধিক।"—

"তবু তারা অনেক করেছেন মহেন্দ্র! ইহাতেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পর ক'দিন মুখে গ্রাস তুলে দিতে পারে বল? যদি কেউ দেয়, সেটা তার দয়া! কিন্তু দয়াতে মানুষের ক'দিন চলে? টিকে থাকবার জন্য চাই স্বাবলম্বন; তদ্ভিন্ন আমাদের অদৃষ্টে সুখলাভ নেই? ঋষিরা যথার্থই বলে গিয়েছেন, "ভিক্ষায়াং নৈবচ"—ভিক্ষাতে আর চল্‌বার সময় নেই। দেশের লোক যে এদিকে সজাগ হচ্ছে, ইহা সৌভাগ্যেরই সূচনা বলে মনে হয়!"

উচ্চ হাসি হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "তবে চল জীবনদা, দেশের কাজে আমরাও সজাগ হই! আর এই ওজুহাতে আমার মত নিষ্কর্ম্মারও কাজে লেগে থাকার একটা সুযোগ হয়!"

কাজের সম্ভব-অসম্ভব ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সহিত কথা বলার অভ্যাস মহেন্দ্রনাথের ছিল না, তবু জীবনকৃষ্ণ জানিতেন, মহেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া যাহা বাহির হয়, তাহা

অসম্ভব হইলেও কৃত্রিম নহে, তাহাতে একটা যথার্থ অনুভূতি বর্ত্তমান আছে।

—রাত বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। একটু-একটু শীত বোধ করায় চাদরখানা খুলিয়া গায়ে দিয়া জীবনকৃষ্ণ "ভেবে দেখা যাক্" বলিয়া উঠিলেন।—বাড়ী ফিরিয়া জীবনকৃষ্ণ নিজের ঘরে দরজা টানিয়া সবে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময়, রান্না ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে, ঠাকুরপো? খাবে এসো। এত রাত্তির কোথায় ছিলে? —ভাত গুলো যে একেবারে জল হয়ে গেল!"

বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া জীবনকৃষ্ণ বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধতায় বাধ্য হইয়া অনেক-দিনই বাহিরে আহারাদি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। বাড়ীতে যে খাইবেন না, যাওয়ার সময় এ কথা না বলিয়া যাওয়ায়, জগত্তারিণী জীবনকৃষ্ণের জন্যও রান্না করিতেন। জীবনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলে দুইজনে একত্রে খাইতেন;—আর জীবনকৃষ্ণ অন্যত্র খাইয়া আসিলে একাই খাইতেন।

জগত্তারিণীর প্রকৃতিটা মাতৃস্নেহের কোমল [illegible] এমনই পরিপূর্ণ ছিল যে, জীবনকৃষ্ণের না খাওয়ার দরুণ ঠাণ্ডা ভাতগুলি, এমন কি চাকর বাকরদের পাতেও তিনি তুলিয়া দিতে পারিতেন না। পরদিন সকালের আহারাদি হইয়া গেলে, অবেলায়

যখন জগত্তারিণী পান্তা-ভাতগুলি লইয়া বসিতেন, তখন, লজ্জিত জীবনকৃষ্ণ কোন কোন দিন বলিতেন "কিছুটা আমায় দিলেও ত পারতে বৌ-দি ?"

হাসিয়া শান্ত স্বরে জগত্তারিণী বলিতেন "এ গুলো তোমাদের শরীরে সইবে কেন ঠাকুরপো ?" একটা কিছু অসুখ-বিসুখ হলে দুশ্চিন্তাটা ত আমারই ভাগে ষোল আনা পড়্‌বে।"

"অসুখত তোমারও হতে পারে বৌ-দি ! আর যদি আমায় না দাও ত' ও গুলো ফেলে দিলেইত পার।"

বিস্মিত জগত্তারিণী উত্তর করিলেন "কি বল্‌ছ ঠাকুরপো ! এত গুলো ভাত ফেলে দেবো ! অন্নকে উপেক্ষা করা আর নিজের জীবনকে উপেক্ষা করাতে কিছুমাত্র তফাত নেই জেনো। তা'ছাড়া বাসি ভাতে আমাদের কিছুই অসুখ করে না ত ? স্বামীর ঘর কর্‌তে যেতে হবে বলে, ছোটবেলা থেকেই আমরা সব অভ্যাস করে নিই।"

জীবনকৃষ্ণ আর কিছুই বলিতেন না, অবাক্ হইয়া শুধু ভাবিতেন "তোমরা যে জাতের বৌদি ! তা'কে এক অস্বাস্থ্যকর অচলায়তনে আবদ্ধ রেখে, একটা মহীয়সী শক্তির অধিকার হতে আমরা বঞ্চিত আছি। আমরা সেটা বুঝেও বুঝি না ; তাই যে দোষারোপ তোমাদের আমরা করে থাকি, তা'তে তোমরা বিন্দুমাত্র অপরাধী নও।

যাহা হৌক, অন্যদিনের মত, আজও জগত্তারিণী অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া জীবনকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া সসঙ্কোচে বলিলেন "আমি খাবোনা বৌ-দি! জ্যাঠাইমা অনেক পীড়াপীড়ি করাতে সেখানেই খেয়ে এসেছি।"

অভিমান বস্তুটা স্ত্রীজাতির মধ্যেই একটু বেশী রকমের হয়; আর যেখানে অন্তরঙ্গ স্নেহ-বন্ধন বর্ত্তমান, সেখানেত কথাই নাই। ইদানীং জীবনকৃষ্ণ প্রায়ই অন্যত্র খাওয়া দাওয়া সারিয়া আসিতেন বলিয়া জগত্তারিণী মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন; আজ তাই তাঁহার কর্ত্রীত্বের ক্রুদ্ধ অভিমান আহত হইয়া জীবনকৃষ্ণের উপরে পড়িল। তিনি উত্তর করিলেন "সে কি আর আমার জানা নেই ঠাকুরপো? পোড়ামন বোঝেনা, তাই বসে থাকি! তা'ছাড়া আমাদের রান্নাটা কি তেমন রুচিকর হয়; তাই মাঝে মাঝে মুখটা বদ্‌লিয়ে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক—নয়?"

কথা কয়টি বলিয়া, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, সশব্দে রান্নাঘরের দরজা খুলিয়া জগত্তারিণী ঘরে ঢুকিলেন: বৌ-দির অভ্যকার এই ভাবান্তরে হতভম্ব জীবনকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গিয়া আপন বিছানায় উঠিলেন।

৮

বৈশাখের এক সকালে জমাট্ মেঘ চারিদিক অন্ধকার করিয়া সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, আর গুরু-গুরু গর্জ্জনের সঙ্গে একটু একটু জলও ঝরিতেছিল! জগৎকিশোর প্রাতঃস্নান করিয়া ঠাকুরঘরে ঢুকিয়াছিলেন;—বারান্দায় বসিয়া হরিমোহিণী ফুলের মালা গাঁথিতেছিলেন।

চন্দন ঘষিতে ঘষিতে তখন জগৎকিশোর হরিমোহিণীর সহিত ভক্তিতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন; এমন সময়ে জগত্তারিণী দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া, রুক্ষভাবে বলিলেন "ভগবৎপ্রেমের আস্বাদনে পেটের ক্ষুধা যে মেটেনা, তা'র কি খেয়াল আছে?"

কথাকয়টি শুনিবামাত্র ইহার ভিতরে একটা রঙ্গ উপলব্ধি করিয়া, বাধাপ্রাপ্ত জগৎকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এই হাসিটা ছিল তাঁহার এমন একটা নিজস্ব বস্তু, যা' মানসিক নানা দুশ্চিন্তার দংশন হতে দূরে রেখে তখনকার মত তাঁহাকে প্রশান্তির আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিত! পারিবারিক ব্যয়ভার বহনের অক্ষমতা সময়ে সময়ে তাঁহাকে একটু অস্থির করিয়া তুলিলেও, অন্য কোন রকম চিন্তাই তাঁহাকে

বিশেষ করিয়া অভিভূত করিতে পারিত না। এই আর্থিক অসঙ্গতির উৎকট চিন্তাও এমন কি বহু সময়ে তাঁহার প্রশান্ত ও সরল হাসির অন্তরালে চাপা পড়িয়া যাইত! তাই দুঃখে *অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ জগৎকিশোরের আজও এই গুরুতর* অন্নাভাবের *বিজ্ঞাপনটা সরলহাসির অন্তরালে উড়াইয়া দিবার* আয়োজন দেখিয়া জগত্তারিণীর অন্তর যুগপৎ ক্রোধ ও ব্যথায় দমিয়া আসিল; পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে, তিনি অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উচ্চহাসি সম্বরণ করিয়া, জগৎকিশোর বলিলেন "দেখ বৌ! এক কাজ কর আজকের মতন কব্‌রেজদার স্ত্রীর ঠেঙে চেয়ে চারটে চা'ল নিয়ে এসোগে যাও!"

উদ্ধতা ফণিণীর ন্যায় জগত্তারিণী বলিলেন "রোজ রোজ আমি পরের দোরে চা'ল ভিক্ষে কর্‌তে যেতে পারিনে।"

"এতে আর দোষটা কি বল? আমরাত আর সত্যি সত্যি চা'লগুলো রেখে দি-ই না এবং দেবোও না। আজ আমাদের নেই বলেই তাঁদের কাছে চাইছি—কাল আমাদের এলে আবার দিয়ে দেবো।"

চাওয়াটা লজ্জার বিষয় হইলেও, চাহিয়া আনা বস্তুটা যখন আবার ফিরাইয়াই দেওয়া হইবে, তখন তাহাতে লজ্জা বা প্রত্যবায় কিছুই নাই, এই ধারণা জগৎকিশোরের মনে

বদ্ধমূল হওয়ায়, তাঁহার সাংসারিক এ প্রকার অনভিজ্ঞতায়, নিতান্ত দুঃখেও জগত্তারিণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "চাওয়াটা লজ্জার বিষয় নয়ই যদি, তবে চাইতে যাঁর লজ্জা করে না, তিনি গেলেইত পারেন। রোজ-রোজ আমি যেতে পার্‌বো না, তা'তে আমার লজ্জাই করে।"

"কুমার কোথায়? তুমি যেতে না পার তা'কে পাঠিয়ে দাও!"

বেশী কথা কাটাকাটি করার অভ্যাস জগত্তারিণীর কোনও কালে ছিল না, কিন্তু সংসারের নানা জঞ্জালে জ্বালাতন হওয়ায়, তাঁহার যেন আর বর্‌দাস্ত হইতেছিল না; তাই রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন "সকাল থেকে ওঠে অবধি সকলের ফায়-ফর্‌মায়েসে যদি সারাটা দিনই তার কেটে যায়, তবে সে পড়্‌বে কখন আর পরীক্ষাই বা দেবে কি?"

"ছাই পরীক্ষায় কাজ নেই! চা'ল নিয়ে আস্‌তে বলগে!"

গলার স্বর দৃঢ় করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "আজ সেও যেতে পার্‌বে না।"

যাহারা নিতান্ত সাদা-সিধা প্রকৃতির লোক, এবং যাহাদের রাগ সহজে হয় না, তাহাদের রাগ উঠিলে প্রমাদের কারণ হইয়া থাকে! জগত্তারিণীর অদ্যকার এ কঠোরতায় জগৎ-

কিশোর ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাই ক্রুদ্ধ অভিমানে তিনি বলিয়া উঠিলেন "দু'দণ্ড ঠাকুরের নাম পর্য্যন্ত করবার অধিকার আমার নেই! এমনি হাত-পা বেঁধে আমায় তোমরা রাখতে চাও—বৌ!"

ক্রোধের তীব্রতায় তাঁহার চক্ষু জল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল! কে জগৎকিশোরের সরল প্রাণে এই ভাব উন্মেষিত করিয়া দিবে যে, তাঁহার এই মনোবেদনা অহৈতুক! পরিবারের *পরিপূর্ণ দায়িত্ব যাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে, তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে শ্লাঘা নাই; কিন্তু অপালনে অপরাধ আছে,—প্রত্যবায়* আছে। জগৎকিশোর এতকাল পরিবার পালন করিয়া এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আর কেন করিবেন এ কথা আলোচনার বিষয় হইবে না, পরিবারস্থ লোকজন অনশনে কিংবা অর্দ্ধাশনে থাকিলে তজ্জন্য তিনিই দায়ী হইবেন!

জগৎকিশোর ব্যর্থ আক্রোশে কাঁপিতে কাঁপিতে সহসা পূজার আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন; আর ঠাকুর দালান হইতে নামিয়া, শুধুপায়ে, ভিজিতে ভিজিতে দ্রুত 'কবিরাজ-দা'র' বাড়ীর পানে ছুটিলেন।

কবিরাজ-দা'র দুই সংসার ছিল। ঘরে ঢুকিয়াই সাম্‌নে ছোট গিন্নী সৌদামিনীকে দেখিয়া জগৎকিশোর বিনয়ের সহিত বলিলেন "এই যে ছোট্-ঠান্! এ'তে করে আমাদের এবেলার

মতন চার্‌টে চা'ল্ দাও না; আমাদের আজ্‌কে চা'ল্ আনা হয়নি।" বলিয়া ভাঁজকরা ভিজা গামছাখানা কাঁধ হইতে খুলিয়া সৌদামিনীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

জগৎকিশোরকে আসিতে দেখিয়া, সৌদামিনীর বুঝিতে বাকি ছিল না, তিনি কি কারণে আসিতেছেন! তাই তাড়াতাড়ি আত্মগোপণ করিবার মানসে ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তখনই বড়গিন্নী ভবতারিণী হেঁসেল হইতে বাহির হইয়া কি একটা কথা লইয়া 'যুদ্ধং দেহি', করায়, তিনিও পূর্ব্ব সংকল্প বিস্মৃত হইয়া, যথাপূর্ব্বং "তথাস্তু" বলিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইবেন, ঠিক্ এমনই সময়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া জগৎকিশোর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আপাততঃ ক্ষণকালের জন্য ভবতারিণীর সহিত সমরাকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া, সৌদামিনী জগৎকিশোরকে বলিলেন "আপনাদের ত ফি-রোজই চা'ল আনা হয় না! আমি কিছুই জানিনে, দিদিকে জিজ্ঞেস্ করুন।"

যদিও এই মাত্রই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধায়োজন চলিতেছিল, তথাপি, অকস্মাৎ এই বিপৎ-পাতে, উভয়ের মধ্যে চট্‌পট্ সন্ধি হইয়া গেল। ভবতারিণীর কাণে 'দিদি' শব্দটি যেন সঙ্গীতধ্বনিবৎ প্রবেশ করিল, তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া তিনি বাহির হইয়া বলিলেন "কি রে সুদাম্ ব্যাপার কি?"

মুখের ভঙ্গিমা করিয়া সৌদামিনী বলিলেন "ও বাড়ীর ভট্‌চায্‌ এসেছেন দিদি! তাঁদের চা'ল্‌ আনা হয়নি বলে, আজ্‌কের মতন চার্‌টে চা'ল দিতে।"

বিদ্রূপের বঙ্কিম স্বরে, ভবতারিণী বলিলেন "এদিকে যে ভট্‌চায্‌ নিজেই এসেছেন, গিন্নী তবে কোন্‌দিকে গেলেন ?"

এই বক্রোক্তিতে যে অন্তর্নিহিত শেল ছিল, তাহা জগৎ-কিশোরের প্রশস্ত মনকে কিছুতেই আহত করিতে পারিল না, ইহা গিয়া লাগিল উৎকর্ণা জগত্তারিণীর ব্যথিত বক্ষে!

ভবতারিণীর কথার উত্তরে অম্লান বদনে জগৎকিশোর উত্তর করিলেন "বউত কোথাও যায়নি বট্‌-ঠান্‌, সে বাড়ীতেই আছে। রোজ-রোজ চাইতে তার লজ্জা করে বলে আমি-ই এসেছি।"

"চাইতে আপনার লজ্জা করে না ?"

"তা'ক'রে, কিন্তু এ তো আর সত্যি-সত্যিই চাওয়া নয় ?"

"এটা তবে কি ?"

"আজ আমাদের চা'ল নেই বলে চার্‌টে ধার নিচ্ছি; কাল আমাদের আবার এলে দিয়ে দেবো। লোকে কি টাকা হাওলাত নেয় না ?"

উত্তর শুনিয়া ভবতারিণী ও সৌদামিনী উভয়ে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে হাসি সম্বরণ করিয়া

ভবতারিণী বলিলেন "আসল কথা কি ভট্‌চায্‌, এভাবে রোজ রোজ সদাব্রত কর্‌তে বাড়ীর কর্ত্তা মানা করে দিয়েছেন।"

জগৎকিশোরের স্বতঃপ্রফুল্ল মন, এই কথায় একেবারে দমিয়া গেল, ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া তিনি কাকুতির স্বরে বলিয়া উঠিলেন" "চা'ল্‌গুলোত আর ঠিক্‌ঠিক্ রেখে দেবো না বট-ঠান্‌! মাইরি বল্‌ছি!"

"মাইরি ত বুঝ্‌লাম! কিন্তু আপ্‌নার নাক কেটে পরের যাত্রা করার মতন মহানুভবতা আমাদের নেই!"

পরিপূর্ণ বিনয়ের সহিত জগৎকিশোর বলিলেন "ছেলে পিলে না খেয়ে আছে, দাওনা চার্‌টে চা'ল বট্‌-ঠান্‌? তোমরাও ত সন্তানের মা!"

জগৎকিশোরকে ফিরানো কিছুতেই সম্ভবপর নয় দেখিয়া সতীনদ্বয় যুক্তি করিয়া অল্প কিছুটা চাউল জগৎকিশোরের গাম্‌ছায় বাঁধিয়া দিলেন। চাউলের পরিমাণে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়াই জগৎকিশোর ফিরিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গাম্‌ছাখানা রান্নাঘরের দাওয়ায় একরকম ছুড়িয়া ফেলিয়াই ক্ষিপ্রপদে ঠাকুর-দালানে উঠিলেন।

---

(৭)

কাণ পাতিয়া জগত্তারিণী সমস্তই শুনিতেছিলেন ; জগৎ-কিশোরের দেব-প্রকৃতিতে আজ যে ব্যথার চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, আর ফলে অবমাননার যে দারুণ কশাঘাত তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল, আর তজ্জন্য দায়ী যে জগত্তারিণী নিজেই, ইহা ভাবিতে ভাবিতেই জগত্তারিণীর মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। সাংসারিক জঞ্জাল হইতে আগলাইয়া রাখিয়া যতদূর সম্ভব তিনি জগৎকিশোরকে শান্তির আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; জগৎকিশোরের কর্ত্তব্যের নানা গুরুভার অম্লান বদনে লইতে তিনি কোনও দিন কুণ্ঠিত হন নাই। তবে আজ কেন জগৎকিশোরকে এমন ধারা বিব্রত করিতে পতিব্রতা রমণীর এ কঠোর দুরভিসন্ধি মনের মধ্যে জাগিলো ! কিন্তু কে বুঝিবে, কতখানি জ্বালায় জ্বলিয়া তবে জগত্তারিণীকে জগৎকিশোরের উপর এমন কঠিন এমন নির্ম্মম হইতে হইয়াছিল।

সময় সময় জগত্তারিণী জগৎকিশোরের ব্যবহারে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতেন ! ঘরে চা'ল বাড়ন্ত, ইহা অনবরত জগৎকিশোরকে নিবেদন করিলেও জগৎকিশোরের সাড়া

মোটেই মিলিত না। অনুরোধ-উপরোধে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া কোনও দিন তিনি বলিয়া উঠিতেন "আমার বাক্স তোরঙ্গ কিছুইত নেই, বৌ! যা পাই তোমার কাছেইত দিয়ে থাকি তবে আমায় বারবার বিরক্ত কর কেন?"

বাক্স এবং তোরঙ্গ যে জগৎকিশোরের নাই, তাহা জগত্তারিণী বিলক্ষণ জানিতেন; কিন্তু এ কৈফিয়ৎ ত যথেষ্ট নয়! ইহাতে পেটের ক্ষুধা যায় না বা সংসারের অশান্তির নিবৃত্তি হয় না! পরিবারের দায়িত্ব যাঁহার উপর, বাক্স তোরঙ্গ না থাকিলেও ব্যয়ানুরূপ সঙ্গতি যে তাঁহার অবশ্যকরণীয় এই সহজ সত্যটা জগত্তারিণী স্বামীকে বুঝাইতে বারবার চেষ্টা করিয়াও অপারগ হইতেন। অবশ্য যেদিন জগৎকিশোরের অর্থস্বাচ্ছন্দ্য থাকিত, সেদিন তাঁহার ব্যয়, আয়ের মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত; কিন্তু অর্থের অনটনকালে সংসারের কোনও অভাব-অভিযোগেই যে তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতেন, এমন বোধ হইত না! জীবনকৃষ্ণ বাড়ী থাকিলে, জগত্তারিণী সংসারের অনটন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার ইষ্টারাধনার এক-নিবিষ্টতাকে সহজে সন্ত্রস্ত হইতে দিতেন না! কিন্তু আজ কয়েক দিন ধরিয়া জীবনকৃষ্ণ বাড়ী নাই! মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেদিন আলোচনার পর হইতে, তাহার মনে নাকি আর্য্যদের প্রাচীন পুঁথি-ফলক ইত্যাদি লুপ্তরত্নোদ্ধার করিবার প্রবল প্রেরণা জাগিয়াছিল;

তাই, ভাস্কর বর্ম্মার দানসূচক এক তাম্রফলক কোথায় মাটীর নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া উহা উদ্ধার করিতে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন।

জীবনকৃষ্ণ চলিয়া গেলে, ধৈর্য্যশীলা জগত্তারিণী আপনার অসীম কর্ম্ম-তৎপরতায় কয়েকদিন কোনও রূপে চালাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু আজ দুই দিন ধরিয়া সংসার একেবারে অচল হইয়া উঠিয়াছে! তিনি নিজে যে দুইবেলা পেটভরার সুযোগ পাইতেছেন না, সেইজন্য নয়, জগৎকিশোর আর তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগকে যে অনশনে থাকিতে হইবে—এই নিদারুণ কল্পনা তাঁহাকে আতঙ্কে শিহরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই জগৎকিশোরের তপঃ-তৃপ্ত প্রশান্ত অন্তরকে বিব্রত করিয়া তুলিতে, পূজানিরত যোগীর যোগ সাধনে বাধা দিতে আজ এমন অসময়ে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন।

সাংসারিক অনভিজ্ঞতা জগৎকিশোরের এমনি ছিল যে, একটি পোষ্যের জন্য কতটা চাউলের দরকার, ইহা পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল না। তাই আজিকার ভিক্ষা করিয়া আনা চাউলগুলি যে একজনের পক্ষেও যথেষ্ট নহে, সে দিকে দৃষ্টিই তাঁহার পড়িল না। ইহা জগত্তারিণীর অবসন্ন মনকে আরও বেশী করিয়া অথর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছিল।

দক্ষিণের একটা ছোট ঘরে বসিয়া কুমার পরীক্ষার পড়া পড়িতেছিল, ধীরপদবিক্ষেপে জগত্তারিণী তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর নিশ্বাস তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া পরমেশ্বরকে নিবেদন করিল 'যদি উপযুক্ত ক্ষমতা না দাও দয়াময় তবে অক্ষমের স্কন্ধে এমন গুরুভার চাপাইয়া দাও কেন ?"

মাকে আসিতে দেখিয়া কুমার অধীর আগ্রহে বলিল "ভাত হয়েছে মা ? আমার যে একজামিনের সময় হয়ে এলো।"

জগত্তারিণীর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা পড়িল ; তাই করুণ হইতে গিয়া আরও কঠোর হইয়া বলিলেন "সকলেই যার যার ভাবনা নিয়ে আছেন ; সংসারটা যে চলে কেমন করে—তার, ত খবর আর কারো নেই ! বলি ঘরশুদ্ধ সবাই যদি না খেতে পেয়ে মরে, তবে পড়াশোনা করে কি আমার পিণ্ডদান হবে ?"

একান্ত অপ্রত্যাশিত বাক্য আজ সহসা স্নেহময়ী মায়ের মুখে শুনিয়া কুমার স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কাতরভাবে সে উত্তর করিল "আমায় কেন আজ এমন করে বক্‌ছো মা ! আমায় যখন যা' বল, আমিত তখনই তা' করে থাকি !"

কুমারের জলভারাক্রান্ত চক্ষুযুগলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, উচ্ছ্বসিত মনোভাব গোপন করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "নে তোর আর আর সাফাই দিতে হবে না ; ওঠ্‌! দোকান

থেকে টাকাখানেকের চাল চট্ করে নিয়ে আয়! ততক্ষণ আমি উনুন ধরিয়ে ফেলি!"

মায়ের এই অপ্রত্যাশিত আদেশে কুমারের মন দমিয়া গেল। ব্যথিত স্বরে সে উত্তর করিল "দোকানে কেউ-ই আমাদের ধার দেয়না মা! তাছাড়া, আমাদের একজামিনের টাইম্‌ও যে হয়ে এসেছে!"

"রেখেদে তোর একজামিন!—আর ধারেই বা দেবেনা কেন? বলিস্, কালই দাম দিয়ে দিবি!"

"ধারে জিনিস এনে কথা রাখতে পারিনে বলে, দোকানীরা কেউ আমাদের বিশ্বাস করতে চায় না।" কুমারের অশ্রুযুগল জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল! কিন্তু, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়া মাতা বলিলেন

"পাবি – যা'ত!"

"কিন্তু আমার যে একজামিন মা"

"ফের্ ঐ কথা! যা বল্‌ছি!"

কাতর দৃষ্টি লইয়া, মায়ের মুখের দিকে তাকাইতেই, তাহাতে একটা শাসন-কঠোর ভাব দেখিয়া কুমার মাথা নীচু করিয়া লইল!

পিতামাতার কথার প্রত্যুত্তর করার অভ্যাস কুমারের কোনও কালে ছিল না; নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইলেও মায়ের অন্তকার এ আদেশ কুমার মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিল না; বই বন্ধ করিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল;—কিন্তু বড়কষ্টে! *কেননা, হয়তঃ আজ আর তা'র একজামিন দেওয়া হইবে না। কালও 'সার্' বলিয়াছেন, এবারে জলপানি সে পাইবেই পাইবে!* চাউলের সন্ধানে যাওয়াতে যে তাহার আপত্তি, তা'ত নয়; তবে, এ আদেশটা কয়েকঘণ্টা আগে, কি বিকালে করিলে কি হইত না? সংসারের নানা অভাব অনাটনের কথা সে অল্প বয়সেই বুঝিতে শিখিয়াছিল! সময়ে অসময়ে আরও অনেক দিনই চাউলের বোঝা সে ঘাড়ে করিয়া বহিয়া আনিয়াছে—এবং বহুদিন দুঃখ-দারিদ্র্যের নির্য্যাতন, অন্যের অজ্ঞাতে অকুণ্ঠিতভাবে বুক পাতিয়া লইয়াছে। সেজন্য দুঃখ নহে; দুঃখ, তাহার, হয়ত আজ পরীক্ষা দেওয়া হইবেনা বলিয়া!

অবসাদের গুরু-পাষাণ বুকের উপর চাপাইয়া, কুমার ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। দোকানে দোকানে ঘুরিয়া সে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানকেই শুধু বোঝা বাঁধিয়া লইতেছিল, অবশেষে এটি নূতন মুদীর কাছে নিজের আলোয়ানখানা বাঁধা রাখিয়া সে টাকা খানেকের চাউল, আঁচলে করিয়া লইয়া

দ্রুত বাড়ীর দিকে ছুটিল। এবং বাড়ী ফিরিয়াই রান্নাঘরে ঢুকিয়া আঁচল হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া চাউলগুলি ফেলিয়া দিল। জগত্তারিণী জগৎকিশোরের চাহিয়া আনা চাউলগুলি ফুটাইয়া রাখিয়া পথের পানে অধীর উৎকণ্ঠায় চাহিতেছিলেন ; কুমারের এ আচরণে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়াই তিনি বলিলেন "চট্‌করে একটা ডুব দিয়ে আয় বাছা ! আমি ততক্ষণে ভাতটা বেড়ে ফেলি।"

হায় মাতৃস্নেহ ! অপমান মিশ্রিত চাউলগুলি ফিরাইয়া দিবার পরিপূর্ণ অভিপ্রায় থাকিলেও, তোমারই প্রভাবে জগত্তারিণীর সে দৃঢ়তা হয় নাই !—কেননা, কুমার ফিরিয়া আসিয়া তবে কি খাইয়া ইস্কুল যাইবে !

নদীর জলে বাঁধ পড়িলে, সেখানে জলের এক দুর্ব্বার শক্তির সূচনা হয়, এবং কোনও ক্রমে সেই বাঁধ ভাঙ্গিতে পারিলে স্রোতের বেগে যে অদম্যতা হয়, তাহাকে আট্‌কানো তখন কাহারও সামর্থ্যের মাঝে থাকে না। নিরুদ্ধ অভিমান কুমারের অন্তরে ক্রমে জমাট্ বাঁধিতেছিল, এখন মায়ের মমতায় আহত হইয়া অন্তরের সেই অবরোধ টুটিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে সে বলিয়া উঠিল "আমি খাবনা মা ; আমার খিদে নেই !" বলিয়া পরমুহূর্ত্তেই কাগজ-কলম-দোয়াত লইয়া ছুটিয়া পলাইল। জগত্তারিণী পুত্রকে আর

কিছুই বলিরার অবকাশ পাইলেন না; শুধু কুমারের যে ক্ষুণ্ণ অভিমান তরলায়িত হইয়া রান্নাঘরের ভূমি চুম্বন করিতেছিল, জড়অবসন্নতায় অপলক নেত্রে তিনি ইহারই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন!

কর্ত্তব্যের তাড়না বড় কঠোর, বড় তীব্র! মনোদুঃখের দীর্ঘশ্বাস মনেই গোপন রাখিয়া তিনি ঘরময় ছড়াইয়া-পড়া চাউলগুলি খুঁটিয়া তুলিয়া ঠাকুরের ভোগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগৎকিশোরের অনাবিল মন হইতে ইতিমধ্যেই সকল আবর্জ্জনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। পূজা সাঙ্গ করিয়াই তিনি ঠাকুরের ভোগ লইয়া আসিতে হুকুম করিলেন।

বেশী আলাপের প্রবৃত্তি জগত্তারিণীর ছিল না; মর্ম্মব্যথার দুঃসহতায় তাঁহার অশ্রুযুগল জলে ভরিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল! ইহা স্বামীর নিকট হইতে গোপন করিবার জন্যই আজ তিনি অন্য দিনের অনভ্যস্ত লম্বা ঘোম্‌টা টানিয়া দিলেন! এ অস্বাভাবিকতাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, জগৎকিশোর কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া, মদনমোহনের ভোগ লাগাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। Pica

---

আহারাদি সারিয়া জগৎকিশোর নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন, কিন্তু অভুক্ত জগত্তারিণী অক্ষুণ্ণ গাম্ভীর্য্যে সংসারের কাজ যথারীতি করিয়া যাইতেছিলেন! মাঝে মাঝে তাঁহার মন তাঁহার উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও, সংসারের কাজে এতটুকু ভুল তাঁহার হইতে ছিল না—এমনি তাঁহার স্বভাব সুলভ অচঞ্চল ধৃতি! এমনি তাঁহার অনন্যসুলভ সহনশীলতা; তবু সন্তানের বুভুক্ষার চিত্র কল্পনা-নেত্র দর্শন করিয়া তাঁহার চরমধৈর্য্যের বাঁধও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল! কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল, কেন সে এমন করিয়া নীরবে চলিয়া গেল! কাঁদিয়া কাটিয়া সে কেন জানাইয়া দিয়া গেলনা যে—মা তাহাকে খাইতে দেয় নাই! জীবনের এই অল্পপরিসরের মধ্যেই কুমার মায়ের সাথে অনেক দিন হরিবাসর করিয়া কাটাইয়া দিলেও অন্যদিন ত জগত্তারিণীর আজিকার মত বাধে নাই! আজিকার অপরাধ যে সম্পূর্ণ তাঁহারই

সমস্ত দিবসের বুভুক্ষা লইয়া শ্লথদেহে যখন কুমার বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন জগত্তারিণীর অধীর হৃদয় পুত্রকে জড়াইয়া চুম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র হইল; কিন্তু আত্মসংযমের

প্রচুর ক্ষমতায়, তাঁহার সেই অতিমাত্র ব্যগ্রতা লোকলোচনের গোচর হইবার অবকাশ পাইল না; মনের বুদ্বুদ মনেই রহিল; ভগবান রহিলেন শুধু তাঁহার গোপন অভিপ্রায়ের সাক্ষী!

কুমারের অভিমান ইতিমধ্যেই লোপ পাইয়া গিয়াছিল। এবং পরীক্ষায় যদিও আশানুরূপ করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া মনটা একটু কাতর হইয়াছিল, তথাপি, কর্ত্তব্যপালনের পরিপূর্ণ সার্থকতায়, তাহার মনে এই বয়সেই একটা চমৎকার আত্মপ্রসাদ আসিয়াছিল!

ঘরে যেদিন কেরাসিন থাকিত না, সেদিন আলোর অভাবেই সন্ধ্যাকালে ভাই-ভগিনীতে মিলিয়া পিতার কাছে কত পুরাণের গল্প শুনিত! শুনিতে শুনিতে আর সকলেই নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইত, কুমার শুধু অবাক হইয়া ভাবিত, দাতাকর্ণের অপূর্ব্ব দান! বৈশ্বানরের তপ্ত কোলে কুশধ্বজের আত্মাহুতি, পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে গিয়া রামের বনগমন এবং আরো কত কি!

দুর্দ্দিন কখনও একা আসে না, অনেক অনর্থকেও সঙ্গে করিয়া নিয়া আসে! জগৎকিশোরের সাংসারিক অসচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে কুমারেরও জলপানি না পাওয়ায় এক অদৃষ্টহীনতার সূচনা হইয়া গেল; অধিকন্তু, জীবনকৃষ্ণ

ছুটি না লইয়া কোথায় এক তাম্রশাসনের অনুসন্ধানে চলিয়া যাওয়ায়, সেক্রেটারী রাগিয়া তাঁহার স্থানে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। জীবনকৃষ্ণের অকস্মাৎ চাকুরিটি যাওয়া জগৎকিশোরের পারিবারিক দুর্দ্দিনের আরও একটা নির্দ্দেশ বই আর কিছুই নহে!

—দিন কতক পরে জীবনকৃষ্ণ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যখন জগত্তারিণীর মুখে তাঁহার চাকুরী যাওয়ার সংবাদ পাইলেন, তখন কাষ্ঠ হাসিয়া তিনি বলিলেন "এবার আর বিয়ের আব্দার করবেনা বৌ-দি?"

বিরক্ত হইয়া জগত্তারিণী উত্তর করিলেন "বিয়ের আব্দারেরই যত দোষ, নয়? নানা খামখেয়ালী নিয়ে যেখানে খুসী তুমি ঘুরে বেড়াবে—আর অপরে সেটা সইবে!"

হাসিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "ভাগ্যিস্ ছেলে পিলে আমার নেই।"

"তা'তে কি হলো শুনি?"

"তেমন কিছু নয়; তবে কথাটা কি জান বৌ-দি! ছেলে মেয়ে হয়েছে বলে সংসারের ভাবনা নিয়ে তোমরা যতটা বিব্রত, আমি ততটা বিব্রত সহজে হয়ে পড়্ব না।"

"ছেলে পিলে ছাড়াও কি আর কোনও ভাব্না নেই তোমার?"

"ভাবনা যদি কিছুর থেকে থাকে, তবে তা'ত তুমিই ঘাড় পেতে নিয়েছ বৌ-দি! স্বাধ করে আরও একটীর ভাব্‌নাও ত তুমি নিতে চেয়ে ছিলে!"

তার পরে চট্ করিয়া কথাটা উল্‌টাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "যাই বল বৌদি; অনুর ত কোনও রকম বিয়ে হয়ে গেল; এখন যে আরও একটি আছে, তাকে পার করার চিন্তা সময় সময় আমায় অস্থির করে তোলে বটে!"

সুযোগ পাইয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তবু যাহোক পরের ছেলে পিলেদের জন্যও কিছুটা দরদ্ আছে"!

জলভারাক্রান্ত চক্ষে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "তেমন কথা বলোনা বৌ-দি! এরাই আমার সব! ভগবান্ আমায় বঞ্চিত করেছেন বলে, তোমরা এমন করে নির্দ্দয় হয়োনা!"

এ ভাবটা চিরদিন থাকিলে হয়! জগত্তারিণীর মনে একটা কৌতুকের হাসি জাগিয়া উঠিল।

ক্ষিপ্রভাবে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "এ আন্তরিকতার ব্যত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমারও একটা কিছু ভালমন্দ হয়!"

এরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে কুমার আসিয়া বলিল "কাকাবাবু, বাবা আপনায় ডেকেছেন!"

সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্তভাবে ধীরে ধীরে জীবনকৃষ্ণ ঠাকুরদালানে উঠিলেন! মালা জপ করিতে করিতে জগৎকিশোর বলিলেন

"জীবন, ছেলে মেয়ে ক'টির জন্মদাতা বটে আমি, কিন্তু আমি এখন একান্ত অসমর্থ এবং সংসারের ভার তোমারই উপরে সম্পূর্ণ, তাই জানিয়ে দেবার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম !"

জীবনকৃষ্ণের চাকুরি যাওয়া সম্বন্ধে কোনও কথাই জগৎকিশোর উল্লেখ করিলেন না, একটা তিরস্কারের কথাও না ; কেবল নিজের অক্ষমতার কথাটা জানাইয়া, ভ্রাতৃবৎসল অনুজের সহায়তা যাচ্ঞা করিতেছিলেন মাত্র !—সেইজন্য আরও বেশী করিয়া তিনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

জপের মালাটা মাথার উপর হইতে নামাইয়া তামার পাত্রে রাখিতে রাখিতে জগৎকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাক্, যে কাজে তুমি গিয়েছিলে, তা'র কি হলো !"

কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "দু'খানা তাম্র ফলক উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি !"

"তা'তে কি লেখা আছে !"

"পাঠোদ্ধার এখনও রীতিমত হয় নি ; অল্পস্বল্প যা' হয়েছে, তা'ও প্রত্যয়যোগ্য নয় ! এটাকে নরওয়েতে ষ্টেন্‌কনোর কাছে পাঠানো স্থিরীকৃত হয়েছে !"

"ভারতের শাস্ত্রচর্চ্চাটা বুঝি এখন সাগর ডিঙ্গিয়ে আশ্রয়-ভিক্ষে করছে ?"

যথার্থই; আমরা প্রতিপদেই বড্ড পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি; তবে দেখা যায় এ পরনির্ভরশীলতার লজ্জাকে ঘুচাবার জন্যে একটা স্বাবলম্বনের প্রেরণা আমাদের মাঝে বর্ত্তমানে জাগ্‌ছে!"

উচ্চ-হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমারও, এ পরনির্ভরশীল ভাইটীর অবস্থাটা ভুলে যাওয়ার অসম্ভবরকম প্রেরণাটা এসে না পড়ে!

দাদার এ পবিত্র রহস্যে সহসা লজ্জা পাইয়া জীবনকৃষ্ণ সরিয়া পড়িলেন! কুণ্ঠার সহিত তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দাদার সাম্‌নে এমনভাবে মনটাকে রাস-ছাড়া করার প্রবৃত্তিটা আজ তাঁহার কেন হইল?

(৯)

সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ ক্রমে সুকঠিন হইয়া উঠায়, জীবনকৃষ্ণ অর্থাগমের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা মানুষের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে, মহৎকর্ম্মে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। জীবনকৃষ্ণেরও মহৎ প্রবৃত্তি দারিদ্র্যজনিত নানা দুশ্চিন্তার অন্তরালে চাপা-পড়িয়া গেল!

ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির বার্ত্তা পাইয়া বিদেশীরা যেমন এদেশে দলে দলে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, আগেরকালে আসামের প্রতিও বাংলাদেশবাসীর একটা অনুরূপ মোহ ছিল। দারিদ্র্যের তাড়নায় অস্থির হইয়া, অর্থসঞ্চয় মানসে বাংলার বহু শ্রমিক একবার আসামে গিয়া, যখন বেশ সচ্ছল হইয়া উঠিত, তখন আর গতায়াতের দুর্গম পন্থা অতিক্রম করিবার কষ্ট তাহারা স্বীকার করিতে চাহিত না; কাজেই মায়ের কথা, ভায়ের কথা এমনকি দেশ-মাতৃকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনটাতে প্রত্যাবর্ত্তনের মায়া জাগাইতে সমর্থ হইত না! অধিকন্তু, আসামের গিরিতে গিরিতে, কন্দরে-কান্তারে-চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়া প্রকৃতিরাণীর যে গরিমাময় নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া

উঠিয়াছে, মানুষের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য ইহাও বড় একটা কম প্রলোভন নহে। বস্তুতঃ, আসামের সেই ভীতি-বিস্ময়-মিশ্রিত নির্জ্জন নিঃসঙ্গতার মধ্যে পর্ব্বতমালা, আর তার শ্বেত শুভ্র তুহীন মেখলার সন্তর্পন আলিঙ্গনকে চিরসঙ্গী করিয়া লইবার তরুণ আনন্দ মনকে একান্ত ভরপূর করিয়া তোলে! আর এই ওতঃপ্রোত সৌন্দর্য্যের মঙ্গলগীতি শ্রীর নির্ম্মল আসঙ্গ লাভ করিয়া, বর্ষণাভিষিক্ত মৃদু ধরণীর প্রায়, দারিদ্র্য-দীর্ণ ও আশাহত মানবমনকে মুঞ্জরিত করিয়া তোলে! এ মোহ টুটাইয়া যাওয়া কি সহজ?

দুপুরের আহারাদি সারিয়া জগত্তারিণী ঠাকুরদালানে মাদুর পাতিয়া একখানা মহাভারত নিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু বসিয়া, মহাভারতের পাতা উল্টানোই তাঁহার সার হইল; কেননা, জীবনকৃষ্ণ আজ আসাম রওনা হইয়াছেন বলিয়া, সে দেশ, সম্বন্ধে যে এক স্বভাবিক বিভীষিকাময় আতঙ্ক, তাহাই তাঁহার মনখানাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল!

জগত্তারিণী আনমনে বসিয়া নানা দুর্ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় কুমার আসিয়া ডাকিল 'মা!"

পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহের কোমলতায়, জগত্তারিণী তাহাকে কোলে জড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"কি বাবা?"

কুমার কিছুই বলিতে পারিলনা; শুধু অশ্রুদুইটি জল-ভারাক্রান্ত করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল!

মমতামণ্ডিত স্বরে জগত্তারিণী কুমারের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোর কি হয়েছে কুমার! এমন কচ্ছিস্ কেন বাবা?"

আর্দ্রকণ্ঠে কুমার উত্তর করিল "আমি পাশ করেছি মা, কিন্তু জলপানি পাই নি।"

"না পেয়েছিস্ নাই;—তা'তে কি হয়েছে?"

"বাবা আমায় বক্‌লেন, কেন জলপানি পাইনি মা আমি?—"আমি বলেছিলুম ঠিক্‌সময়ে যেতে পারিনি বলে ভালো পরীক্ষা দিতে পারিনি! তখন রাগ করে আমায় তিনি বল্‌লেন কেন দেরী করে ইস্কুলে গেলুম!"

"এর উত্তরে কিছুই তুই বলিস্ নি?"

"না মা, কেমন করে আমি জানাব যে ঘরে চা'ল বাড়ন্ত হওয়ায়, তুমি আমায় দোকানে পাঠিয়েছিলে এবং তাতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল!"

"এটা বুঝি তাঁর জানা ছিলনা"

"সেত আমি জানিনে, মা!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জগত্তারিণী মনে মনে বলিলেন "তুই জান্‌বি কেমন করে—কুমার! কব্‌রেজ গিন্নীর

শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, এক বেড়ালছানার উপযোগী চার্‌টে চা'ল্‌ রান্নাঘরের দাওয়ায় ফেলেই খালাস্‌! কিন্তু বাড়ীতে এতটি লোকের পেট যে এক বিড়ালছানার পেটেরই সমান নয়, সে ধারণা করার ত ওঁর কোনও প্রয়োজন ছিলনা ?

কথা কয়টা ভাবিতে ভাবিতে জগত্তারিণীর মনটা দুঃখে ক্ষোভে ভরিয়া আসিতে লাগিল!—কেন এ নির্ব্বোধটা আসল কথাটা প্রকাশ করিয়া নিজেকে সমর্থন না করিয়া নীরবে ফিরিয়া আসিল! মায়ের এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কুমার বলিল "বাবা না জেনে একটা কথা বলেছেন; তাতে আমি কিছুই মনে করিনে।" দুর্ব্বার আক্রোশে জগত্তারিণী বলিলেন "না জানার অভ্যাসটাত ওঁর চিরকালেরই—এ নিরপেক্ষ-ভাব আর কি এজীবনে যাবে ?

"সে যাক্‌গে মা! কিন্তু বাবা বল্‌লেন আমার আর পড়া-শুনা করে কাজ নেই; পড়া শুনা কর্‌তে হলে এতগুলো করে টাকা চাই; সে গুলো আস্‌বে কোত্থেকে ?"

উত্যক্ত জগত্তারিণী বলিয়া উঠিলেন "তাহলে আর পড়ে কাজ কি ? আর মেলেচ্ছ পড়ার জন্যে তোরই বা এত রোখ কেন বাপু ? তার চাইতে ভটচায্‌ বামুণ হ'য়ে বস্‌; টাকাকড়ি খরচেরও বালাই নেই; দিব্যি বাজার-হাট কর্‌বে; নেমন্তন্ন খেয়ে ও দু'চার পয়সা রোজগার কর্‌তে পার্‌বে!"

মায়ের এই কথাগুলিকে সরলভাবেই সত্য মনে করিয়া কুমারের মনটা বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল! . মা তাহার হইয়াই পিতার কাছে ওকালতি করিবেন ইহা সে ভাবিয়াছিল; কিন্তু সহসা মায়ের এ মনোগতিতে আশাভঙ্গের এক গুরু দীর্ঘশ্বাস তাঁহার সারা অন্তর মথিত করিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া আসিল! কিছু কাল নীরবে দাঁড়াইয়া. হতোদ্যমের নিরাশা ভাঙ্গা বুকে চাপিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া গেল!

কুমার যে কখন চলিয়া গিয়াছিল, জগত্তারিণী তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; পূঞ্জীভূত দুর্ভাবনার মধ্যে যেন আজ তাঁহার ভাবনার পরিপূর্ণ-শূন্যতা! নানা দুশ্চিন্তা যখন রাশী-কৃত হইয়া মনোবিপ্লবের সৃষ্টি করে, তখন এই চাঞ্চল্যের মধ্যে কোনও প্রকার ভাবনাই, মনের মাঝে আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে চাহেনা; বায়স্কোপের ফিল্মের মতনই, এক এক করিয়া পরপর ভাসিয়া উঠিয়া তিরোহিত হইয়া যায়।

এইভাবে কিছুকাল চলিয়া যাওয়ার পর, সহসা জগত্তারিণীর চোখে পড়িল, কৃষ্ণপক্ষের ধরণীর তমসাবৃত আকাশের বুকে তারার দেওয়ালী! চকিতে, ছেঁড়া মহাভারতখানা মাথায় ঠেকা-ইয়া রাখিয়া তিনি দ্রুত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন! সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবু ঘরে আলো জ্বলে নাই, লক্ষ্মীর আসন, শীতল কিছুই দেওয়া হয় নাই; ইহাতে জগত্তারিণী অবাক্ হইয়া

গেলেন! তাঁহার ধারণা ছিল, কল্যাণী যথাকালে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়াছেন! অন্যদিন হইলে তিনি এই কর্ত্তব্য ভ্রষ্টতায় নিজেই লজ্জিত হইতেন, কেননা আত্মনির্ভরশীল তাঁহার পর-মুখাপেক্ষী হইয়া চলার অভ্যাস কোনও কালেই ছিল না। কিন্তু নানা প্রতিকূল চিন্তায় জগত্তারিণীর মন আজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই প্রদীপ জ্বালাইতে জ্বালাইতে কল্যাণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন "এ তোমার কেমন আক্কেল ছোট-বৌ! সাঁঝের বেলা, বাতিখানা পর্য্যন্ত না ধরিয়ে শুয়ে পড়েছ! আমি না হয় একটু আলিস্যিই করেছি, তা'বলে কি এটা তোমারও কর্ত্তব্যের বাহিরে!"

কল্যাণী শিয়রের বালিসটা সাম্‌নের দিকে টানিয়া আনিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। অন্যদিন হইলে, কল্যাণীর এই নীরবতায় চঞ্চল হইয়া হয়ত জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিতেন "এমন অসময়ে এম্‌নিভাবে বিছানায় শুয়ে কেন কল্যাণ! কোন অসুখ করেনিত?" কিন্তু আজ কল্যাণীর এ ভাব মোটেই তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল না।

কল্যাণীকে ছোটবেলা হইতে জগত্তারিণীই গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিবার ভার লইয়াছিলেন, তাই কতকটা মায়ের স্নেহেই তাঁহাকে তিনি দেখিতেন! কিন্তু এই কল্যাণীর চরিত্রটা

ছিল যেন এক অদ্ভুত রহস্য! কোনও কিছু মনের মতন না হইলেই, তাঁহার রোগ হইত, আর সেই রোগ তৎক্ষণাৎ দিন কতিপয় শয্যা আশ্রয় করিতেও তাহাকে প্ররোচিত করিত! শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় সর্ব্ব কনিষ্ঠা কল্যাণী বড় ভাইদের একান্ত আদরের পাত্রী হইয়া পড়িয়াছিলেন; সারাদিনের কর্ত্তব্যের মধ্যে তাঁহার ছিল, কোণাঠাসা করিয়া আহার আর অনবরত নিদ্রা। কাজেই, জীবনের ক্রমপরিসরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র মনুষ্যোচিত সৌজন্যে গঠিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই; তাই অষ্টমবর্ষের গৌরী-স্বরূপে যেদিন কল্যাণী জীবনকৃষ্ণের জীবনসঙ্গিনীরূপে নূতন ঘর আলো করিতে আসিলেন, তখন তাঁহার অস্থিসার শ্যাম দেহে যেমন লাবণ্যের অভাব ছিল, তেমনি তাঁহার অত্যধিক আহার হেতু স্ফীতোদরে, পুঞ্জীভূত-ক্রোধ-ঈর্ষা-হিংসা প্রভৃতির চির-স্থায়ী প্রভাবের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যাইত।

—যেদিন কল্যাণী জগৎকিশোরের পরিবারে প্রথম প্রবেশ করিলেন, সেদিন গ্রামের বুড়ী, যুবতী, বালিকা, প্রৌঢ়া, সুশ্রী, সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল। অবশ্য গ্রামের সবাই কিছু অনিন্দ্য সুন্দরী নহে তা ঠিক্, তবু যেমন গান গাইতে না জানিলেও সঙ্গীতে রসানুভুতি যে হইবে না, এমন কিছু কথা নাই; সেই প্রচলিত নীতি অনুসরণ করিয়া গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা

কুৎসিৎ-আখ্যা প্রাপ্ত 'শ্যামা-পিসি'ও বলিতে ছাড়িলেন না ও-মা! কি ঘেন্না গো! এ-কি বৌ ঘরে আন্‌লে ভট্‌চায্‌-গিন্নী!

অঙ্গসৌষ্ঠবেও তরলায়িত লাবণ্যের উচ্ছলতায় এ গ্রামে মুক্ত-কেশীরই একটা অনন্য-সুলভ সৌন্দর্য্য-গৌরব ছিল! যৌবন-নদীতে জোয়ার আসার আগেই স্বামীর আবাস হইতে তাঁহাকে চিরবিদায় লইয়া পিতৃ-গৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল! এবং আজ প্রৌঢ়ত্বের সিংহদ্বারে আসিয়া অবধি সেখানেই বসবাস করিতেছেন! তাহার দৃষ্টিতে একটা চটুল মাদকতা ছিল, আর সচরাচর হিন্দুর বালবিধবার মত তাঁহার প্রকৃতিতে একটা অকাল-পক্কতাও আসিয়া পড়িয়াছিল! তাঁহার মুখের স্বর শরীরের রঙের মতন মোলায়েম ছিল না, আর বিশেষ পর্ব্বাদি ছাড়া পান ও দোক্তার রসে অহরহই তাঁহার ঠোঁট দুখানা রাঙা হইয়া থাকিত! এ-হেন মুক্তকেশী যখন রাজহংস গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সমবয়সীরা স-কৌতুকে গা-টেপা-টেপী করিয়া বলিয়া উঠিল "মুক্তা-দি! আজ তোমার এক জুড়ি এসেছেগা! এ গাঁয়ে সুন্দরী বলে বড় যে তোমার দেমাক!"

মুক্তকেশী কোনও উত্তর করিলেন না, শুধু তাঁহার চটুল চাহনিতে কৌতুকের হাসি ব্যক্ত করিয়া বঙ্কিম ভঙ্গীতে অগ্রসর হইলেন। নববধুকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন

দেবী

"চমৎকার! এ জিনিসটাকে কোথা হতে আম্‌দানী করলে ভট্‌চার্য্‌-বৌ!" মন্তব্য শুনিতে শুনিতে জগত্তারিণী এমনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, গায়ে পড়িয়া মানুষগুলির এ প্রকার অনর্থক দাম্ভিকতায়, তাঁহার স্বাভাবিক ধীরতার মধ্যে একটা কর্কশ অসহিষ্ণুতা আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই তিনি উত্তর করিলেন "ভগবানের সৃষ্টি-থেকেই, কিন্তু কেন বল দেখি বামুণ-গিন্নী!"

"ছোট একটা "এমনি" বলিয়া মুক্তকেশী বিষয়টা সুবিধার নয় ভাবিয়া ক্ষণেক নীরবতা অবলম্বন করিলেন, কেননা এই অতর্কিত উত্তরের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তর্কস্থলে শ্রেষ্ঠ আসনই তাঁহার জন্য সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকিত, সে দাবী তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্যে অবমানিত হওয়ায় মুক্তকেশী নিজকে বড়ই সঙ্কুচিত মনে করিলেন, তাই প্রতিহত দর্প চাপিয়া বিদ্রূপের স্বরে তিনি বলিলেন "যাক্, সুন্দরে আর কিই বা করে দিদি! হাড়্ ক'খানার দামও ত কম নয়!—দেশের সেরা কুলীন!',

জগত্তারিণী লক্ষ্য করিতেছিলেন, এই সকল শ্লেষের মধ্যে নববধুটি লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িতেছিল, তাই তীক্ষ্ণস্বরে তিনি বলিলেন 'তা নয়তো কি? তোমাদের মত ও-ত আর, গোষ্ঠী-গোত্রের পরিচয় ছাড়া হয়ে ভেসে আসেনি'। আভিজাত্যের গর্ব্ব সত্যি-ই ত আছে ওর!"

কুটিল হাসিয়া মুক্তকেশী বলিলেন "তা' বটেইত! তা গাড়া, শুনেছি, কোন্ এক রাজা না মহারাজা নাকি বৌয়ের বাপের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন।"

তর্কটাকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে দিতে জগত্তারিণীর প্রবৃত্তি হইল না, তাই গলার স্বর কোমল করিয়া তিনি বলিলেন "ছোট বেলা থেকে মা-বাপ-হারা বলে; তা' হলে ওর গড়নটা কি এমন খারাপ দিদি? দিন কয়েক মাজা ঘসা করেনি,' তখন দেখেনিয়ো, কেমন ওর রূপ!"

"তখন এসে তোমার রাজলক্ষ্মীকে দেখে যাবো; এখন তবে বিদায় হই!" বলিয়া মুক্তকেশী শুষ্ক হাসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন!

তর্কের সময় কল্যাণীর প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতিতে জগত্তারিণীর অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও, বস্তুতঃই জগত্তারিণী কল্যাণীকে দেখিয়া অবধি তৃপ্তি বোধ করেন নাই! —তাই বলিয়া, মাতৃত্বের অনাবিল মমত্বে তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইতে কভু কার্পণ্যও করেন নাই! তাঁহার প্রতি-নিয়ত সস্নেহ পরিচর্য্যায় কল্যাণীর অবয়বের সৌষ্টব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল বটে—কিন্তু আবাল্য উচ্ছৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠা মনের আবর্জ্জনা যেন কিছুতেই দূর হইতেছিল না।

স্নেহ যখন যথার্থ পথে না চলিয়া বিপথগামী হয়, তখন তাহার ফলও ভয়াবহ হয়; এবং ইহার দৃষ্টান্ত আবাল্য অন্ধ স্নেহে প্রতিপালিতা কল্যাণী। যে কোনও অজুহাতে কল্যাণী যখন শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেন, তখন তাহার কোনও রোগ হইয়াছে ভাবিয়া জগত্তারিণী কবিরাজ-বৈদ্য ডাকাইতেন; কিন্তু কোনওরূপ সেবা শুশ্রূষা-তেই কল্যাণীর রোগ সারিত না। অবশেষে সকলেরই ইহা নিরাকরণ করিতে বিলম্ব হইল না যে কল্যাণীর এ রোগ মনের,—দেহের নয়; সময় সময় জগৎকিশোরেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত, কিন্তু জগত্তারিণীর ভয়ে কিছুই উচ্চ-বাচ্য করিতেন না! তাঁহারই অস্বাভাবিক স্নেহেও অত্যধিক প্রশ্রয়ে কল্যাণী মাটি হইয়া যাইতেছেন, গ্রামের অনেকেই এ কথা বলিলেও জগত্তারিণী এই সব অনুযোগ নীরবে উদরস্থ করিতেন।

কিন্তু যে দিন জীবনকৃষ্ণ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য লইয়া 'আসাম' রওয়ানা হইয়াছিলেন, সেদিন রাত্রি-দণ্ড অবধি ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয় নাই দেখিয়া জগত্তারিণীর শান্তমনও সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন "মেয়েমানুষের এত বাড়াবাড়ি সয় না! বুকের পাটা-

খানাও কি কম? বাড়ীতে যে আরও দুচারজন কেউ-কেটা আছে, তা যেন আর গেরাহ্যির মধ্যেই আসেনা!"

জগৎকিশোর ঠাকুরদালানে পায়চারি করিতেছিলেন; এখন সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন "বুকের পাটাখানা তুমিইত তৈরী করেছ বৌ? ওকে কেউ কিছু বল্‌লে, তুমিইত বাঘের মত চোখ দুটো রাঙ্গা করে তেড়ে আস্‌তে!"

মানুষ স্নেহাস্পদের উপরে বিরূপ হইলে, নিজে তাহাকে শাসন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু, তখন যদি আর কেহ সেই শাসনাধিকার ফলাইতে আসে তাহা হইলে, সে-টা তাহার অসহ্য হয়। উপেক্ষিত স্নেহনিলয়কে সে তখন বুকে জড়াইয়া লইতে অগ্রসর হয়; তাই জগত্তারিণীও যদিবা কল্যাণীকে খুব কড়াকথা শুনাইতেছিলেন, তথাপি জগৎকিশোরের এ শ্লেষ তাহার সহ্য হইল না; তিনি বলিলেন "হাঁ, এটা মস্ত ভুলই হয়েছে আমার! যদি প্রথম থেকেই খুব করে কঠোর শাসন কর্‌তুম্ তা হলে বোধ করি ও এত বয়ে যেতোনা।"

হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "সে-টা তোমার আগেই বুঝা উচিত ছিল।" জগৎকিশোরের এ অযাচিত সমর্থন জগত্তারিণীর ভাল লাগিল না; তাই তীক্ষ্ণভাবে তিনি বলিলেন "হাঁ, একটা মারাত্মক অপরাধ আমি করে ফেলেছি বটে কেন না, এ পোড়া বাংলায় অনেক জা'-শাশুড়ী ঘরে

আনা নূতন বৌকে শাসন যন্ত্রে নিষ্পেশিত করে, আদব-কায়দা-দুরস্ত করে নিতে প্রয়াশ পান।" তারপরেই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন "কিন্তু নিজেরও ত সন্ধ্যা-আহ্নিক হয়নি দেখ্‌তে পাচ্ছি! ঠাকুরপো আজ চলে গিয়েছেন বলে ওরও হয়তঃ মনের গতি ভাল নেই! এখান থেকে একটু চলে গেলে হয় না?"

চলিয়া যাইতে যাইতে—জগৎকিশোর বিস্ময়ে বলিলেন "তোমার বুকখানা যে ভগবান্ কি দিয়ে গড়েছেন বৌ! এত দিনেও আমি বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না! আর তোমাকে চেনার সুযোগ হারানোর মত নির্ব্বুদ্ধিতা ওর না হলে স্পর্শমণির সংস্পর্শে এসে অনায়াসে লোহা সোণা হয়ে যেতে পার্‌তো।"

একথা শুনিতে শুনিতে জগত্তারিণীর হাত দুটি অলক্ষ্যে যুগ্ম হইয়া আসিল; ভক্তিভরে তিনি স্বগত বলিলেন "তোমার মত জলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে এসে মলিন অঙ্গারও আগের জ্যোতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে! চাঁদের কি আর নিজের কিছু আছে?—সূর্য্যকে দিয়েইত তার যত আস্পর্দ্ধা! মহৎ আমি না তুমি!"

কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে জগত্তারিণী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চমকিত হইয়া শুনিলেন

কল্যাণী ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "এমন করে, তিল তিল করে না মেরে, একেবারেই গলাটিপে মেরে ফেল্লেইত আপদ চুকে যায়!"

বিস্ময়-স্তম্ভিতা জগত্তারিণীর মনে হইল যেন জগতের বক্ষের উপরে একটা বিরাট্-ভূমিকম্পের তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে —*একান্ত অভিভূতা তিনি ভাবিতে পারিলেন না, এ তাঁহার সুপ্তি না জাগরণ, স্বপ্ন না সত্য!*

এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি কল্যাণী বড় একটা কথাবার্ত্তা বলিত না; তাই আজ হঠাৎ এতবড় একটা অনুচিত অপ্রিয় কথা কেমন করিয়া সে বলিতে পারিল, জগত্তারিণী ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার দৃপ্তক্রোধ অনুশোচনায় পরিণত হইল। দুঃখের সুরে তিনি বল্লিলেন "কি বলিলি কল্যাণ! মেরে ফেল্‌লেই আপদচুকে যায়? তা'ত বল্‌বিই। কিন্তু মরার বাড়া হয়ে যখন এখানে এসেছিলি, তখন কে তোকে মরণের মুখ হতে বাঁচিয়ে এনেছিল?"

"একটুখানি যত্ন আত্তি করে রোজ রোজই সে কথা খোঁচা দেওয়াই যদি অভিপ্রায় ছিল, তা'হলে সেটুকু না কর্‌লেইত হতো।"

"হাঁ, উপকার করে সেটার বড়াই বারবার করার চাইতে, উপকার মোটেই করা যে ভাল নয় তা আমিও

জানি! কিন্তু আমার প্রতি সে ধারণা করার দুর্ম্মতি আজ তোর কোথা হতে হ'লো বোন্?"

"আমার দুর্ম্মতিই ভাল; যার যার সুমতি নিয়ে তাঁরা থাকুন! আমায় মিছামিছি জ্বালিয়ে কা'র কি লাভ হয় বুঝি না!"

কষ্টে হাসিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তোর জ্বালাটা কিসে হয় জান্‌লে না হয়, একটু বুঝে সুঝে চল্‌তে পারি!" কল্যাণী *কিছুই বলিল না, শুধু বালিসে মুখ গুজিয়া ফুপাইতে লাগিল! ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "আজ তোর একটা* অভিনব মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো কল্যাণ! যদিও এটা অনেকটা সত্যি যে, যারা সর্ব্বদা মুখ বুজে' থাকে, তারা ভিতরে ভিতরে নানাকথার জাল তৈরী করে, তবু তোকে কিন্তু তেমনটি ভাব্‌তে পারিনি!" তারপরে একটু থামিয়া তিনি স্বগতই বলিয়া যাইতে লাগিলেন "লোকে বলে, অকৃত্রিম স্নেহ মানুষকে যত সহজে বশে আন্‌তে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না—কিন্তু এত করেও তোকে বশে আন্‌তে পার্‌লুম না, এই যা দুঃখ!"

ক্রুদ্ধা ফণিণীর ন্যায় কল্যাণী বলিয়া উঠিল "কী এমন করেছেন শুনি? এক জনকে বাঘ ভালুকের মুখে পাহাড় পর্ব্বতের অগম্য জঙ্গলে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছেন, এই-ত?

দেবী

কথাটার ইঙ্গিত বুঝিয়া সহসা জগত্তারিণী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; ঘৃণার বিতৃষ্ণায় তিনি বলিলেন "তোর স্বামীর পক্ষে তুই যে কত অনুপযুক্ত সে কথা আজ বল্‌তে বাধ্য হলুম কল্যাণ, যেন স্বর্গ আর নরক !"

এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য জগত্তারিণী চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যাইতে যাইতে শুনিলেন, কল্যাণী বলিতেছে "কেননা, নিজকে সম্পূর্ণ উজাড় করে উচ্ছন্ন যাওয়ার মতন সু-বুদ্ধি এক জনের ছাড়াত আর কারো দেখা যায় না।"

জগৎকিশোর ঠাকুরের আরতি করিতে ছিলেন, আর হরিমোহিনী ঠাকুর দালানে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন! শীতল দিয়া জগত্তারিণী চলিয়া গেলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জগৎকিশোর নিজেই বলিতে লাগিলেন "দয়াময়! জানি না তোমার কি ইচ্ছা।"

—:০:—

হাসিয়া জীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন "আচ্ছা কেশব তোর চাকুরিটি কেন গেল বল্ দেখি ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেশবের যে অত্যধিক আগ্রহ সব-সময়েই প্রকাশ পাইত, তাহা সকলেরই জানা ছিল! তাই কেশবের সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই গ্রামের লোক মজা দেখিবার জন্য তাহাকে এই প্রশ্ন প্রথমেই করিত।

কেশব বিনয়-প্রকাশ করিয়া উত্তর করিল "সে কথা আর তুলে' লাভ কি বাবু।"

"কেন-রে ?"

"যে কোন কারণেই হোক্, সে কথা আর বল্তে চাইনে। কেউ হয়ত বল্‌বে, দোষী আমিই; গায়ের জোর রাখবার জায়গা পাইনে; কিন্তু ভগবান্ জানেন আমি নির্দ্দোষ,—আর এতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিতও নই! ভগবানই হয়ত আমায় চাকরি থেকে রেহাই দিয়েছেন; চাকুরি কি বাবু মানুষে করে ?"

হাসিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "যারা চাকুরি করে, তারা কি তবে সবাই অমানুষ—কেশব ?"

অপ্রতিভ-ভাবে কেশব উত্তর করিল "সে আমি কি জানি; যারা চাকুরি করে, তারাই, সেটা ভাল বোঝে!—তা' ছাড়া, ওটা একটা কথার কথা বল্‌লুম বৈ-ত নয়, ছোটবাবু!"

"তাই বুঝি চাকুরি ছেড়ে 'গাজনে' মন দিয়েছিস্ ?

কেশব মৌন হইয়া রহিল; জীবনকৃষ্ণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "সে ভালই, কেননা, সারাদিন খেটেখুটে একটু আমোদ করার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিকই; কিন্তু কেশব, শুনলুম এ সব গাজন-টাজনে শিবঠাকুরের নামে সিদ্ধি-টিদ্ধিরও সদ্ব্যবহার তোমরা করে থাকো ?"

কেশব মাথা নীচু করিয়া মৃদু-স্বরে উত্তর করিল 'সারাদিনের খাটুনিতে—এলিয়ে পড়া দেহটাকে একটু চাঙ্গা করে নিতে—"

বাধা দিয়া, দৃঢ়তার সহিত জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "না কেশব, গাঁজা-ভাঙ্ এ গুলো খাওয়া পাপ! শরীরটাকে সতেজ রাখবার ওজুহাতে বিষ খাওয়া অভ্যাস করা কি ঠিক্ ?"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন "আমাদের এ গরিব দেশে সকলের একবেলা রীতি-মত অন্ন জুটে না; অনশনে-অর্দ্ধাশনে, আর ছেঁড়া-কাপড় পরে কোনও মতে লজ্জাসরম ঢেকে রাখ্তে হয়! এর উপরে উচ্ছন্ন যাবার জন্যে নেশা করাটা কি খুব দুঃখের বিষয় নয় ?"

অনুচ্চস্বরে কেশব উত্তর করিল "বিলেত হতে যে সকল বোতলের আম্দানী হয়ে থাকে, তার সবই ত এ গরীব দেশে উজাড় হয়ে থাকে—ছোটবাবু! তার অনুপাতে আমাদের

একটু-আধটু নেশা আর তেমন কি বেশী? তবে হাঁ, সেগুলো সব বড়লোকদের ভোগের জন্য! ছোটলোক তার সোয়াদ পাবে কেমন করে?"

"আদার বেপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি কেশব? তোরা গরীব; গরীবের কথাই তোদের ভাবা উচিৎ? যে পয়সাটুকু নেশাতে তোদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাতে দুবেলা, চারিটি ভাত পেটভরে তোরা নিশ্চয়ই খেতে পেতিস্!"

লজ্জা পাইয়া কেশব উত্তর খুঁজিয়া পাইল না—মাথা নীচু করিয়া নীরবে রহিল।

জীবনকৃষ্ণ আর বেশী কথা না বলিয়া, গোটা দুয়েক গাজনের গান বাঁধিয়া কেশবের হাতে দিলেন;—রাত অধিক হইয়াছে বলিয়া কেশবের দল ছোট কর্ত্তাবাবুকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল।

আহ্নিক সারিয়া ঠাকুর-দালান হইতে হরিমোহিনী জীবনকৃষ্ণকে ডাকিয়া জানাইলেন "ভাত দেওয়া হয়েছে!"

হরিমোহিনী এ বাড়ীর শিষ্যা। বাল্যকালে বিধবা হইয়া স্বামীর তিনকুলে আর কেহ না থাকায়, যথা সর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়া গুরু-গৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন। জীবনকৃষ্ণের অগ্রজ জগৎকিশোরের নিকট হইতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিষ্যা হইলেও এ বাড়ীতে হরিমোহিনীর প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। পূজাপার্ব্বণে, বৈষয়িক পরামর্শে, অতিথি-অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় হরিমোহিনীর ব্যবস্থাই সকলের আগে চলিত। বহুদিন ধরিয়া বাস করায়, এ বাড়ী তাঁহার স্বগৃহেরই মত মনে হইত! দিনে ত্রি-সন্ধ্যা, প্রত্যুষে ঠাকুরের জন্য পুষ্পচয়ন, মধ্যাহ্নে গুরুদেবের চরণামৃত পান এবং আহারাদির পর অপরাহ্নে তত্ত্বকথা শ্রবণ তাঁহার অবশ্য করণীয় নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল।

---

(২)

জীবনকৃষ্ণ আহারে বসিলে বিনা-ভূমিকায়ই জগত্তারিণী বলিলেন "আচ্ছা, ঠাকুরপো, তোমায় কতকরে বল্‌ছি যে আরো একটি বিয়ে কর; কিন্তু কিছুতেই তা'তে কান দিচ্ছ না। আমাদের কথাগুলোর দাম কি কিছুমাত্র নেই?"

জীবনকৃষ্ণের পিছনে হরিমোহিনীও সেখানে আসিয়াছিলেন। কর্ত্রী-মা'র কথার সমর্থন করিয়া তিনিও বলিলেন "আমিও মা, ঐ কথাটি ওঁকে কত করে বলেছি—একটা ছেলে পিলের পিত্যেশ কে না করে?"

ঈষৎ রুষ্ট-ভাব প্রকাশ করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "অনেক অনুরোধ-উপরোধই করা হ'ল, কিন্তু কিছুতেই তা' যেন গেরাহ্যির মধ্যে আস্‌ছে না!—আজ 'সাম্‌না-সাম্‌নিই কথাটা পাড়া গেল—দেখা যাক্ কি আদেশ হয়!"

হরিমোহিনী বলিলেন "সত্যি মা, বড়কর্ত্তাপ্রভু একটি কথা বল্‌লেই ওঁর কি আর অসম্মতি হয়; দাদার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি ওঁর।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটু দুঃখিত ভাবে জগত্তারিণ বলিলেন "না-বলুন নাই; আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ; ওঁদে মনের কথার আমরা কি বুঝি!"

আহারে বসিয়াছিলেন জগৎকিশোর, তাঁহার এগার বছরের ছেলে কুমার আর জীবনকৃষ্ণ! এমনি জীবনকৃষ আলাপে ব্যবহারে জগত্তারিণীকে বিশেষ সম্ভ্রম করিয় চলিতেন, তদুপরি দাদার সাম্নে ত তিনি একেবারে বলির ছাগ। জীবনকৃষ্ণ এ প্রৌঢ় বয়সেও অগ্রজে চোখে চোখে চাহিয়া কথা বলিতেন না; তাই আজ জগৎকিশোরের সাম্নে জগত্তারিণীর কোনও কথা উত্তর করাই জীবনকৃষ্ণের অসম্ভব হইল। নাকে-মুে কোনও রকমে চারিটা ভাত ত্রস্তে গুঁজিয়া উঠিয়া যাওয়া জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বুভুক্ষায় পরিতৃপ্তির অঃ তাহার কাছে বিষ বোধ হইতে লাগিল। জগত্তারিণী বুদ্ধিমতী প্রশ্নে-প্রশ্নে জ্বালাতন করিয়া তুলিলেও এক্ষেত্রে যে বিন্দুমা উত্তরের প্রত্যাশা করেন না, ইহা তিনি আগে হইতে জানিতেন! সুতরাং আর বিশেষ কিছুই বলিলেন না, শুধ পরিবেশন করিতে করিতে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন কেমন করিয়া তিনটি প্রাণীর অত্যধিক মনোযোগের সহিত নীরবে আহার-কার্য্য সমাধা হইতেছে; আর, একটা কথাও

বলিতে না পারার উদ্বেগ কিরূপে জীবনকৃষ্ণের আহার পং করিয়া কঠোর পীড়া দিতেছে !

এতগুলি কথাবার্ত্তার মধ্যেও কিন্তু জগৎকিশোর টুঁ শব্দটি করিলেন না। সময়ে সময়ে তিনি একটু বেশীরকমেই গম্ভীর হইয়া পড়িতেন, এবং তাঁহার এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য জগত্তারিণীকে অল্প-বিস্তর পীড়িত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিত।

কর্ত্তাদের আহার হইয়া গেলে, জগত্তারিণী স্বামীর পাতে ভাত বাড়িয়া লইয়া, খাইতে বসিলেন ; কিন্তু খাইতে বসিয়া একা তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, ছোট-জা কল্যাণীর আজ পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়ার দরুণ মন খানা কেমন শূন্য বোধ হইতেছিল।

খাইতে রুচি না হওয়ায় জগত্তারিণী আনমনে বসিয়া মাখা ভাতগুলি থালার উপর হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে সন্তর্পণে জীবনকৃষ্ণ ঘরে ঢুকিলেন। জগত্তারিণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"একি ঠাকুরপো ! এখনও ঘুমোও নি যে ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "বৌদি ! একটা কথা তোমায় বল্‌বো—অপরাধ নেবেনাত ?"

"অপরাধের না হলেও, অপরাধ নেওয়ার মতন ততটা পাগল ত আর আমি এখনও হইনি"।

"অপরাধের না হলেও, খুব স্বাভাবিকও নয় বলেই, কথাটা বল্‌তে একটু বাধা-বাধা ঠেক্‌ছে।"

জগত্তারিণী উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নীরব রহিলেন; জীবনকৃষ্ণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "বৌদি! মাঝখানে একটা [illegible] কথা তোমায় বলি;—একজন ইংরেজ কবি একখানা [illegible] বই লিখেছেন; সে খবর তুমি অবশ্য জান না; তবে [illegible] হয়ত তোমার বুঝতে বেগ পেতে হবে না যে, তিনি তাতে দেখিয়েছেন—একটা প্রবল আবেগ মানুষের বুকে চেপে রাখ্‌লে তার প্রাণ পর্যান্ত নষ্ট হতে পারে!"

অসহিষ্ণু হইয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তোমার অত শত ভূমিকা সরিয়ে রেখে, আদত কথাটা কি খুলেই বলে ফেলো শুনি!"

জীবনকৃষ্ণ কথাটা একচোটেই বলিয়া ফেলিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে গিয়া কথাটা তাঁহার কাছে এমনি বে-মানানো লাগিতেছিল যে কিছুতেই সহজে ইহা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল না; তাই আরম্ভ করিতে গিয়াই অনেকগুলি বাজে কথা বাহির হইয়া পড়িল। তবু আজ তার বলা চাই-ই! তাই কাসিয়া গলাটাকে একটু সরল করিয়া তিনি বলিলেন "আচ্ছা বৌ-দি, কেউ যদি এসে তোমায়

বলে, দাদা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তোমার আরও একটি বিয়ে হোক্, এ তা'হলে তোমার কেমন লাগে ?"

"এই অপ্রিয় কথাটা বল্‌বার জন্যই বুঝি তোমার অত ভূমিকা করা হচ্ছিল ?"

"আমার স্ত্রী বর্ত্তমান থাক্‌তে তবে, আরও একটি বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি কেন কর শুনি ?"

"ছেলেপিলে না হলে, পুরুষমানুষ অনেকবারই বিয়ে করতে পারে, সেত শাস্তরেরই কথা ; কিন্তু স্বামী থাক্‌তে মেয়েদের অনেক বিয়ে, এ অনাছিষ্টি কথা তোমায় কে শেখালে বল্‌তে ?"

কথাগুলি যদিও তীব্র বিতৃষ্ণার ভাবেই জগত্তারিণী বলিয়াছিলেন, তথাপি সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "শোন বৌ-দি! পদে পদে শাস্ত্রের সমাজের-ধর্ম্মের কথা তোমরা আওড়াও, যেন তোমরা জাননা এমন কিছুই এ জগতে নাই। কিন্তু যদি বুঝতে, কত'টা তোমাদের জানার বাইরেও রয়েছে, তা'হলে আর এসব আজ্‌গুবি কথা বল্‌তে ইচ্ছা হতো না। তোমরা কি মনে কর, শাস্ত্র, যুক্তি তর্কের বাইরে—একটা যাচ্ছেতাই, খামখেয়ালী। কিন্তু, তা' নয়, শাস্ত্র, যথার্থই নানা বহুদর্শিতার, নানা চিন্তা গবেষণার ফল। সুতরাং ইহা যুক্তিতর্কের

বাহিরে নয় ; যা কিছু ব্যতিক্রম, তা আমাদের আচরণের জন্যেই হয়ে থাকে।

অবাক্ বিস্ময়ে জগত্তারিণী বলিলেন, "তবে কি যা' সমাজ করে তা' শাস্ত্রে বলে না ?"

"বলেনা ঠিক নয় ; তবে অনেকটা বলে আর অনেকটা না ? যে টা আমাদের স্বার্থ-সিদ্ধির প্রতিকূল, তার জন্য আমরা একটা মনগড়া শাস্ত্র তৈয়ারী করতে কিছুমাত্র ইতঃস্তত করিনে !"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন" এই ধর-না তোমাদের নারী-জাতির কথা ; সমাজে তোমরা পুরুষের বিলাস-সামগ্রী, আর শাস্ত্রে তোমরা জগদ্বিকাশের আদিরূপা !—নিজ স্বার্থসিদ্ধির এমন অমোঘ অস্ত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে বলতো ?"

এ সব কথার উত্তরে কি বলিবার আছে স্থির করিতে না পারিয়া জগত্তারিণী অবাক নেত্রে জীবনকৃষ্ণের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, আর জীবনকৃষ্ণ অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিলেন "মেয়েদের উন্নতির পথ থেকে বঞ্চিত করে যে কি ঘোর অহিত-সাধন আমরা নিজেদের করছি ; আজিকার এই নানা সমস্যার দিনে, তা আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দরকার করে না বৌ-দি !"

"সে অহিতটা কি ঠাকুর পো ?"

অহিত অনেক কিছু। তবে একটা কথা বলি শোন ছোট ছোট শিশুরাই বড় হয়ে দেশের ভবিষ্যৎ তৈরী করে আর, তাদের শিক্ষার দায়িত্ব প্রথমে তোমাদেরই হাতে থাকে তাই দেশের উন্নতির জন্য তোমাদের কর্ত্তব্য কত গুরুত্ব ভেবে দেখ দেখি ? আর তোমরাই যদি ঠিক্-ঠিক্ তৈরী না হও, তবে তারাই বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠবে কেমন করে ?"

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া জীবনকৃষ্ণ আবেগের সুরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন "বল্‌তে মনে দুঃখ হয়, সংসারকে সমাজকে সুদৃঢ় করতে হলে, চলনশীলতার ঘাত প্রতিঘাত সয়ে যাওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তা আমাদের মোটেই নেই বলেই অভাবটা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে !"

বিরক্তির সুরে জগত্তারিণী বলিলেন "ও সব বক্তিমা ছেড়ে দিয়ে, কথাটা স্পষ্ট করে বল্‌লে কিছু দোষ নেইত ?"

"স্পষ্ট আর কি বল্‌বো ! এই ধর-না, আমার এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাক্‌তেও আর এক বিয়ের জন্য তোমরা পীড়া-পীড়ি কর্‌ছো ! কিন্তু এতে পরে যে কি ভীষণ বিষের সৃষ্টি হতে পারে, সে চিন্তাত কস্মিন্ কালেও তোমাদের মনে জাগে না আমাদের মাঝে সব চেয়ে বড় ধার্ম্মিক সে, যার "ষাট্-বছরে

আছে পঞ্চম পক্ষ ;” আর তিনি অসতী, যিনি সঙ্গত কারণে আবার বিবাহিত হতে ইচ্ছে করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত আন্দোলন উদ্দাম হয়ে ওঠে !”

“বিধবার বিবাহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর ?”

“মঙ্গলকর কি নয়, সে কথা আলোচনা করার সময় এ নয়, তবে একথা জোর করে বলা চলে যে, বিধবা-বিবাহ সত্যি সত্যিই যদি সমাজের মঙ্গল-সাধনের অন্তরায় হয়, তবে পুরুষের বহু বিবাহও কোনও দিক দিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করে না।”

“তা যেন হলো, কিন্তু যদি কারো সন্তানাদি না হয় ?”

জগত্তারিণী আন্তরিক বিশ্বাসের সহিতই কথাটা বলিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ কথাটাকে এমনি হাল্কা ভাবে গ্রহণ করিলেন যে, বস্তুতঃ ইহার একটা কিছু বিদ্রোহ সূচক উত্তর দিবার প্রেরণা তাঁহার মনেই আসিল না ; তাই অনাকৃষ্ট ভাবে তিনি বলিলেন “সে’ত ভগবানেরই অভিপ্রায়, তার জন্য একটা নিরীহ প্রাণীকে প্রত্যাখ্যান কিংবা উপেক্ষা করা কি উচিত ?”

তারপর জগত্তারিণীর কথায় তাঁহার সম্বন্ধে একটা গোপন ইঙ্গিত অনুভব করিয়া একটু সলজ্জ হাসিয়া তিনি বলিলেন

"বুঝেছি বৌ-দি! আমার পরকালের নরকযন্ত্রণার আতঙ্কই তোমাদের এমনধারা ব্যাকুল করে' তুলেছে; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে গুলো থাকা সত্বেও কি পুন্নাম-নরক হতে আমার পরিত্রাণ হবে না?"

বিরাট্ ঝঞ্ঝাবর্ত্তের অবসানে মহাসাগর যেমন শান্ত প্রকৃতি ধারণ করে, জীবনকৃষ্ণও উদ্দাম আবেগ নিঃশেষে উদ্গীরণ করিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাহার আরো বক্তব্য থাকিলেও তিনি কিছুতেই যেন কথা বলিতে পারিতেছিলেন না—ক্লান্তিতে তাঁহার চোখ ছুটিও ঢুলিয়া পড়িতেছিল! জগত্তারিণী এ ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন "তোমার যুক্তি-তর্কের ভাঁড়ারটা আজই সমুদয় উজাড় করে দিয়োনা যেন —ভবিষ্যতের প্রয়োজন কতক সঞ্চয় রাখা মন্দ নয়! রাত অনেক হয়েছে এখন শোওগে যাও!"

---

(৩)

জগৎকিশোর ও জীবনকৃষ্ণ সহোদর ভাই। জগৎকিশোরের জন্মের পর তাঁহার আরও চারি ভগ্নীর জন্ম হয়। জীবনকৃষ্ণ সর্ব্ব কনিষ্ঠ, তাই তিনি অগ্রজ হইতে প্রায় সতের বছরের ছোট। তাঁহাদের নিবাস শ্রীহট্ট জিলায়—ভট্টপল্লী গ্রামে। প্রচলিত কথায় লোকে ইহাকে ভট্-পাড়া বলিয়া থাকে।

গ্রামখানি দেখিতে মনোহর, এবং স্বাস্থ্যকরও বটে। গ্রামের মাঝখান দিয়া যে বড় রাস্তা গিয়াছে, তাহারই দুই ধারে সারিবদ্ধ-ভাবে সাজানো বাড়ীগুলি; তাহাতে ইট্-কাঠের ইমারত্ নাই—অভ্রভেদী প্রাসাদ-রাজি ধনীর গর্ব্ব প্রকাশ করে না; ইহারা সহজ সরল কুটিরাবলী—দারিদ্র্যের ব্যঞ্জক! গ্রামটি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে অবস্থিত এবং সেইজন্য বর্ষার বারি বর্ষণে যখন সমস্ত আবর্জ্জনা ধুইয়া লইয়া যায়, তখন গ্রামখানাকে একখানা বসন্ত-প্রাতের কুসুমোদ্যানের মত সতেজ ও হাস্যময় দেখায়! প্রকৃতির এই বিমোহনী সহজ শোভা পথিকের চিত্ত আকর্ষণ না করিয়া ছাড়েনা।

গ্রামের মাঝে ধানের ক্ষেত নাই ; তা' সত্ত্বেও 'রৌদ্র-ছায়ার' লুকোচুরি খেলার অভাব এ গ্রামে অনুভূত হয় না ; স্থানে স্থানে বায়ুর হিল্লোলে যখন বাঁশবন নাচিয়া উঠে, তখন ঐ বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে যেন 'রৌদ্র-ছায়া' পুলকে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিয়া দেয়। পুকুর-পারের সারি-সারি কদম্ব-ফুলের গাছ হইতে ফুলের রেণু জলের উপর ঝরিয়া পড়িয়া, এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটাইয়া তুলে! তদ্ভিন্ন, দিবানিশি মাথায় 'জট' ধারণ করিয়া একটি প্রধান বটও সে গ্রামে আছে, আর কোন কালের ভূমিকম্পে ধ্বংস-প্রাপ্ত শিবমন্দিরের একটি লতাগুল্ম জড়িত ইষ্টক-স্তূপ তাহারই পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যায়।

এই গ্রামেই জগৎকিশোরের বাস। অবস্থায় না হউক বিদ্যার গৌরবে জ্ঞাতি চারি ঘরের মধ্যেই জগৎকিশোরের ঘর-খানা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। শৈশবে জগৎকিশোর পিতার টোলেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিষ্য-সেবকে যাজনাদির দ্বারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহে তিনি পিতার সাহায্য করিতেন এবং পিতৃবিয়োগের পরে নিজেই এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া কিছুদিন অধ্যাপনা কার্য্যও করিয়াছিলেন।

কাব্য-সাহিত্যে জগৎকিশোরের জ্ঞান ছিল অগাধ। তিনি নিজেও ছিলেন একজন কবি; তাঁহার রচনা ছিল প্রাঞ্জল

ভাব ছিল গম্ভীর এবং সুললিত, আর তাঁহার চরিত্র ছিল অনন্য সাধারণ মহৎ! অর্থের অসচ্ছলতা, পরিবারের অন্ন-সংস্থান-চিন্তা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ ব্যস্ত করিলেও ব্যাকুল করিতে পারিত না। প্রত্যূষে উঠিয়া ঠাকুরের পুষ্পচয়ন, সাজ-সজ্জা, পূজা অর্চ্চনাদিতেই দিবসের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত, অবশিষ্ট সময়টুকু তিনি কবিতাদি রচনা করিয়াই কাটাইয়া দিতেন। বাড়ীর কাহারও মারাত্মক অসুখ-বিসুখ পর্য্যন্ত তাঁহাকে টলাইতে পারিত না; শুধু 'মদনমোহনের' দুয়ারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ধৈর্য্যে আপনার আর্ত্ততা নিবেদন করিয়া দিতেন! ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া তিনি যে নানা প্রকার ফুল তুলিয়া আনিতেন, শিষ্যা হারমোহিনী ভক্তির সহিত সেইগুলি দিয়া সুন্দর মালা গাঁথিতেন, আর সেই মালা জগৎকিশোর মদনমোহনের গলায় পরাইয়া দিয়া পরমানন্দে ঠাকুরের রূপ-সুধা পান করিতেন! দাস্য অপেক্ষা সখ্য ভাবই তাঁহার ভক্তিতে অধিক মাত্রায় প্রকট হইত।

জগৎকিশোরের প্রথমা ভগিনী হৈমবতী, স্বামী কি বস্তু চিনিবার আগেই ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পরপর দুইটি মৃত সন্তান প্রসব করার পর জীবনকৃষ্ণের আগে জগৎ-কিশোরের মাতা মহামায়াকে পা'ন। ভগিনীদের মধ্যে এখন একমাত্র মহামায়াদেবীই বাঁচিয়া আছেন। জীবনকৃষ্ণ যখন

জন্ম গ্রহণ করেন তখন অনবরত দুর্ভিক্ষে ও রাজনৈতিক বিপ্লবাদিতে দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই জগৎকিশোরের পিতা রামলোচন বিদ্যানিধি পৈতৃক জমী-জমা কতক বিক্রী, কতক বন্ধক ইত্যাদি দ্বারা কষ্টে সংসার চালাইতেছিলেন।

জীবনকৃষ্ণের প্রতিভা ছিল অসাধারণ! ইহা লক্ষ্য করিয়াই অর্থের অসচ্ছলতা সত্ত্বেও গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মনোবৃত্তির প্রতিকূলে বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহাকে ইংরেজী স্কুলে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এন্‌ট্রেন্স-পরীক্ষা দিবার মুখেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং দিনকয়েকের মধ্যেই তাঁহার মাতাও স্বামীর অনুগমন করেন। পরপর এই দুইটি দুর্ঘটনায় জগৎ-কিশোর দারুণ ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন; কাজেই বাধ্য হইয়া জীবনকৃষ্ণকে পড়াশুনা ছাড়িয়া সংসারের দিকে মনো-নিবেশ করিতে হইল।

ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে জীবনকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল। অন্নের সংস্থান থাকুক আর নাই থাকুক বাঙ্গালী-পরিবারে বিবাহ জিনিষটার অসদ্ভাব নাই, বরং তৎপ্রতি একটা চমৎকার মোহই আছে! ছেলে জন্মিবামাত্রই, রাঙ্গাপাণা বৌ আনার কল্পনা পরিবারস্থ লোকের মনে জাগে। তাই, জগৎ-কিশোরের সংসারে যদিও বিপুল অভাব অনটন ছিল, অর্থাভাবে

যদিও জীবনকৃষ্ণের পড়াশোনা পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল, তথাপি যখন শুভ মুহূর্তে জীবনকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল, তখন তাহার বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর!

জীবনকৃষ্ণের বিবাহের দুই বৎসর অতীত হইলে, জগৎকিশোরের প্রথমা কন্যা অন্নপূর্ণার জন্ম হয়, তৎপর একটি পুত্র জন্মে, তাহার নাম জয়কুমার; সে এখন এগার বছরের। তার পরে আর একটি শিশুপুত্রের জন্ম হয়, যাহাকে দত্তক নেবার জন্য নিঃসন্তান জীবনকৃষ্ণ জগত্তারিণীর সহিত একদিন সবিষাদ রসিকতা করিয়াছিলেন।

জীবনকৃষ্ণের ইহা সৌভাগ্যই বলিতে হইবে, যে পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহারা যখন নিদারুণ অর্থাভাবে পড়িয়াছিলেন, তখন গ্রামের দশজনের সুপারিশে তত্রত্য ইংরাজী ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে নিয়োজিত হইলেন। সেই অবধি তিনি সেই ইস্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন।

চৈত্রের এক রুদ্র অপরাহ্নে ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনকৃষ্ণ আপনার ঘর্ম্মসিক্ত জামা কাপড়গুলি, অতিষ্ঠ হইয়া ছাড়িয়া ফেলিতেছিলেন, এমন সময় হাসিতে হাসিতে মহেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ; জীবনকৃষ্ণের সমবয়স্ক ও এক গ্রামবাসী। কোনও বিশেষ রক্ত-সম্পর্ক না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে আবাল্য এক অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতার বন্ধন ছিল।

মহেন্দ্রনাথকে গ্রামের অনেকেই সুনজরে দেখিতেন না। বোধ হয়, ইহা মহেন্দ্রনাথের পরোপকার—প্রবৃত্তি বলিয়া একটা গুণ ছিল বলিয়াই! গ্রামের শিশু-বৃদ্ধ-যুবক, সকল

মহলেই তাঁহার সমানভাবে অবাধগতি ছিল। বক্তব্য থাকুক আর নাই থাকুক সভাসমিতিতে বক্তৃতাদান, সেবা-সমিতি সদনুষ্ঠানের চাঁদা সংগ্রহ, রোগীর সুশ্রূষায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ তাঁহার যেমনটি ছিল, তেমনটি প্রায় সচরাচর দেখা যাইত না। নিজের অবস্থা যদিও সচ্ছল ছিল না, তবু, সেদিকে ভ্রূক্ষেপের অবসর তাহার কমই থাকিত; সারা গ্রাম ঘুরিয়া নিঃস্ব গরিবদের খবর নেওয়া তাঁহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল। তথা-কথিত শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহার হইয়া না উঠিলেও, জানিবার একটা দুর্ব্বার প্রবৃত্তি তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল, আর মহতের অনুকরণ করিয়া মহৎ হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তাঁহার মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার অত্যধিক পবিত্র সারল্যের জন্য লোকে অনেক সময় তাঁহাকে পাগল বলিত, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সারল্যমণ্ডিত বহু কাল্পনিক বাক্যালাপ শুনিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

মহেন্দ্রনাথকে সহাস্যমুখে আসিতে দেখিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "কিহে মহেন্দ্র! বড্ড হাসছ যে? গরমেত ভাই, আমার প্রাণটা প্রায় ওষ্ঠাগত।"

"বলকি জীবনদা! আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন শীতে

কাঁপছি !" এই ব্যঙ্গোক্তির বিনিময়ে জীবনকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিলেন "বিচিত্র কি !" কথাটার অন্তরালে বিশেষ কিছুই ইঙ্গিত না থাকিলেও, কি খেয়ালে জানি না, মহেন্দ্র খপ্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "অর্থাৎ পাগলের আবার কথা ! তার আবার মূল্য !—বলেই ফেলনা জীবনদা ! কথাটা আর ভেতরে রেখেই বা লাভ কি ?"

মহেন্দ্রনাথের স্বতঃপ্রফুল্ল মুখ মলিন দেখিয়া জীবনকৃষ্ণ কাঁধে একখানা চাদর ত্রস্তে ফেলিয়া বলিলেন "চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্; দেখি একটু হাওয়া পাওয়া যায় কি না।"

এই বলিয়া জীবনকৃষ্ণ অগ্রসর হইলেন, মহেন্দ্র নীরবে তাঁহার অনুগমন করিলেন ! গ্রামের যেখানে প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় শিবমন্দিরের ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ পড়িয়াছিল, উভয়ে সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। লালরংএর একখানা বড় থালার মতন সূর্য্য যখন পশ্চিমের এক অজানার সাগর কোলে ঢলিয়া পড়িতেন, তখন বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে অস্তরবির এই কিরণলেখা প্রকৃতির গায়ে যে রক্তচ্ছবির আলিপনা আঁকিয়া দিয়া যাইত, সেই মাধুরীমণ্ডিত দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রত্যহই এ সময়ে উভয়ের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। ভগ্ন মন্দিরের এই সমাধিস্তূপে বসিয়া কত সন্ধ্যা তাঁহাদের আকাশকুসুমের

কল্পনায় কাটিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সিপাহীরা ইংরেজের সহিত লড়াই করিয়াছিল, পুষ্পরথের কথা রামায়ণে পড়িতে পড়িতে বিদেশীরা কেমন করিয়া এরোপ্লেন্ আবিষ্কার করিয়াছিল, শা-জাহানকে মমতাজ মরিবার আগে কি অনুরোধ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি কত শত গল্প যে তাঁহাদের মধ্যে হইত, ইহার খবর কেহ রাখিত না, তাহারাও বড় একটা এসব কথাও স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা মনে করিতেন না।

—যাইতে যাইতে হঠাৎ মহেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন "না জীবনদা, আজ ওদিকে যাওয়া হবে না!

বিস্মিত জীবনকৃষ্ণ উত্তর করিলেন "কেন?"

"ভাল লাগছে না।"

জীবনকৃষ্ণ অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোমার কি হয়েছে মহেন্দ্র?"

"কিছু না।"

"বেশ, যে দিকে তোমার অভিপ্রায় হয়, চল!"

ভ্রমণের গতি ফিরিল বটে, কিন্তু অন্যদিনের মত জমাট্ হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া তাঁহারা চলেন নাই; কেননা আলাপটা জমাইতেন মহেন্দ্রনাথ; তিনি যখন বিমনা, তখন জীবনকৃষ্ণকেও বাধ্য হইয়াই নির্ব্বাক্ হইয়া চলিতে হইতেছে।

রাস্তার ধারে একটা মাথা-ভাঙ্গা তেঁতুল গাছের তলায় যাইতেই মহেন্দ্রনাথ হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "এখানেই বস জীবনদা, চল্‌তে আমার ভাল লাগ্‌ছে না।" জীবনকৃষ্ণ বসিলে তাঁহার গা-ঘেঁসিয়া বসিয়া মহেন্দ্রনাথ ব্যাকুল-আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "সবাই আমায় পাগল, অকেজো ইত্যাদি বলে, তুমিও কি আমায় তাই ভাব, জীবনদা!"

"সবাই তোমায় যা বলুক, আমি তোমায় মহৎ বলেই জানি মহেন্দ্র!"

"কিন্তু সবাই যে আমায় পাগল বলে ক্ষ্যাপায়!"

"ক্ষ্যাপাক না, তাতে তোমার কি? পাগল বস্তুতঃ তারাই, যারা আপনাকে পরের কারণে বিলিয়ে দিতে পারে। দেখ্‌ছনা, শিব পাগল; কেননা, সাগরমন্থনে উদ্ভূত রাশি রাশি জিনিসপত্র সকল দেবতা মিলে ভাগ করে নিলেন; তার সঙ্গে যে কালকূট উঠেছিল, সেটাকে কণ্ঠে ধারণ করে সকল দেবতাকে বাঁচিয়েছিলেন ঐ পাগল মহেশ্বর; তেমনই চৈতন্য পাগল, কবীর-নানক পাগল—আধুনিক যুগে [illegible] পাগল!"

"কিন্তু আমি যে লেখাপড়াও শিখিনি আমি যে, একবারে মূর্খ জীবনদা!"

"কতকগুলো ইস্কুলের বই মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব পেলেই যে কেবল শিক্ষিত হয় সে-টা আমি মনে

করিনে ! মানব-প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে যাঁরা উন্নত প্রণালীর পথে চলার ক্ষমতা লাভ করতে পেরেছেন, তাঁরাই যথার্থ শিক্ষিত !"

জীবনকৃষ্ণ, মহেন্দ্রনাথের কতকগুলি খাপ্‌ছাড়া কথার মধ্যে আদত ইঙ্গিতটা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। অনেক জিজ্ঞাসা-বাদ করিয়া তবে বুঝিতে পারিলেন— গ্রামের একটা দুশ্চরিত্র ছেলের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়া মহেন্দ্র তাহাকে সদুপদেশ দিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু ছেলেটা উত্তরে তাঁহার অনধিকার চর্চ্চার কথা শুনাইয়া শাসাইয়াছিল। ইহাতেও মহেন্দ্র নাথের মনে বিশেষ কিছু লাগে নাই। কিন্তু যখন ছেলেটির বাবাও ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়া 'মায়ে-তাড়ানো-বাপে খেদানো' তাঁহাকে 'নিজের চরকায় তেল দিতে' কড়া আদেশ করিলেন, এবং 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' সেজে পাড়া জুড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ানো তাঁহার উচিত নয়, ইত্যাদি কটু-কাটব্য করিলেন তখন মহেন্দ্রনাথ অন্তরে যথার্থই ব্যথা পাইলেন ! একটা অপগণ্ড শিশুর সামনে তাহারই পিতা কর্ত্তৃক এই প্রকার অবমাননা, মহেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল, এবং ইহারই ফলে, জীবনকৃষ্ণের নিকট তাঁহার অন্তকার এই অভিমান-মিশ্রিত খেদ !

এই অবান্তর চিন্তা হইতে মহেন্দ্রনাথকে ফিরাইতে জীবন-কৃষ্ণ নানা কথা বলিলেন, 'দেখ মহেন্দ্র, উপকার করাই যাঁহাদের

জীবনের ব্রত, কোন রকমের বাধা বিঘ্ন দেখেই তাঁরা দমে যান্ না, কোন প্রকার নিন্দা কুৎসায় তাঁহারা ব্যথিত হন না— তাঁ'রা প্রশংসা নিন্দার অতীত! নিত্যানন্দ মারখেয়েও জগাই মাধাইকে কোলে করেছিলেন; যিশু এক গালে চড় খেয়ে অপর গাল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন!) অল্পেতেই এমন দমে গেলে দেশের কাজ কর্‌তে পার্‌বে কেন'?

একটা দুর্দ্দান্ত ছেলের দ্বারা অপদস্থ হইয়া অবধি মহেন্দ্র নাথের কেবলই মনে জাগিতেছিল, ভাল করিতে গিয়া কেন তিনি এমন ধারা অপমানিত হইবেন! কিন্তু ভাল করিতে গেলেই যে অনেক সইতেও হয়, ইহা তখন পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণায় আসে নাই। কিন্তু জীবনকৃষ্ণের কথায় তাঁহার কাছে এ বিষয় এমনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে ছিল যে, লজ্জায় বন্ধুর চোখে-চোখে চাওয়াই তাঁহার পক্ষে যেন অসহ্য হইয়া পড়িল!

এক প্রকার মানুষ আছে, যাহারা বিষ ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াও বেশ চলিতে পারে, বাহিরে উহার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায় না! কিন্তু আর এক রকমের লোক তা' কিছুতেই পারে না, হয় বিষ-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া শেষ হইয়া যায়, নতুবা উহা উদ্গার করিয়া তবে নিস্তার পায়! মহেন্দ্রনাথ ছিলেন, এই শেষোক্ত প্রকারের লোক। জঞ্জাল ভিতরে

জোর করিয়া আট্‌কাইয়া রাখা কোনও কালেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাই আজিকার জমাট্‌ আবর্জ্জনা জীবনকৃষ্ণের সম্মুখে উদ্গার করিয়া তবে তিনি সোয়াস্তি পাইলেন।

(৫)

কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায় রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছিল! তখন তারকা-খচিত নীল আকাশ-চন্দ্রাতপতলে শান্ত ধরিত্রীর শ্যামল অঙ্গনে চন্দ্রকর বিশ্রাম-লাভ করিতেছিল আর মুক্ত হাওয়া আপনার লুপ্ত পুলক ফিরিয়া পাইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে চঞ্চল নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

অভিমান দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মহেন্দ্র আপনার স্বভাব-সুলভ প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইতেছিলেন; তাই উৎফুল্লভাবে তিনি বলিলেন "চল-না জীবনদা" আমাদের বাড়ীতে, মা যে আজ খুব চমৎকার ঘুগ্‌নিদানা রাঁধিয়েছেন!"

"আজ থাক মহেন্দ্র! আর একদিন হবে।"

"না আজই! এখনই!"

মহেন্দ্রনাথের মনটা সরস হইয়া আসিতেছিল, তাই তাঁহার কথাটা উপেক্ষা করিয়া পুনরায় অভিমানের অভিনয় সৃষ্টি করার অভিপ্রায় জীবনকৃষ্ণের হইল না—কাজেই মহেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

উভয়ে বাড়ী পৌঁছিলে, রাত অধিক হইয়া গিয়াছে বলিয়া মহেন্দ্রনাথের মাতা জীবনকৃষ্ণকে খাইয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ! কাজেই গত্যন্তর না দেখিয়া উভয়ে খাইতে বসিলেন। খাইতে বসিয়া মহেন্দ্রনাথের কল্পনার বস্তা খুলিয়া গেল, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন "একটা কথা সব সময়েই আমার মনে হয়, জীবনদা ! সবদেশের সবজাতির মাঝেই যাতে প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ রেখাটা মুছে না যায়, তার জন্য উদ্যম দেখা যায় ; কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীনতার গৌরব সব চেয়ে বেশী থাকিলেও, এ বিষয়ে আমাদেরই সর্ব্বাধিক উপেক্ষার ভাব দৃষ্ট হয়। আমাদের এ নিশ্চেষ্টতার কি কোন কৈফিয়ৎ আছে, জীবনদা ?"

জীবনকৃষ্ণ ইহার উত্তরে কিছুই বলিলেন না ; মহেন্দ্রনাথ অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিলেন "তাই, এক-এক সময় আমার খেয়াল হয়, দেশের লুপ্ত পুঁথিগুলি সংগ্রহ করে, একটা ছোট খাট লাইব্রেরী করি। শুনেছি এমন অনেক পুঁথি আমাদের ছিল যার কতক একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে, আর কতক বিদেশীদের পুস্তকালয়ে স্থান লাভ করেছে !

"তা সত্যি বটে ! তবু মনে হয়, মধ্যযুগের আমাদের হারাইয়া যাওয়া 'স্ব'কে, বাস্তব বৈশিষ্ট্যকে, চিনে নেবার সুযোগও বিদেশীরাই আমাদের দিয়েছেন।"

"অপকারও তারা কিছু কম করেন নি জীবনদা! পরের উপকার করতে গেলে নিজের স্বার্থকে বলি দিতে হয়; তা'ত তুমিই বল্‌লে! কিন্তু তাঁদের মধ্যে উপকারের ভাব যতটুকু ছিল, স্বার্থপরতা ছিল, তার অন্তরালে তদপেক্ষা অধিক!"—

"তবু তারা অনেক করেছেন মহেন্দ্র! ইহাতেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পর ক'দিন মুখে গ্রাস তুলে দিতে পারে বল? যদি কেউ দেয়, সেটা তার দয়া! কিন্তু দয়াতে মানুষের ক'দিন চলে? টিকে থাকবার জন্য চাই স্বাবলম্বন; তদ্ভিন্ন আমাদের অদৃষ্টে সুখলাভ নেই? ঋষিরা যথার্থই বলে গিয়েছেন, "ভিক্ষায়াং নৈবচ"—ভিক্ষাতে আর চল্‌বার সময় নেই। দেশের লোক যে এদিকে সজাগ হচ্ছে, ইহা সৌভাগ্যেরই সূচনা বলে মনে হয়!"

উচ্চ হাসি হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "তবে চল জীবনদা, দেশের কাজে আমরাও সজাগ হই! আর এই ওজুহাতে আমার মত নিষ্কর্ম্মারও কাজে লেগে থাকার একটা সুযোগ হয়!"

কাজের সম্ভব-অসম্ভব ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সহিত কথা বলার অভ্যাস মহেন্দ্রনাথের ছিল না, তবু জীবনকৃষ্ণ জানিতেন, মহেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া যাহা বাহির হয়, তাহা

অসম্ভব হইলেও কৃত্রিম নহে, তাহাতে একটা যথার্থ অনুভূতি বর্ত্তমান আছে।

—রাত বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। একটু-একটু শীত বোধ করায় চাদরখানা খুলিয়া গায়ে দিয়া জীবনকৃষ্ণ "ভেবে দেখা যাক্" বলিয়া উঠিলেন।—বাড়ী ফিরিয়া জীবনকৃষ্ণ নিজের ঘরে দরজা টানিয়া সবে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময়, রান্না ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে, ঠাকুরপো? খাবে এসো। এত রাত্তির কোথায় ছিলে? —ভাত গুলো যে একেবারে জল হয়ে গেল!"

বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া জীবনকৃষ্ণ বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধতায় বাধ্য হইয়া অনেক-দিনই বাহিরে আহারাদি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। বাড়ীতে যে খাইবেন না, যাওয়ার সময় এ কথা না বলিয়া যাওয়ায়, জগত্তারিণী জীবনকৃষ্ণের জন্যও রান্না করিতেন। জীবনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলে দুইজনে একত্রে খাইতেন;—আর জীবনকৃষ্ণ অন্যত্র খাইয়া আসিলে একাই খাইতেন।

জগত্তারিণীর প্রকৃতিটা মাতৃত্বের কোমল স্নেহে এমনই পরিপূর্ণ ছিল যে, জীবনকৃষ্ণের না খাওয়ার দরুণ ঠাণ্ডা ভাতগুলি, এমন কি চাকর বাকরদের পাতেও তিনি তুলিয়া দিতে পারিতেন না। পরদিন সকালের আহারাদি হইয়া গেলে, অবেলায়

যখন জগত্তারিণী পান্তা-ভাতগুলি লইয়া বসিতেন, তখন, লজ্জিত জীবনকৃষ্ণ কোন কোন দিন বলিতেন "কিছুটা আমায় দিলেও ত পারতে বৌ-দি ?"

হাসিয়া শান্ত স্বরে জগত্তারিণী বলিতেন "এ গুলো তোমা-দের শরীরে সইবে কেন ঠাকুরপো ?" একটা কিছু অসুখ-বিসুখ হলে দুশ্চিন্তাটা ত আমারই ভাগে ষোল আনা পড়বে।"

"অসুখত তোমারও হতে পারে বৌ-দি ! আর যদি আমায় না দাও ত' ও গুলো ফেলে দিলেইত পার।"

বিস্মিত জগত্তারিণী উত্তর করিলেন "কি বলছ ঠাকুরপো ! এত গুলো ভাত ফেলে দেবো ! অন্নকে উপেক্ষা করা আর নিজের জীবনকে উপেক্ষা করাতে কিছুমাত্র তফাত নেই জেনো। তা'ছাড়া বাসি ভাতে আমাদের কিছুই অসুখ করে না ত ? স্বামীর ঘর করতে যেতে হবে বলে, ছোটবেলা থেকেই আমরা সব অভ্যাস করে নিই।"

জীবনকৃষ্ণ আর কিছুই বলিতেন না, অবাক্ হইয়া শুধু ভাবিতেন "তোমরা যে জাতের বৌদি ! তা'কে এক অস্বাস্থ্যকর অচলায়তনে আবদ্ধ রেখে, একটা মহীয়সী শক্তির অধিকার হতে আমরা বঞ্চিত আছি। আমরা সেটা বুঝেও বুঝি না ; তাই যে দোষারোপ তোমাদের আমরা করে থাকি, তা'তে তোমরা বিন্দুমাত্র অপরাধী নও।

যাহা হৌক, অন্যদিনের মত, আজও জগত্তারিণী অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া জীবনকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া সসঙ্কোচে বলিলেন "আমি খাবোনা বৌ-দি! জ্যাঠাইমা অনেক পীড়াপীড়ি করাতে সেখানেই খেয়ে এসেছি।"

অভিমান বস্তুটা স্ত্রীজাতির মধ্যেই একটু বেশী রকমের হয়; আর যেখানে অন্তরঙ্গ স্নেহ-বন্ধন বর্ত্তমান, সেখানেত কথাই নাই। ইদানীং জীবনকৃষ্ণ প্রায়ই অন্যত্র খাওয়া দাওয়া সারিয়া আসিতেন বলিয়া জগত্তারিণী মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন; আজ তাই তাঁহার কর্ত্রীত্বের ক্রুদ্ধ অভিমান আহত হইয়া জীবনকৃষ্ণের উপরে পড়িল। তিনি উত্তর করিলেন "সে কি আর আমার জানা নেই ঠাকুরপো? পোড়ামন বোঝেনা, তাই বসে থাকি! তা'ছাড়া আমাদের রান্নাটা কি তেমন রুচিকর হয়; তাই মাঝে মাঝে মুখটা বদ্‌লিয়ে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক—নয়?"

কথা কয়টি বলিয়া, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, সশব্দে রান্নাঘরের দরজা খুলিয়া জগত্তারিণী ঘরে ঢুকিলেন; বৌ-দির অদ্ভুত এই ভাবান্তরে হতভম্ব জীবনকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গিয়া আপন বিছানায় উঠিলেন।

৮

বৈশাখের এক সকালে জমাট্ মেঘ চারিদিক অন্ধকার করিয়া সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, আর গুরু-গুরু গর্জ্জনের সঙ্গে একটু একটু জলও ঝরিতেছিল! জগৎকিশোর প্রাতঃস্নান করিয়া ঠাকুরঘরে ঢুকিয়াছিলেন;—বারান্দায় বসিয়া হরিমোহিণী ফুলের মালা গাঁথিতেছিলেন।

চন্দন ঘষিতে ঘষিতে তখন জগৎকিশোর হরিমোহিণীর সহিত ভক্তিতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন; এমন সময়ে জগত্তারিণী দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া, রুক্ষভাবে বলিলেন "ভগবৎপ্রেমের আস্বাদনে পেটের ক্ষুধা যে মেটেনা, তা'র কি খেয়াল আছে?"

কথাকয়টি শুনিবামাত্র ইহার ভিতরে একটা রঙ্গ উপলব্ধি করিয়া, বাধাপ্রাপ্ত জগৎকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এই হাসিটা ছিল তাঁহার এমন একটা নিজস্ব বস্তু, যা' মানসিক নানা দুশ্চিন্তার দংশন হতে দূরে রেখে তখনকার মত তাঁহাকে প্রশান্তির আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিত! পারিবারিক ব্যয়ভার বহনের অক্ষমতা সময়ে সময়ে তাঁহাকে একটু অস্থির করিয়া তুলিলেও, অন্য কোন রকম চিন্তাই তাঁহাকে

বিশেষ করিয়া অভিভূত করিতে পারিত না। এই আর্থিক অসঙ্গতির উৎকট চিন্তাও এমন কি বহু সময়ে তাঁহার প্রশান্ত ও সরল হাসির অন্তরালে চাপা পড়িয়া যাইত! তাই দুঃখে *অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ জগৎকিশোরের আজও এই গুরুতর অন্নাভাবের বিজ্ঞাপনটা সরলহাসির অন্তরালে উড়াইয়া দিবার* আয়োজন দেখিয়া জগত্তারিণীর অন্তর যুগপৎ ক্রোধ ও ব্যথায় দমিয়া আসিল; পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে, তিনি অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উচ্চহাসি সম্বরণ করিয়া, জগৎকিশোর বলিলেন "দেখ বৌ! এক কাজ কর আজ্‌কের মতন কব্‌রেজদার স্ত্রীর ঠেঙে চেয়ে চারটে চা'ল নিয়ে এসোগে যাও!"

উদ্ধতা ফণিণীর ন্যায় জগত্তারিণী বলিলেন "রোজ রোজ আমি পরের দোরে চা'ল ভিক্ষে কর্‌তে যেতে পারিনে।"

"এতে আর দোষটা কি বল? আমরাত আর সত্যি সত্যি চা'লগুলো রেখে দি-ই না এবং দেবোও না। আজ আমাদের নেই বলেই তাঁদের কাছে চাইছি—কাল আমাদের এলে আবার দিয়ে দেবো।"

চাওয়াটা লজ্জার বিষয় হইলেও, চাহিয়া আনা বস্তুটা যখন আবার ফিরাইয়াই দেওয়া হইবে, তখন তাহাতে লজ্জা বা প্রত্যবায় কিছুই নাই, এই ধারণা জগৎকিশোরের মনে

বদ্ধমূল হওয়ায়, তাঁহার সাংসারিক এ প্রকার অনভিজ্ঞতায়, নিতান্ত দুঃখেও জগত্তারিণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "চাওয়াটা লজ্জার বিষয় নয়ই যদি, তবে চাইতে যাঁর লজ্জা করে না, তিনি গেলেইত পারেন। রোজ-রোজ আমি যেতে পার্‌বো না, তা'তে আমার লজ্জাই করে।"

"কুমার কোথায়? তুমি যেতে না পার তা'কে পাঠিয়ে দাও!"

বেশী কথা কাটাকাটি করার অভ্যাস জগত্তারিণীর কোনও কালে ছিল না, কিন্তু সংসারের নানা জঞ্জালে জ্বালাতন হওয়ায়, তাঁহার যেন আর বরদাস্ত হইতেছিল না; তাই রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন "সকাল থেকে ওঠে অবধি সকলের ফায়-ফরমায়েসে যদি সারাটা দিনই তার কেটে যায়, তবে সে পড়্‌বে কখন আর পরীক্ষাই বা দেবে কি?"

"ছাই পরীক্ষায় কাজ নেই! চা'ল নিয়ে আস্‌তে বলগে!"

গলার স্বর দৃঢ় করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "আজ সেও যেতে পার্‌বে না।"

যাহারা নিতান্ত সাদা-সিধা প্রকৃতির লোক, এবং যাহাদের রাগ সহজে হয় না, তাহাদের রাগ উঠিলে প্রমাদের কারণ হইয়া থাকে! জগত্তারিণীর অদ্যকার এ কঠোরতায় জগৎ-

কিশোর ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাই ক্রুদ্ধ অভিমানে তিনি বলিয়া উঠিলেন "দু'দণ্ড ঠাকুরের নাম পর্য্যন্ত করবার অধিকার আমার নেই! এমনি হাত-পা বেঁধে আমায় তোমরা রাখতে চাও—বৌ!"

ক্রোধের তীব্রতায় তাঁহার চক্ষু জল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল! কে জগৎকিশোরের সরল প্রাণে এই ভাব উন্মেষিত করিয়া দিবে যে, তাঁহার এই মনোবেদনা অহৈতুক! পরিবারের *পরিপূর্ণ দায়িত্ব যাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে, তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে শ্লাঘা নাই; কিন্তু অপালনে অপরাধ আছে,—প্রত্যবায়* আছে। জগৎকিশোর এতকাল পরিবার পালন করিয়া এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আর কেন করিবেন এ কথা আলোচনার বিষয় হইবে না, পরিবারস্থ লোকজন অনশনে কিংবা অর্দ্ধাশনে থাকিলে তজ্জন্য তিনিই দায়ী হইবেন!

জগৎকিশোর ব্যর্থ আক্রোশে কাঁপিতে কাঁপিতে সহসা পূজার আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন; আর ঠাকুর দালান হইতে নামিয়া, শুধুপায়ে, ভিজিতে ভিজিতে দ্রুত 'কবিরাজ-দা'র' বাড়ীর পানে ছুটিলেন।

কবিরাজ-দা'র দুই সংসার ছিল। ঘরে ঢুকিয়াই সাম্‌নে ছোট গিন্নী সৌদামিনীকে দেখিয়া জগৎকিশোর বিনয়ের সহিত বলিলেন "এই যে ছোট্-ঠান্! এ'তে করে আমাদের এবেলার

মতন চার্‌টে চা'ল্ দাও না; আমাদের আজ্‌কে চা'ল্ আনা হয়নি।" বলিয়া ভাঁজকরা ভিজা গাম্‌ছাখানা কাঁধ হইতে খুলিয়া সৌদামিনীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

জগৎকিশোরকে আসিতে দেখিয়া, সৌদামিনীর বুঝিতে বাকি ছিল না, তিনি কি কারণে আসিতেছেন! তাই তাড়াতাড়ি আত্মগোপণ করিবার মানসে ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তখনই বড়গিন্নী ভবতারিণী হেঁসেল হইতে বাহির হইয়া কি একটা কথা লইয়া 'যুদ্ধং দেহি', করায়, তিনিও পূর্ব্ব সংকল্প বিস্মৃত হইয়া, যথাপূর্ব্বং "তথাস্তু" বলিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইবেন, ঠিক্ এমনই সময়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া জগৎকিশোর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আপাততঃ ক্ষণকালের জন্য ভবতারিণীর সহিত সমরাকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া, সৌদামিনী জগৎকিশোরকে বলিলেন "আপনাদের ত ফি-রোজই চা'ল আনা হয় না! আমি কিছুই জানিনে, দিদিকে জিজ্ঞেস্ করুন।"

যদিও এই মাত্রই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধায়োজন চলিতেছিল, তথাপি, অকস্মাৎ এই বিপৎ-পাতে, উভয়ের মধ্যে চট্‌পট্ সন্ধি হইয়া গেল। ভবতারিণীর কাণে 'দিদি' শব্দটি যেন সঙ্গীতধ্বনিবৎ প্রবেশ করিল, তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া তিনি বাহির হইয়া বলিলেন "কি রে সুদাম্ ব্যাপার কি?"

মুখের ভঙ্গিমা করিয়া সৌদামিনী বলিলেন "ও বাড়ীর ভট্‌চায্‌ এসেছেন দিদি! তাঁদের চা'ল্‌ আনা হয়নি বলে, আজ্‌কের মতন চার্‌টে চা'ল দিতে।"

বিদ্রূপের বঙ্কিম স্বরে, ভবতারিণী বলিলেন "এদিকে যে ভট্‌চায্‌ নিজেই এসেছেন, গিন্নী তবে কোন্‌দিকে গেলেন?"

এই বক্রোক্তিতে যে অন্তর্নিহিত শেল ছিল, তাহা জগৎ-কিশোরের প্রশস্ত মনকে কিছুতেই আহত করিতে পারিল না, ইহা গিয়া লাগিল উৎকর্ণা জগত্তারিণীর ব্যথিত বক্ষে!

ভবতারিণীর কথার উত্তরে অম্লান বদনে জগৎকিশোর উত্তর করিলেন "বউত কোথাও যায়নি বট্‌-ঠান্‌, সে বাড়ীতেই আছে। রোজ-রোজ চাইতে তার লজ্জা করে বলে আমি-ই এসেছি।"

"চাইতে আপনার লজ্জা করে না?"

"তা'করে, কিন্তু এ তো আর সত্যি-সত্যিই চাওয়া নয়?"

"এটা তবে কি?"

"আজ আমাদের চা'ল নেই বলে চার্‌টে ধার নিচ্ছি; কাল আমাদের আবার এলে দিয়ে দেবো। লোকে কি টাকা হাওলাত নেয় না?"

উত্তর শুনিয়া ভবতারিণী ও সৌদামিনী উভয়ে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে হাসি সম্বরণ করিয়া

ভবতারিণী বলিলেন "আসল কথা কি ভট্‌চায্‌, এভাবে রোজ রোজ সদাব্রত কর্‌তে বাড়ীর কর্ত্তা মানা করে দিয়েছেন।"

জগৎকিশোরের স্বতঃপ্রফুল্ল মন, এই কথায় একেবারে দমিয়া গেল, ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া তিনি কাকুতির স্বরে বলিয়া উঠিলেন" "চা'ল্‌গুলোত আর ঠিক্‌ঠিক্‌ রেখে দেবো না বট-ঠান্‌! মাইরি বল্‌ছি!"

"মাইরি ত বুঝ্‌লাম! কিন্তু আপ্‌নার নাক কেটে পরের যাত্রা করার মতন মহানুভবতা আমাদের নেই!"

পরিপূর্ণ বিনয়ের সহিত জগৎকিশোর বলিলেন "ছেলে পিলে না খেয়ে আছে, দাওনা চার্‌টে চা'ল বট্‌-ঠান্‌? তোমরাও ত সন্তানের মা!"

জগৎকিশোরকে ফিরানো কিছুতেই সম্ভবপর নয় দেখিয়া সতীনদ্বয় যুক্তি করিয়া অল্প কিছুটা চাউল জগৎকিশোরের গাম্‌ছায় বাঁধিয়া দিলেন। চাউলের পরিমাণে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়াই জগৎকিশোর ফিরিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গাম্‌ছাখানা রান্নাঘরের দাওয়ায় একরকম ছুড়িয়া ফেলিয়াই ক্ষিপ্রপদে ঠাকুর-দালানে উঠিলেন।

(৭)

কাণ পাতিয়া জগত্তারিণী সমস্তই শুনিতেছিলেন; জগৎকিশোরের দেব-প্রকৃতিতে আজ যে ব্যথার চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, আর ফলে অবমাননার যে দারুণ কশাঘাত তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল, আর তজ্জন্য দায়ী যে জগত্তারিণী নিজেই, ইহা ভাবিতে ভাবিতেই জগত্তারিণীর মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। সাংসারিক জঞ্জাল হইতে আগলাইয়া রাখিয়া যতদূর সম্ভব তিনি জগৎকিশোরকে শান্তির আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; জগৎকিশোরের কর্ত্তব্যের নানা গুরুভার অম্লান বদনে লইতে তিনি কোনও দিন কুণ্ঠিত হন নাই। তবে আজ কেন জগৎকিশোরকে এমন ধারা বিব্রত করিতে পতিব্রতা রমণীর এ কঠোর দুরভিসন্ধি মনের মধ্যে জাগিলো! কিন্তু কে বুঝিবে, কতখানি জ্বালায় জ্বলিয়া তবে জগত্তারিণীকে জগৎকিশোরের উপর এমন কঠিন এমন নির্ম্মম হইতে হইয়াছিল।

সময় সময় জগত্তারিণী জগৎকিশোরের ব্যবহারে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতেন! ঘরে চা'ল বাড়ন্ত, ইহা অনবরত জগৎকিশোরকে নিবেদন করিলেও জগৎকিশোরের সাড়া

মোটেই মিলিত না। অনুরোধ-উপরোধে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া কোনও দিন তিনি বলিয়া উঠিতেন "আমার বাক্স তোরঙ্গ কিছুইত নেই, বৌ! যা পাই তোমার কাছেইত দিয়ে থাকি তবে আমায় বারবার বিরক্ত কর কেন?"

বাক্স এবং তোরঙ্গ যে জগৎকিশোরের নাই, তাহা জগত্তারিণী বিলক্ষণ জানিতেন; কিন্তু এ কৈফিয়ৎ ত যথেষ্ট নয়! ইহাতে পেটের ক্ষুধা যায় না বা সংসারের অশান্তির নিবৃত্তি হয় না! পরিবারের দায়িত্ব যাঁহার উপর, বাক্স তোরঙ্গ না থাকিলেও ব্যয়ানুরূপ সঙ্গতি যে তাঁহার অবশ্যকরণীয় এই সহজ সত্যটা জগত্তারিণী স্বামীকে বুঝাইতে বারবার চেষ্টা করিয়াও অপারগ হইতেন। অবশ্য যেদিন জগৎকিশোরের অর্থস্বাচ্ছন্দ্য থাকিত, সেদিন তাঁহার ব্যয়, আয়ের মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত; কিন্তু অর্থের অনটনকালে সংসারের কোনও অভাব-অভিযোগেই যে তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতেন, এমন বোধ হইত না! জীবনকৃষ্ণ বাড়ী থাকিলে, জগত্তারিণী সংসারের অনটন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার ইষ্টারাধনার এক-নিবিষ্টাতাকে সহজে সন্ত্রস্ত হইতে দিতেন না! কিন্তু আজ কয়েক দিন ধরিয়া জীবনকৃষ্ণ বাড়ী নাই! মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেদিন আলোচনার পর হইতে, তাহার মনে নাকি আর্য্যদের প্রাচীন পুঁথি-ফলক ইত্যাদি লুপ্তরত্নোদ্ধার করিবার প্রবল প্রেরণা জাগিয়াছিল;

তাই, ভাস্কর বর্ম্মার দানসূচক এক তাম্রফলক কোথায় মাটীর নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া উহা উদ্ধার করিতে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন।

জীবনকৃষ্ণ চলিয়া গেলে, ধৈর্য্যশীলা জগত্তারিণী আপনার অসীম কর্ম্ম-তৎপরতায় কয়েকদিন কোনও রূপে চালাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু আজ দুই দিন ধরিয়া সংসার একেবারে অচল হইয়া উঠিয়াছে ! তিনি নিজে যে দুইবেলা পেটভরার সুযোগ পাইতেছেন না, সেইজন্য নয়, জগৎকিশোর আর তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগকে যে অনশনে থাকিতে হইবে—এই নিদারুণ কল্পনা তাঁহাকে আতঙ্কে শিহরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই জগৎকিশোরের তপঃ-তৃপ্ত প্রশান্ত অন্তরকে বিব্রত করিয়া তুলিতে, পূজানিরত যোগীর যোগ সাধনে বাধা দিতে আজ এমন অসময়ে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন।

সাংসারিক অনভিজ্ঞতা জগৎকিশোরের এমনি ছিল যে, একটি পোষ্যের জন্য কতটা চাউলের দরকার, ইহা পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল না। তাই আজিকার ভিক্ষা করিয়া আনা চাউলগুলি যে একজনের পক্ষেও যথেষ্ট নহে, সে দিকে দৃষ্টিই তাঁহার পড়িল না। ইহা জগত্তারিণীর অবসন্ন মনকে আরও বেশী করিয়া অথর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছিল।

দক্ষিণের একটা ছোট ঘরে বসিয়া কুমার পরীক্ষার পড়া পড়িতেছিল, ধীরপদবিক্ষেপে জগত্তারিণী তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর নিশ্বাস তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া পরমেশ্বরকে নিবেদন করিল 'যদি উপযুক্ত ক্ষমতা না দাও দয়াময় তবে অক্ষমের স্কন্ধে এমন গুরুভার চাপাইয়া দাও কেন ?"

মাকে আসিতে দেখিয়া কুমার অধীর আগ্রহে বলিল "ভাত হয়েছে মা ? আমার যে একজামিনের সময় হয়ে এলো।"

জগত্তারিণীর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা পড়িল ; তাই করুণ হইতে গিয়া আরও কঠোর হইয়া বলিলেন "সকলেই যার যার ভাবনা নিয়ে আছেন ; সংসারটা যে চলে কেমন করে—তার, ত খবর আর কারো নেই ! বলি ঘরশুদ্ধ সবাই যদি না খেতে পেয়ে মরে, তবে পড়াশোনা করে কি আমার পিণ্ডদান হবে ?"

একান্ত অপ্রত্যাশিত বাক্য আজ সহসা স্নেহময়ী মায়ের মুখে শুনিয়া কুমার স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কাতরভাবে সে উত্তর করিল "আমায় কেন আজ এমন করে বক্‌ছো মা ! আমায় যখন যা' বল, আমিত তখনই তা' করে থাকি !"

কুমারের জলভারাক্রান্ত চক্ষুযুগলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, উচ্ছ্বসিত মনোভাব গোপন করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "নে তোর আর আর সাফাই দিতে হবে না ; ওঠ্‌! দোকান

থেকে টাকাখানেকের চাল চট্ করে নিয়ে আয়! ততক্ষণ আমি উনুন ধরিয়ে ফেলি!"

মায়ের এই অপ্রত্যাশিত আদেশে কুমারের মন দমিয়া গেল। ব্যথিত স্বরে সে উত্তর করিল "দোকানে কেউ-ই আমাদের ধার দেয়না মা! তাছাড়া, আমাদের একজামিনের টাইম্‌ও যে হয়ে এসেছে!"

"রেখেদে তোর একজামিন!—আর ধারেই বা দেবেনা কেন? বলিস্, কালই দাম দিয়ে দিবি!"

"ধারে জিনিস এনে কথা রাখতে পারিনে বলে, দোকানীরা কেউ আমাদের বিশ্বাস করতে চায় না।" কুমারের অশ্রুযুগল জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল! কিন্তু, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়া মাতা বলিলেন

"পাবি – যা'ত!"

"কিন্তু আমার যে একজামিন মা"

"ফের্ ঐ কথা! যা বল্‌ছি!"

কাতর দৃষ্টি লইয়া, মায়ের মুখের দিকে তাকাইতেই, তাহাতে একটা শাসন-কঠোর ভাব দেখিয়া কুমার মাথা নীচু করিয়া লইল!

পিতামাতার কথার প্রত্যুত্তর করার অভ্যাস কুমারের কোনও কালে ছিল না; নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইলেও মায়ের অন্তকার এ আদেশ কুমার মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিল না; বই বন্ধ করিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল;—কিন্তু বড়কষ্টে! *কেননা, হয়তঃ আজ আর তা'র একজামিন দেওয়া হইবে না। কালও 'সার্' বলিয়াছেন, এবারে জলপানি সে পাইবেই পাইবে!* চাউলের সন্ধানে যাওয়াতে যে তাহার আপত্তি, তা'ত নয়; তবে, এ আদেশটা কয়েকঘণ্টা আগে, কি বিকালে করিলে কি হইত না? সংসারের নানা অভাব অনাটনের কথা সে অল্প বয়সেই বুঝিতে শিখিয়াছিল! সময়ে অসময়ে আরও অনেক দিনই চাউলের বোঝা সে ঘাড়ে করিয়া বহিয়া আনিয়াছে—এবং বহুদিন দুঃখ-দারিদ্র্যের নির্য্যাতন, অন্যের অজ্ঞাতে অকুণ্ঠিতভাবে বুক পাতিয়া লইয়াছে। সেজন্য দুঃখ নহে; দুঃখ, তাহার, হয়ত আজ পরীক্ষা দেওয়া হইবেনা বলিয়া!

অবসাদের গুরু-পাষাণ বুকের উপর চাপাইয়া, কুমার ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। দোকানে দোকানে ঘুরিয়া সে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানকেই শুধু বোঝা বাঁধিয়া লইতেছিল, অবশেষে একটি নূতন মুদীর কাছে নিজের আলোয়ানখানা বাঁধা রাখিয়া সে টাকা খানেকের চাউল, আঁচলে করিয়া লইয়া

দ্রুত বাড়ীর দিকে ছুটিল। এবং বাড়ী ফিরিয়াই রান্নাঘরে ঢুকিয়া আঁচল হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া চাউলগুলি ফেলিয়া দিল। জগত্তারিণী জগৎকিশোরের চাহিয়া আনা চাউলগুলি ফুটাইয়া রাখিয়া পথের পানে অধীর উৎকণ্ঠায় চাহিতেছিলেন ; কুমারের এ আচরণে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়াই তিনি বলিলেন "চট্‌করে একটা ডুব দিয়ে আয় বাছা ! আমি ততক্ষণে ভাতটা বেড়ে ফেলি।"

হায় মাতৃস্নেহ ! অপমান মিশ্রিত চাউলগুলি ফিরাইয়া দিবার পরিপূর্ণ অভিপ্রায় থাকিলেও, তোমারই প্রভাবে জগত্তারিণীর সে দৃঢ়তা হয় নাই !—কেননা, কুমার ফিরিয়া আসিয়া তবে কি খাইয়া ইস্কুল যাইবে !

নদীর জলে বাঁধ পড়িলে, সেখানে জলের এক দুর্ব্বার শক্তির সূচনা হয়, এবং কোনও ক্রমে সেই বাঁধ ভাঙ্গিতে পারিলে স্রোতের বেগে যে অদম্যতা হয়, তাহাকে আট্‌কানো তখন কাহারও সামর্থ্যের মাঝে থাকে না। নিরুদ্ধ অভিমান কুমারের অন্তরে ক্রমে জমাট্ বাঁধিতেছিল, এখন মায়ের মমতায় আহত হইয়া অন্তরের সেই অবরোধ টুটিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে সে বলিয়া উঠিল "আমি খাবনা মা ; আমার খিদে নেই !" বলিয়া পরমুহূর্ত্তেই কাগজ-কলম-দোয়াত লইয়া ছুটিয়া পলাইল। জগত্তারিণী পুত্রকে আর

কিছুই বলিবার অবকাশ পাইলেন না; শুধু কুমারের যে ক্ষুণ্ণ অভিমান তরলায়িত হইয়া রান্নাঘরের ভূমি চুম্বন করিতেছিল, জড়অবসন্নতায় অপলক নেত্রে তিনি ইহারই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন!

কর্ত্তব্যের তাড়না বড় কঠোর, বড় তীব্র! মনোদুঃখের দীর্ঘশ্বাস মনেই গোপন রাখিয়া তিনি ঘরময় ছড়াইয়া-পড়া চাউলগুলি খুঁটিয়া তুলিয়া ঠাকুরের ভোগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগৎকিশোরের অনাবিল মন হইতে ইতিমধ্যেই সকল আবর্জ্জনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। পূজা সাঙ্গ করিয়াই তিনি ঠাকুরের ভোগ লইয়া আসিতে হুকুম করিলেন।

বেশী আলাপের প্রবৃত্তি জগত্তারিণীর ছিল না; মর্ম্মব্যথার দুঃসহতায় তাঁহার অশ্রুযুগল জলে ভরিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল! ইহা স্বামীর নিকট হইতে গোপন করিবার জন্যই আজ তিনি অন্য দিনের অনভ্যস্ত লম্বা ঘোম্‌টা টানিয়া দিলেন! এ অস্বাভাবিকতাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, জগৎকিশোর কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া, মদনমোহনের ভোগ লাগাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। Pica

---

আহারাদি সারিয়া জগৎকিশোর নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন, কিন্তু অভুক্ত জগত্তারিণী অক্ষুণ্ণ গাম্ভীর্য্যে সংসারের কাজ যথারীতি করিয়া যাইতেছিলেন! মাঝে মাঝে তাঁহার মন তাঁহার উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও, সংসারের কাজে এতটুকু ভুল তাঁহার হইতে ছিল না—এমনি তাঁহার স্বভাব সুলভ অচঞ্চল ধৃতি! এমনি তাঁহার অনন্যসুলভ সহনশীলতা; তবু সন্তানের বুভুক্ষার চিত্র কল্পনা-নেত্র দর্শন করিয়া তাঁহার চরমধৈর্য্যের বাঁধও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল! কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল, কেন সে এমন করিয়া নীরবে চলিয়া গেল! কাঁদিয়া কাটিয়া সে কেন জানাইয়া দিয়া গেলনা যে—মা তাহাকে খাইতে দেয় নাই! জীবনের এই অল্পপরিসরের মধ্যেই কুমার মায়ের সাথে অনেক দিন হরিবাসর করিয়া কাটাইয়া দিলেও অন্যদিন ত জগত্তারিণীর আজিকার মত বাধে নাই! আজিকার অপরাধ যে সম্পূর্ণ তাঁহারই

সমস্ত দিবসের বুভুক্ষা লইয়া শ্লথদেহে যখন কুমার বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন জগত্তারিণীর অধীর হৃদয় পুত্রকে জড়াইয়া চুম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র হইল; কিন্তু আত্মসংযমের

প্রচুর ক্ষমতায়, তাঁহার সেই অতিমাত্র ব্যগ্রতা লোকলোচনের গোচর হইবার অবকাশ পাইল না; মনের বুদ্বুদ মনেই রহিল; ভগবান রহিলেন শুধু তাঁহার গোপন অভিপ্রায়ের সাক্ষী!

কুমারের অভিমান ইতিমধ্যেই লোপ পাইয়া গিয়াছিল। এবং পরীক্ষায় যদিও আশানুরূপ করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া মনটা একটু কাতর হইয়াছিল, তথাপি, কর্ত্তব্যপালনের পরিপূর্ণ সার্থকতায়, তাহার মনে এই বয়সেই একটা চমৎকার আত্মপ্রসাদ আসিয়াছিল!

ঘরে যেদিন কেরাসিন থাকিত না, সেদিন আলোর অভাবেই সন্ধ্যাকালে ভাই-ভগিনীতে মিলিয়া পিতার কাছে কত পুরাণের গল্প শুনিত! শুনিতে শুনিতে আর সকলেই নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইত, কুমার শুধু অবাক হইয়া ভাবিত, দাতাকর্ণের অপূর্ব্ব দান! বৈশ্বানরের তপ্ত কোলে কুশধ্বজের আত্মাহুতি, পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে গিয়া রামের বনগমন এবং আরো কত কি!

দুর্দ্দিন কখনও একা আসে না, অনেক অনর্থকেও সঙ্গে করিয়া নিয়া আসে! জগৎকিশোরের সাংসারিক অসচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে কুমারেরও জলপানি না পাওয়ায় এক অদৃষ্টহীনতার সূচনা হইয়া গেল; অধিকন্তু, জীবনকৃষ্ণ

ছুটি না লইয়া কোথায় এক তাম্রশাসনের অনুসন্ধানে চলিয়া যাওয়ায়, সেক্রেটারী রাগিয়া তাঁহার স্থানে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। জীবনকৃষ্ণের অকস্মাৎ চাকুরিটি যাওয়া জগৎকিশোরের পারিবারিক দুর্দ্দিনের আরও একটা নির্দ্দেশ বই আর কিছুই নহে!

—দিন কতক পরে জীবনকৃষ্ণ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যখন জগত্তারিণীর মুখে তাঁহার চাকুরী যাওয়ার সংবাদ পাইলেন, তখন কাষ্ঠ হাসিয়া তিনি বলিলেন "এবার আর বিয়ের আব্দার কর্‌বেনা বৌ-দি?"

বিরক্ত হইয়া জগত্তারিণী উত্তর করিলেন "বিয়ের আব্দারেরই যত দোষ, নয়? নানা খামখেয়ালী নিয়ে যেখানে খুসী তুমি ঘুরে বেড়াবে—আর অপরে সেটা সইবে!"

হাসিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "ভাগ্যিস্ ছেলে পিলে আমার নেই।"

"তা'তে কি হলো শুনি?"

"তেমন কিছু নয়; তবে কথাটা কি জান বৌ-দি! ছেলে মেয়ে হয়েছে বলে সংসারের ভাবনা নিয়ে তোমরা যতটা বিব্রত, আমি ততটা বিব্রত সহজে হয়ে পড়্‌ব না।"

"ছেলে পিলে ছাড়াও কি আর কোনও ভাব্‌না নেই তোমার?"

"ভাবনা যদি কিছুর থেকে থাকে, তবে তা'ত তুমিই ঘাড় পেতে নিয়েছ বৌ-দি! সাধ করে আরও একটীর ভাব্‌নাও ত তুমি নিতে চেয়ে ছিলে!"

তার পরে চট্‌ করিয়া কথাটা উল্‌টাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "যাই বল বৌদি; অনুর ত কোনও রকম বিয়ে হয়ে গেল; এখন যে আরও একটি আছে, তাকে পার করার চিন্তা সময় সময় আমায় অস্থির করে তোলে বটে!"

সুযোগ পাইয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তবু যাহোক পরের ছেলে পিলেদের জন্যও কিছুটা দরদ্‌ আছে"!

জলভারাক্রান্ত চক্ষে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "তেমন কথা বলোনা বৌ-দি! এরাই আমার সব! ভগবান্‌ আমায় বঞ্চিত করেছেন বলে, তোমরা এমন করে নির্দ্দয় হয়োনা!"

এ ভাবটা চিরদিন থাকিলে হয়! জগত্তারিণীর মনে একটা কৌতুকের হাসি জাগিয়া উঠিল।

ক্ষিপ্রভাবে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "এ আন্তরিকতার ব্যত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমারও একটা কিছু ভালমন্দ হয়!"

এরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে কুমার আসিয়া বলিল "কাকাবাবু, বাবা আপনায় ডেকেছেন!"

সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্তভাবে ধীরে ধীরে জীবনকৃষ্ণ ঠাকুরদালানে উঠিলেন! মালা জপ করিতে করিতে জগৎকিশোর বলিলেন

"জীবন, ছেলে মেয়ে ক'টির জন্মদাতা বটে আমি, কিন্তু আমি এখন একান্ত অসমর্থ এবং সংসারের ভার তোমারই উপরে সম্পূর্ণ, তাই জানিয়ে দেবার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম!"

জীবনকৃষ্ণের চাকুরি যাওয়া সম্বন্ধে কোনও কথাই জগৎকিশোর উল্লেখ করিলেন না, একটা তিরস্কারের কথাও না; কেবল নিজের অক্ষমতার কথাটা জানাইয়া, ভ্রাতৃবৎসল অনুজের সহায়তা যাচ্ঞা করিতেছিলেন মাত্র!—সেইজন্য আরও বেশী করিয়া তিনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

জপের মালাটা মাথার উপর হইতে নামাইয়া তামার পাত্রে রাখিতে রাখিতে জগৎকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাক্, যে কাজে তুমি গিয়েছিলে, তা'র কি হলো!"

কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "তু'খানা তাম্র ফলক উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি!"

"তা'তে কি লেখা আছে!"

"পাঠোদ্ধার এখনও রীতিমত হয় নি; অল্পস্বল্প যা' হয়েছে, তা'ও প্রত্যয়যোগ্য নয়! এটাকে নরওয়েতে ষ্টেন্‌কনোর কাছে পাঠানো স্থিরীকৃত হয়েছে!"

"ভারতের শাস্ত্রচর্চ্চাটা বুঝি এখন সাগর ডিঙ্গিয়ে আশ্রয়-ভিক্ষে করছে?"

যথার্থই ; আমরা প্রতিপদেই বড্ড পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি ; তবে দেখা যায় এ পরনির্ভরশীলতার লজ্জাকে ঘুচাবার জন্যে একটা স্বাবলম্বনের প্রেরণা আমাদের মাঝে বর্ত্তমানে জাগ্‌ছে !"

উচ্চ-হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমারও, এ পরনির্ভরশীল ভাইটীর অবস্থাটা ভুলে যাওয়ার অসম্ভবরকম প্রেরণাটা এসে না পড়ে !

দাদার এ পবিত্র রহস্যে সহসা লজ্জা পাইয়া জীবনকৃষ্ণ সরিয়া পড়িলেন ! কুণ্ঠার সহিত তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দাদার সাম্‌নে এমনভাবে মনটাকে রাস-ছাড়া করার প্রবৃত্তিটা আজ তাঁহার কেন হইল ?

(৯)

সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ ক্রমে সুকঠিন হইয়া উঠায়, জীবনকৃষ্ণ অর্থাগমের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা মানুষের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে, মহৎকর্ম্মে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। জীবনকৃষ্ণেরও মহৎ প্রবৃত্তি দারিদ্র্যজনিত নানা দুশ্চিন্তার অন্তরালে চাপা-পড়িয়া গেল!

ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির বার্ত্তা পাইয়া বিদেশীরা যেমন এদেশে দলে দলে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, আগেরকালে আসামের প্রতিও বাংলাদেশবাসীর একটা অনুরূপ মোহ ছিল। দারিদ্র্যের তাড়নায় অস্থির হইয়া, অর্থসঞ্চয় মানসে বাংলার বহু শ্রমিক একবার আসামে গিয়া, যখন বেশ সচ্ছল হইয়া উঠিত, তখন আর গতায়াতের দুর্গম পন্থা অতিক্রম করিবার কষ্ট তাহারা স্বীকার করিতে চাহিত না; কাজেই মায়ের কথা, ভায়ের কথা এমনকি দেশ-মাতৃকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনটাতে প্রত্যাবর্ত্তনের মায়া জাগাইতে সমর্থ হইত না! অধিকন্তু, আসামের গিরিতে গিরিতে, কন্দরে-কান্তারে-চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়া প্রকৃতিরাণীর যে গরিমাময় নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া

উঠিয়াছে, মানুষের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য ইহাও বড় একটা কম প্রলোভন নহে। বস্তুতঃ, আসামের সেই ভীতি-বিস্ময়-মিশ্রিত নির্জ্জন নিঃসঙ্গতার মধ্যে পর্ব্বতমালা, আর তার শ্বেত শুভ্র তুহীন মেখলার সন্তর্পন আলিঙ্গনকে চিরসঙ্গী করিয়া লইবার তরুণ আনন্দ মনকে একান্ত ভরপূর করিয়া তোলে! আর এই ওতঃপ্রোত সৌন্দর্য্যের মঙ্গলগীতি শ্রীর নির্ম্মল আসঙ্গ লাভ করিয়া, বর্ষণাভিষিক্ত মৃদু ধরণীর প্রায়, দারিদ্র্য-দীর্ণ ও আশাহত মানবমনকে মুঞ্জরিত করিয়া তোলে! এ মোহ টুটাইয়া যাওয়া কি সহজ?

দুপুরের আহারাদি সারিয়া জগত্তারিণী ঠাকুরদালানে মাদুর পাতিয়া একখানা মহাভারত নিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু বসিয়া, মহাভারতের পাতা উল্টানোই তাঁহার সার হইল; কেননা, জীবনকৃষ্ণ আজ আসাম রওনা হইয়াছেন বলিয়া, সে দেশ, সম্বন্ধে যে এক স্বভাবিক বিভীষিকাময় আতঙ্ক, তাহাই তাঁহার মনখানাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল!

জগত্তারিণী আন্‌মনে বসিয়া নানা দুর্ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় কুমার আসিয়া ডাকিল 'মা!"

পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহের কোমলতায়, জগত্তারিণী তাহাকে কোলে জড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"কি বাবা?"

কুমার কিছুই বলিতে পারিলনা; শুধু অশ্রুদুইটি জল-ভারাক্রান্ত করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল!

মমতামণ্ডিত স্বরে জগত্তারিণী কুমারের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোর কি হয়েছে কুমার! এমন কচ্ছিস্ কেন বাবা?"

আর্দ্রকণ্ঠে কুমার উত্তর করিল "আমি পাশ করেছি মা, কিন্তু জলপানি পাই নি।"

"না পেয়েছিস্ নাই;—তা'তে কি হয়েছে?"

"বাবা আমায় বক্‌লেন, কেন জলপানি পাইনি মা আমি?— "আমি বলেছিলুম ঠিক্‌সময়ে যেতে পারিনি বলে ভালো পরীক্ষা দিতে পারিনি! তখন রাগ করে আমায় তিনি বল্‌লেন কেন দেরী করে ইস্কুলে গেলুম!"

"এর উত্তরে কিছুই তুই বলিস্ নি?"

"না মা, কেমন করে আমি জানাব যে ঘরে চা'ল বাড়ন্ত হওয়ায়, তুমি আমায় দোকানে পাঠিয়েছিলে এবং তাতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল!"

"এটা বুঝি তাঁর জানা ছিলনা"

"সেত আমি জানিনে, মা!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জগত্তারিণী মনে মনে বলিলেন "তুই জান্‌বি কেমন করে—কুমার! কব্‌রেজ গিন্নীর

শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, এক বেড়ালছানার উপযোগী চার্‌টে চা'ল্ রান্নাঘরের দাওয়ায় ফেলেই খালাস্ ! কিন্তু বাড়ীতে এতটি লোকের পেট যে এক বিড়ালছানার পেটেরই সমান নয়, সে ধারণা করার ত ওঁর কোনও প্রয়োজন ছিলনা ?

কথা কয়টা ভাবিতে ভাবিতে জগত্তারিণীর মনটা দুঃখে ক্ষোভে ভরিয়া আসিতে লাগিল !—কেন এ নির্ব্বোধটা আসল কথাটা প্রকাশ করিয়া নিজেকে সমর্থন না করিয়া নীরবে ফিরিয়া আসিল ! মায়ের এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কুমার বলিল "বাবা না জেনে একটা কথা বলেছেন ; তাতে আমি কিছুই মনে করিনে।" দুর্ব্বার আক্রোশে জগত্তারিণী বলিলেন "না জানার অভ্যাসটাত ওঁর চিরকালেরই—এ নিরপেক্ষ-ভাব আর কি এজীবনে যাবে ?

"সে যাক্‌গে মা ! কিন্তু বাবা বল্‌লেন আমার আর পড়া-শুনা করে কাজ নেই ; পড়া শুনা কর্‌তে হলে এতগুলো করে টাকা চাই ; সে গুলো আস্‌বে কোত্থেকে ?"

উত্যক্ত জগত্তারিণী বলিয়া উঠিলেন "তাহলে আর পড়ে কাজ কি ? আর মেলেচ্ছ পড়ার জন্যে তোরই বা এত রোখ কেন বাপু ? তার চাইতে ভটচায্ বামুণ হ'য়ে বস্ ; টাকাকড়ি খরচেরও বালাই নেই ; দিব্যি বাজার-হাট কর্‌বে ; নেমন্তন্ন খেয়ে ও দু'চার পয়সা রোজগার কর্‌তে পার্‌বে !"

মায়ের এই কথাগুলিকে সরলভাবেই সত্য মনে করিয়া কুমারের মনটা বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল ! . মা তাহার হইয়াই পিতার কাছে ওকালতি করিবেন ইহা সে ভাবিয়াছিল ; কিন্তু সহসা মায়ের এ মনোগতিতে আশাভঙ্গের এক গুরু দীর্ঘশ্বাস তাঁহার সারা অন্তর মথিত করিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া আসিল ! কিছু কাল নীরবে দাঁড়াইয়া. হতোদ্যমের নিরাশা ভাঙ্গা বুকে চাপিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া গেল !

কুমার যে কখন চলিয়া গিয়াছিল, জগত্তারিণী তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই ; পূঞ্জীভূত দুর্ভাবনার মধ্যে যেন আজ তাঁহার ভাবনার পরিপূর্ণ-শূন্যতা ! নানা দুশ্চিন্তা যখন রাশীকৃত হইয়া মনোবিপ্লবের সৃষ্টি করে, তখন এই চাঞ্চল্যের মধ্যে কোনও প্রকার ভাবনাই, মনের মাঝে আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে চাহেনা ; বায়স্কোপের ফিল্‌মের মতনই, এক এক করিয়া পরপর ভাসিয়া উঠিয়া তিরোহিত হইয়া যায় ।

এইভাবে কিছুকাল চলিয়া যাওয়ার পর, সহসা জগত্তারিণীর চোখে পড়িল, কৃষ্ণপক্ষের ধরণীর তমসাবৃত আকাশের বুকে তারার দেওয়ালী ! চকিতে, ছেড়া মহাভারতখানা মাথায় ঠেকাইয়া রাখিয়া তিনি দ্রুত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন ! সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবু ঘরে আলো জ্বলে নাই, লক্ষ্মীর আসন, শীতল কিছুই দেওয়া হয় নাই; ইহাতে জগত্তারিণী অবাক্ হইয়া

গেলেন! তাঁহার ধারণা ছিল, কল্যাণী যথাকালে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়াছেন! অন্যদিন হইলে তিনি এই কর্ত্তব্য ভ্রষ্টতায় নিজেই লজ্জিত হইতেন, কেননা আত্মনির্ভরশীল তাঁহার পর-মুখাপেক্ষী হইয়া চলার অভ্যাস কোনও কালেই ছিল না। কিন্তু নানা প্রতিকূল চিন্তায় জগত্তারিণীর মন আজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই প্রদীপ জ্বালাইতে জ্বালাইতে কল্যাণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন "এ তোমার কেমন আক্কেল ছোট-বৌ! সাঁঝের বেলা, বাতিখানা পর্য্যন্ত না ধরিয়ে শুয়ে পড়েছ! আমি না হয় একটু আলিস্যিই করেছি, তা'বলে কি এটা তোমারও কর্ত্তব্যের বাহিরে!"

কল্যাণী শিয়রের বালিসটা সাম্‌নের দিকে টানিয়া আনিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। অন্যদিন হইলে, কল্যাণীর এই নীরবতায় চঞ্চল হইয়া হয়ত জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিতেন "এমন অসময়ে এম্‌নিভাবে বিছানায় শুয়ে কেন কল্যাণ! কোন অসুখ করেনিত?" কিন্তু আজ কল্যাণীর এ ভাব মোটেই তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল না।

কল্যাণীকে ছোটবেলা হইতে জগত্তারিণীই গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিবার ভার লইয়াছিলেন, তাই কতকটা মায়ের স্নেহেই তাঁহাকে তিনি দেখিতেন! কিন্তু এই কল্যাণীর চরিত্রটা

ছিল যেন এক অদ্ভুত রহস্য! কোনও কিছু মনের মতন না হইলেই, তাঁহার রোগ হইত, আর সেই রোগ তৎক্ষণাৎ দিন কতিপয় শয্যা আশ্রয় করিতেও তাহাকে প্ররোচিত করিত! শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় সর্ব্ব কনিষ্ঠা কল্যাণী বড় ভাইদের একান্ত আদরের পাত্রী হইয়া পড়িয়াছিলেন; সারাদিনের কর্ত্তব্যের মধ্যে তাঁহার ছিল, কোণাঠাসা করিয়া আহার আর অনবরত নিদ্রা। কাজেই, জীবনের ক্রমপরিসরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র মনুষ্যোচিত সৌজন্যে গঠিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই; তাই অষ্টমবর্ষের গৌরী-স্বরূপে যেদিন কল্যাণী জীবনকৃষ্ণের জীবনসঙ্গিনীরূপে নূতন ঘর আলো করিতে আসিলেন, তখন তাঁহার অস্থিসার শ্যাম দেহে যেমন লাবণ্যের অভাব ছিল, তেমনি তাঁহার অত্যধিক আহার হেতু স্ফীতোদরে, পুঞ্জীভূত-ক্রোধ-ঈর্ষা-হিংসা প্রভৃতির চির-স্থায়ী প্রভাবের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যাইত।

—যেদিন কল্যাণী জগৎকিশোরের পরিবারে প্রথম প্রবেশ করিলেন, সেদিন গ্রামের বুড়ী, যুবতী, বালিকা, প্রৌঢ়া, সুশ্রী, সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল। অবশ্য গ্রামের সবাই কিছু অনিন্দ্য সুন্দরী নহে তা ঠিক, তবু যেমন গান গাইতে না জানিলেও সঙ্গীতে রসানুভুতি যে হইবে না, এমন কিছু কথা নাই; সেই প্রচলিত নীতি অনুসরণ করিয়া গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা

কুৎসিৎ-আখ্যা প্রাপ্ত 'শ্যামা-পিসি'ও বলিতে ছাড়িলেন না ও-মা! কি ঘেন্না গো! এ-কি বৌ ঘরে আন্‌লে ভট্‌চায্‌-গিন্নী!

অঙ্গসৌষ্টবেও তরলায়িত লাবণ্যের উচ্ছলতায় এ গ্রামে মুক্ত-কেশীরই একটা অনন্য-সুলভ সৌন্দর্য্য-গৌরব ছিল! যৌবন-নদীতে জোয়ার আসার আগেই স্বামীর আবাস হইতে তাঁহাকে চিরবিদায় লইয়া পিতৃ-গৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল! এবং আজ প্রৌঢ়ত্বের সিংহদ্বারে আসিয়া অবধি সেখানেই বসবাস করিতেছেন! তাহার দৃষ্টিতে একটা চটুল মাদকতা ছিল, আর সচরাচর হিন্দুর বালবিধবার মত তাঁহার প্রকৃতিতে একটা অকাল-পক্কতাও আসিয়া পড়িয়াছিল! তাঁহার মুখের স্বর শরীরের রঙের মতন মোলায়েম ছিল না, আর বিশেষ পর্ব্বাদি ছাড়া পান ও দোক্তার রসে অহরহই তাঁহার ঠোঁট দুখানা রাঙা হইয়া থাকিত! এ-হেন মুক্তকেশী যখন রাজহংস গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সমবয়সীরা স-কৌতুকে গা-টেপা-টেপী করিয়া বলিয়া উঠিল "মুক্তা-দি! আজ তোমার এক জুড়ি এসেছেগা! এ গায়ে সুন্দরী বলে বড় যে তোমার দেমাক!"

মুক্তকেশী কোনও উত্তর করিলেন না, শুধু তাঁহার চটুল চাহনিতে কৌতুকের হাসি ব্যক্ত করিয়া বঙ্কিম ভঙ্গীতে অগ্রসর হইলেন। নববধুকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন

দেবী

"চমৎকার! এ জিনিসটাকে কোথা হতে আম্‌দানী করলে ভট্‌চার্য্‌-বৌ!" মন্তব্য শুনিতে শুনিতে জগত্তারিণী এমনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, গায়ে পড়িয়া মানুষগুলির এ প্রকার অনর্থক দাম্ভিকতায়, তাঁহার স্বাভাবিক ধীরতার মধ্যে একটা কর্কশ অসহিষ্ণুতা আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই তিনি উত্তর করিলেন "ভগবানের সৃষ্টি-থেকেই, কিন্তু কেন বল দেখি বামুণ-গিন্নী!"

"ছোট একটা "এমনি" বলিয়া মুক্তকেশী বিষয়টা সুবিধার নয় ভাবিয়া ক্ষণেক নীরবতা অবলম্বন করিলেন, কেননা এই অতর্কিত উত্তরের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তর্কস্থলে শ্রেষ্ঠ আসনই তাঁহার জন্য সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকিত, সে দাবী তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্যে অবমানিত হওয়ায় মুক্তকেশী নিজকে বড়ই সঙ্কুচিত মনে করিলেন, তাই প্রতিহত দর্প চাপিয়া বিদ্রূপের স্বরে তিনি বলিলেন "যাক্‌, সুন্দরে আর কিই বা করে দিদি! হাড়্‌ ক'খানার দামও ত কম নয়!—দেশের সেরা কুলীন!',

জগত্তারিণী লক্ষ্য করিতেছিলেন, এই সকল শ্লেষের মধ্যে নববধুটি লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িতেছিল, তাই তীক্ষ্ণস্বরে তিনি বলিলেন 'তা নয়তো কি? তোমাদের মত ও-ত আর, গোষ্ঠী-গোত্রের পরিচয় ছাড়া হয়ে ভেসে আসেনি'। আভিজাত্যের গর্ব্ব সত্যি-ই ত আছে ওর!"

কুটিল হাসিয়া মুক্তকেশী বলিলেন "তা' বটেইত! তা গাড়া, শুনেছি, কোন্ এক রাজা না মহারাজা নাকি বৌয়ের াপের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন।"

তর্কটাকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে দিতে জগত্তারিণীর ত্তি হইল না, তাই গলার স্বর কোমল করিয়া তিনি লেন "ছোট বেলা থেকে মা-বাপ-হারা বলে; তা' হলে ওর গড়নটা কি এমন খারাপ দিদি? দিন কয়েক াজা ঘসা করেনি,' তখন দেখেনিয়ো, কেমন ওর প!"

"তখন এসে তোমার রাজলক্ষীকে দেখে যাবো; এখন তবে বিদায় হই!" বলিয়া মুক্তকেশী শুষ্ক হাসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন!

তর্কের সময় কল্যাণীর প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতিতে জগত্তারিণীর অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও, বস্তুতঃই জগ-ত্তারিণী কল্যাণীকে দেখিয়া অবধি তৃপ্তি বোধ করেন াই! —তাই বলিয়া, মাতৃত্বের অনাবিল মমত্বে তাঁহাকে াদরে বরণ করিয়া লইতে কভু কার্পণ্যও করেন নাই! তাঁহার াতি-নিয়ত সস্নেহ পরিচর্য্যায় কল্যাণীর অবয়বের সৌষ্টব দিন ন বৃদ্ধি পাইতেছিল বটে—কিন্তু আবাল্য উচ্ছৃঙ্খলভাবে ড়িয়া উঠা মনের আবর্জ্জনা যেন কিছুতেই দূর হইতেছিল না।

স্নেহ যখন যথার্থ পথে না চলিয়া বিপথগামী হয়, তখন তাহার ফলও ভয়াবহ হয়; এবং ইহার দৃষ্টান্ত আবাল্য অন্ধ স্নেহে প্রতিপালিতা কল্যাণী। যে কোনও অজুহাতে কল্যাণী যখন শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেন, তখন তাহার কোনও রোগ হইয়াছে ভাবিয়া জগত্তারিণী কবিরাজ-বৈদ্য ডাকাইতেন; কিন্তু কোনওরূপ সেবা শুশ্রূষা-তেই কল্যাণীর রোগ সারিত না। অবশেষে সকলেরই ইহা নিরাকরণ করিতে বিলম্ব হইল না যে কল্যাণীর এ রোগ মনের,—দেহের নয়; সময় সময় জগৎকিশোরেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত, কিন্তু জগত্তারিণীর ভয়ে কিছুই উচ্চ-বাচ্য করিতেন না! তাঁহারই অস্বাভাবিক স্নেহেও অত্যধিক প্রশ্রয়ে কল্যাণী মাটি হইয়া যাইতেছেন, গ্রামের অনেকেই এ কথা বলিলেও জগত্তারিণী এই সব অনুযোগ নীরবে উদরস্থ করিতেন।

কিন্তু যে দিন জীবনকৃষ্ণ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য লইয়া 'আসাম' রওয়ানা হইয়াছিলেন, সেদিন রাত্রি-দণ্ড অবধি ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয় নাই দেখিয়া জগত্তারিণীর শান্তমনও সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন "মেয়েমানুষের এত বাড়াবাড়ি সয় না! বুকের পাটা-

খানাও কি কম? বাড়ীতে যে আরও দুচারজন কেউ-কেটা আছে, তা যেন আর গেরাহ্যির মধ্যেই আসেনা!"

জগৎকিশোর ঠাকুরদালানে পায়চারি করিতেছিলেন; এখন সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন "বুকের পাটাখানা তুমিইত তৈরী করেছ বৌ? ওকে কেউ কিছু বল্‌লে, তুমিইত বাঘের মত চোখ দুটো রাঙ্গা করে তেড়ে আস্‌তে!"

মানুষ স্নেহাস্পদের উপরে বিরূপ হইলে, নিজে তাহাকে শাসন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু, তখন যদি আর কেহ সেই শাসনাধিকার ফলাইতে আসে তাহা হইলে, সে-টা তাহার অসহ্য হয়। উপেক্ষিত স্নেহনিলয়কে সে তখন বুকে জড়াইয়া লইতে অগ্রসর হয়; তাই জগত্তারিণীও যদিবা কল্যাণীকে খুব কড়াকথা শুনাইতেছিলেন, তথাপি জগৎকিশোরের এ শ্লেষ তাহার সহ্য হইল না; তিনি বলিলেন "হাঁ, এটা মস্ত ভুলই হয়েছে আমার! যদি প্রথম থেকেই খুব করে কঠোর শাসন করতুম্ তা হলে বোধ করি ও এত বয়ে যেতোনা।"

হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "সে-টা তোমার আগেই বুঝা উচিত ছিল।" জগৎকিশোরের এ অযাচিত সমর্থন জগত্তারিণীর ভাল লাগিল না; তাই তীক্ষ্ণভাবে তিনি বলি-লেন "হাঁ, একটা মারাত্মক অপরাধ আমি করে ফেলেছি বটে কেন না, এ পোড়া বাংলায় অনেক জা'-শাশুড়ী ঘরে

আনা নূতন বৌকে শাসন যন্ত্রে নিপেশিত করে, আদব-কায়দা-দুরস্ত করে নিতে প্রয়াশ পান।” তারপরেই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন “কিন্তু নিজেরও ত সন্ধ্যা-আহ্নিক হয়নি দেখ্‌তে পাচ্ছি! ঠাকুরপো আজ চলে গিয়েছেন বলে ওরও হয়তঃ মনের গতি ভাল নেই! এখান থেকে একটু চলে গেলে হয় না?”

চলিয়া যাইতে যাইতে—জগৎকিশোর বিস্ময়ে বলিলেন “তোমার বুকখানা যে ভগবান্ কি দিয়ে গড়েছেন বৌ! এত দিনেও আমি বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না! আর তোমাকে চেনার সুযোগ হারানোর মত নির্ব্বুদ্ধিতা ওর না হলে স্পর্শমণির সংস্পর্শে এসে অনায়াসে লোহা সোণা হয়ে যেতে পার্‌তো।”

একথা শুনিতে শুনিতে জগত্তারিণীর হাত দুটি অলক্ষ্যে যুগ্ম হইয়া আসিল; ভক্তিভরে তিনি স্বগত বলিলেন “তোমার মত জলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে এসে মলিন অঙ্গারও আগের জ্যোতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে! চাঁদের কি আর নিজের কিছু আছে?—সূর্য্যকে দিয়েইত তার যত আস্পর্দ্ধা! মহৎ আমি না তুমি!”

কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে জগত্তারিণী একটু অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চমকিত হইয়া শুনিলেন

কল্যাণী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "এমন করে, তিল তিল করে না মেরে, একেবারেই গলাটিপে মেরে ফেল্লেইত আপদ চুকে যায়!"

বিস্ময়-স্তম্ভিতা জগত্তারিণীর মনে হইল যেন জগতের বক্ষের উপরে একটা বিরাট্-ভূমিকম্পের তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে —*একান্ত অভিভূতা তিনি ভাবিতে পারিলেন না, এ তাঁহার সুপ্তি না জাগরণ, স্বপ্ন না সত্য!*

এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি কল্যাণী বড় একটা কথাবার্ত্তা বলিত না; তাই আজ হঠাৎ এতবড় একটা অনুচিত অপ্রিয় কথা কেমন করিয়া সে বলিতে পারিল, জগত্তারিণী ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার দৃপ্তক্রোধ অনুশোচনায় পরিণত হইল। দুঃখের সুরে তিনি বল্লিলেন "কি বলিলি কল্যাণ! মেরে ফেল্লেই আপদচুকে যায়? তা'ত বল্‌বিই। কিন্তু মরার বাড়া হয়ে যখন এখানে এসেছিলি, তখন কে তোকে মরণের মুখ হতে বাঁচিয়ে এনেছিল?"

"একটুখানি যত্ন আত্তি করে রোজ রোজই সে কথা খোঁচা দেওয়াই যদি অভিপ্রায় ছিল, তা'হলে সেটুকু না কর্‌লেইত হতো।"

"হাঁ, উপকার করে সেটার বড়াই বারবার করার চাইতে, উপকার মোটেই করা যে ভাল নয় তা আমিও

জানি! কিন্তু আমার প্রতি সে ধারণা করার দুর্ম্মতি আজ তোর কোথা হতে হ'লো বোন্?"

"আমার দুর্ম্মতিই ভাল; যার যার সুমতি নিয়ে তাঁরা থাকুন! আমায় মিছামিছি জ্বালিয়ে কা'র কি লাভ হয় বুঝি না!"

কষ্টে হাসিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তোর জ্বালাটা কিসে হয় জান্‌লে না হয়, একটু বুঝে সুঝে চল্‌তে পারি!" কল্যাণী কিছুই বলিল না, শুধু বালিসে মুখ গুজিয়া ফুপাইতে লাগিল! ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "আজ তোর একটা অভিনব মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো কল্যাণ! যদিও এটা অনেকটা সত্যি যে, যারা সর্ব্বদা মুখ বুজে' থাকে, তারা ভিতরে ভিতরে নানাকথার জাল তৈরী করে, তবু তোকে কিন্তু তেমনটি ভাব্‌তে পারিনি!" তারপরে একটু থামিয়া তিনি স্বগতই বলিয়া যাইতে লাগিলেন "লোকে বলে, অকৃত্রিম স্নেহ মানুষকে যত সহজে বশে আন্‌তে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না—কিন্তু এত করেও তোকে বশে আন্‌তে পার্‌লুম না, এই যা দুঃখ!"

ক্রুদ্ধা ফণিণীর ন্যায় কল্যাণী বলিয়া উঠিল "কী এমন করেছেন শুনি? এক জনকে বাঘ ভালুকের মুখে পাহাড় পর্ব্বতের অগম্য জঙ্গলে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছেন, এই-ত?

দেবী

কথাটার ইঙ্গিত বুঝিয়া সহসা জগত্তারিণী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; ঘৃণার বিতৃষ্ণায় তিনি বলিলেন "তোর স্বামীর পক্ষে তুই যে কত অনুপযুক্ত সে কথা আজ বল্‌তে বাধ্য হলুম কল্যাণ, যেন স্বর্গ আর নরক !"

এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য জগত্তারিণী চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যাইতে যাইতে শুনিলেন, কল্যাণী বলিতেছে "কেননা, নিজকে সম্পূর্ণ উজাড় করে উচ্ছন্ন যাওয়ার মতন সু-বুদ্ধি এক জনের ছাড়াত আর কারো দেখা যায় না।"

জগৎকিশোর ঠাকুরের আরতি করিতে ছিলেন, আর হরিমোহিনী ঠাকুর দালানে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন! শীতল দিয়া জগত্তারিণী চলিয়া গেলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জগৎকিশোর নিজেই বলিতে লাগিলেন "দয়াময়! জানি না তোমার কি ইচ্ছা।"

—:০:—

(১১)

সে দিনকার নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অপ্রিয় প্রসঙ্গ জগত্তারিণীর মাথাটাকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাই যখন আহারাদি শেষ করিয়া তিনি শুইলেন, তখন কিছুতেই তাঁহার চোখে ঘুম না আসায় সারা রাত এপাশ ওপাশ করা ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার ভাব হইল—তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, কুমার বিদেশে পড়িবার জন্য সবিনয়ে আদেশ ভিক্ষা করিতেছে। পুত্রের আব্দার যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, মায়ের মন আরও কঠোর হইয়া উঠিতেছিল!—তাঁহার মানা না শুনিয়া জীবনে এই প্রথম অবাধ্য কুমারকে শাসন করিতে তিনি ছুটিয়া চলিলেন! কিন্তু স্বপ্নে মানুষ দৌড়িতে পারে না, অক্ষমতার তীব্র যন্ত্রনায় শিহরিত হইয়া জগত্তারিণী জাগিয়া উঠিলেন!—দেখিলেন সত্যি-সত্যি কুমারের জায়গা খালি!

ভাঙ্গাবেড়ার ফাঁক দিয়া অরুণ আলো, আর ঘরের কোনের শিউলি গাছ হইতে ঝরা ফুলের তরুণ সুবাস বুকে করিয়া ভোরের হাওয়া ঘরের ভিতর উঁকি মারিতেছিল!

কিন্তু এ আলো জগত্তারিণীর চক্ষু মুগ্ধ করিলনা; এ হাওয়া তাঁহার দেহে পুলকশিহরণ বহাইল না—স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে করিতে, এক অনির্ব্বচনীয় বেদনা তাঁহার দেহ মনকে অবসন্ন করিয়া তুলিল!

একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কার যাতনায় জগত্তারিণীর মন ব্যথিত হইতেছিল, কিন্তু বাহিরে বিরাট্ সহিষ্ণুতা লইয়া তিনি বিছানাপত্র ভাঁজ করিয়া তুলিতেছিলেন,এমন সময়ে টক্ করিয়া একখানা কাগজের টুক্‌রা মাটিতে পড়িয়া গেল! ক্ষিপ্র হস্তে জগত্তারিণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন, বড় বড় *অক্ষরে লেখা আছে "মা! আমি ইংরাজী ইস্কুলে পড়ব বলে, কাউকে না বলেই নবাবগঞ্জে চললুম।* আমি একা যাচ্ছিনে, সুরেশও যতীনের সঙ্গেই যাচ্ছি! আমি তোমাদের অবাধ্য হইনি মা! কেন না, আমি কি আর বুঝতে পারিনি যে আমরা গরীব বলেই, তোমাদের মনের ভাবটা তোমরা কষ্টে চেপে রেখেছো। হয়ত তুমিই বেশী কাতর হবে, বাবাত নির্ব্বিকার! কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে আমার শুভ কামনা করে সব সহিও! লেখাপড়া না শিখ্‌লে তোমাদের খাওয়াব কি?"

বেলা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছিল! জগত্তারিণী অবসন্ন মন লইয়া অন্যদিনের মতন তৎপরতার সহিত গৃহ কর্ম্ম করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া সব কাজেই আজ তাঁহার

বিলম্ব হইতেছিল! জগৎকিশোর প্রাতঃস্নান সমাধা করিয়া দেব-গৃহে উঠিয়াছিলেন! ঠাকুরঘরের নানা খুঁটিনাটি-ফায়্ফরমায়েস্ যোগাইতে তাঁহার প্রয়োজন হইত বাড়ীর সকলেরই! ঠাকুর ঘরে তুল্সী নাই, বেলপাতা কম, ঘিয়ের শিশিটা কোথায়, কর্পূরটুকু বাতাসে উবিয়া গিয়াছে, ইত্যাদি আব্দার পূর্ণ করিতেই জগত্তারিণীর সকালের অধিকাংশ সময় কাটিত! উত্যক্ত হইয়া তিনি যদিবা কোনও দিন বলিতেন "নিজের স্বার্থটুকু দেখ্লেই কি কেবল চলে?" জগৎকিশোর ঈষৎ রুষ্ট হইয়া উত্তর করিতেন যাঁর অনুগ্রহে সব হচ্ছে, তাঁকে ভক্তি করবার দুর্ম্মতি তোমার মত পাপীর হবেই বা কেন?"

জগত্তারিণী তীক্ষ্ণস্বরে বলিতেন "তা-বলে' ওদিকে নিজের সেবাটাতে ওত বিন্দুমাত্র ত্রুটি হওয়ার যো নেই!"

জগৎকিশোর এ ইঙ্গিত বুঝিতেন, এবং বুঝিতেন বলিয়াই, নীচ স্বার্থপরতাকে মজ্জাগত রাখিয়া শুক্না কাঠে আগুনের মতন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেন না! তাঁহার প্রশান্ত সারল্যের উচ্চ হাসির অন্তরালে এ ব্যঙ্গ আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইত!

রোজ সকালেই কুমার পিতার দেব-পূজার জন্য ফুল আনিতে যাইত!—আজও সে গিয়াছে। মাটির শিব গড়িতে

গড়িতে জগৎকিশোর হরিমোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বেলাতেও কুমার ফুল নিয়ে ফির্‌ছেনা কেন হরিমোহিনি ?"

কুমার এত বেলাতেও ফিরিতেছেন না দেখিয়া হরিমোহিণী ও একটু উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তর দিবার আগেই জগৎকিশোর আপন৽ মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন "আজ কাল্‌কার ছেলে পেলে গুলো একেবারে বয়ে গেছে ; কর্ত্তব্যজ্ঞান যদি মোটে থাকুক—কোথাও হয়ত খেল্‌তে লেগে গিয়েছে !"

এ গুরুতর অন্যায় দোষারোপ উৎকর্ণা জগত্তারিণীর অসহ্য হইল, অগ্রসর হইয়া তিনি বলিলেন "আজ ত সে ফুল আন্‌তে যায়নি !"

বিস্মিত জগৎকিশোর প্রশ্ন করিলেন "এঁ্যা ?—সে তবে কোথায় ?"

"সে নবাব-গঞ্জে পড়্‌তে কাল চলে গেছে।"

"কার অনুমতি নিয়ে শুনি ?"

দৃঢ়তার সহিত জগত্তারিণী বলিলেন "তাকে আমি-ই পাঠিয়েছি।"

"কিন্তু পড়ার ব্যয়টা কার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে শুন্‌তে পাই ? এত আর সত্যিযুগ নয় যে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বালির উপরে "অ, আ' শেখা অথবা হর্‌তকীর কালী দিয়ে

'জানি না' বলিয়া চলিয়া যায়, কেউ-বা মোটেই উত্তর দেয়না! ভাবিতে ভাবিতে উন্মনা কুমারের উপর রোড রলার টানিতে টানিতে কতকগুলি লোক আসিয়া পড়িতেছিল, ভয় পাইয়া কুমার যেই রাস্তার অপরপাশে দৌড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিবা মাত্রই একখানা মোটরে প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল! রক্ষা পাইবার জন্য দ্রুত অন্যদিকে দৌড়দিতে গিয়া, তাহার খালি পায়ে রাস্তার কংক্রীট লাগিয়া এমনি আঘাত করিল যে, পা দিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল! কাঁদিতে গিয়া, এত লোকের সাম্‌নে সে কাঁদিবে কেমন করিয়া এই লজ্জায় উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগ জোর করিয়া ভিতরে চাপিয়া রাখিল!

একান্ত মনে কুমার চলিতেছিল! সহসা পিছনে সাম্‌নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; কোথাও সুরেশ বা যতীনকে দেখিতে পাইল না; অসময় দেখিয়া আজ তাহারাও কি তবে তাহাকে অকূলে ফেলিয়া গেল! অসহায় কুমার অবসন্ন ভাবে ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল!

মন যতক্ষণ সতেজও কার্য্যক্ষম থাকে, শরীরের শক্তি হীনতাটাও ততক্ষণ অনুভূত হয় না! কিন্তু মানসিক ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসে! সারাদিন নির্জ্জলা একাদশী করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কুমার লোহার তারের

বেড়া দেওয়া একটি বড় পুকুরের ধারে বসিয়া পড়িল! পশ্চিম গগনে অস্তরবির রক্ত রাগ তাঁহার চোখে নিদ্রার মদিরতা ঢালিয়া দিল।

জল পিপাসায় তাহার গলা শুখাইয়া ছাতি পর্য্যন্ত ফাটিয়া যাইতেছিল; তাঁহার পঞ্জরের প্রতি অংশকে প্রতিহত করিয়া করুণ দীর্ঘশ্বাস জোরে বাহির হইয়া আসিল; হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়া দেহখানা কষ্টে টানিয়া তুলিয়া,—সে ধীরে ধীরে জল পান করিবার জন্য দীঘিতে নামিল! পান করিবার জন্য যেই সে অঞ্জলি পুরিয়া জল তুলিয়াছে, অমনি শুনিতে পাইল কড়া গলার আওয়াজ—"কোন্ হ্যায়।"

পিছনে ফিরিয়া 'লাল পাগ্‌ড়ীওয়ালা" দেখিয়াই কুমারের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল; অলক্ষ্যে তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে অঞ্জলি-পূর্ণ জল স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল! ভয়ে মৃতপ্রায় সে স্থানুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল!

লালপাগ্‌ড়ীওয়ালা' বলিয়া যাইতে লাগিল "ইয়া দেখ্‌তা নেহি বড়বড় হরফমে লেখা আছে এ পুকুরে নামিলে —ফৌজ্‌দারী সোপর্দ্দ হইবেক্!" তারপরেই গলাধাক্কা দিয়া বলিল "চলিয়ে তব্ থানামে!"

শৈশব সুলভ কোমল স্কন্ধে বজ্র কঠোর হস্তের প্রলেপে ব্যথিত হইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল; আর সঙ্গে সঙ্গে

হেমন্তের আকাশে হঠাৎ মেঘাড়ম্বরে রৌদ্র তপ্ত ধরণীর গায়ে পতিত বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটার মতন, কুমারের অশ্রুজল পুকুরধারের সবুজ ঘাসকে সিক্ত করিয়া দিল! কাতর কণ্ঠে অনুনয় করিয়া কুমার বলিল "কিন্তু আমার যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে!"

যদিও এরকম লোক পাষাণেরই মত নির্ম্মম, তথাপি আজ কি জানি কেন বালকটির জল ভারাক্রান্ত চক্ষের দিকে চাহিয়া, তাহার নির্দ্দয় চক্ষুতে পলক পড়িল!। স্বাভাবিক কর্কশ স্বরটাকে যতদূর সম্ভব সরল করিয়া সে বলিল "আচ্ছা তুমি হামারা সথ চল; পাণি পিয়া দেগা।" এই বলিয়া হাত ধরিয়া কুমারকে উঠাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে সে বলিল "এ পুকুর সরকারী আছে খোকা বাবু, জলে নাম্‌লে জর্‌মানা করে!"

পুকুরের সরকারী-পুলের উপরে ভাঙ্গা-বাল্‌তী দিয়া বার দুই তুলিয়া দেওয়া জল মনের সাধে পান করিয়া আপাততঃ সান্ত্বনা লাভ করিয়া কুমার নিজেকে একটু সুস্থ বোধ করিল। সরকার যে কি জিনিস, এ স্পষ্ট ধারণা অবশ্য তাহার ছিল না, তথাপি ইহা তাহার কাছে একটা প্রহেলিকার মতনই বোধ হইতেছিল যে—এ কেমন দেশ, যেখানে পুকুরে নামিয়া জলপান করিবার অধিকার টুকু অবধি তাহার নাই! তাহাদের

চাহিয়া, তাহারো নির্দ্দয় চক্ষুতে পলক পড়িল !—বজ্র-কঠিন বক্ষে স্নেহের স্পন্দন ছুটিল ! মনে জাগিয়া উঠিল সহসা এক পুরাতন স্মৃতি—তাহার হারানো নিধি একমাত্র ধন সুখলালের কথা ! একদিন সেওত এই ছেলেটিরই মতন দেখিতে এতবড় এবং এমনি সুন্দর সুঠাম ছিল ! হায় ! আজ যদি সে থাকিত ! তাহা হইলে কত বড় না হইত !

গাজীপুরের ঐ দিকে ছিল তাহার ঘর ! তাহার স্ত্রীর যখন মৃত্যু হয়, তখন সুখলালের বয়স ছিল বছর দেড় মাত্র ! তদবধিই পিতার স্নেহের সহিত মায়ের সমম যত্ন মিশাইয়া সে সুখলালকে লালন পালন করিয়া আসিতেছিল, আপনার বলিতে যে তাহার আর কেউ ছিল না !

তাহার একখানা ছোট খাট গমের ক্ষেত ছিল ! স্ত্রীর মৃত্যুর পর, প্রথম প্রথম ভোরে উঠিয়া চারিটা রান্না করিয়া লইত এবং সুখলালকে খাওয়াইয়া কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে রাখিয়া মাঠে যাইত ; বেলা পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া মাটীর কাণ—ভাঙ্গা কল্‌সী দিয়া "কাজ্‌লা পুকুর" হইতে এক কল্‌সী জল আনিত, কাছের মুদীর দোকান হইতে, এক আধ পয়সার তেলনুন লঙ্কার সওদা করিয়া, মা-হারা ছেলেকে বক্ষে করিয়া তুলিয়া আনিত ! সন্ধ্যায় মাটীর হাঁড়ি দিয়া আলুভাতে, কোনও দিন

বা ডা্লে-চালে এক সাথে সিদ্ধ করিয়া গরম-গরম দুইজনে খাইত! পরে ছেলেকে ঘুমপাড়াইয়া নিজে 'তুল্‌সীদাসী' নিয়া বসিত! রাম নাম ভজন করিতে করিতে যখন অনেক রাত হইত তখন কেরোসিনের ডিবাটাকে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া, "সীতারাম" বলিয়া মাতৃহারা শিশুকে বক্ষে জড়াইয়া শয়ন করিত! ছেলে কিছু বড় হইলে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়াই ক্ষেতে যাইত! এইরূপে ক্ষেতের এবং গৃহ সংসারের কাজ করিয়া, ছেলের যত্ন-আত্তি করিয়া, একরূপ নিরীহ ভাবেই তাহার দিন কাটিয়া যাইতেছিল! কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে দেশে আসিল অনাবৃষ্টিজনিত ভয়ানক দুর্ভিক্ষ! অনেক সম্পন্ন গৃহস্থও খাইতে না পাইয়া মৃত্যুর করাল কবলে আত্মাহুতি দিতে লাগিল। নিরুপায় শিউবরণও একমাত্র পুত্র সুখলালকে সঙ্গে করিয়া একদিন সকালে, নিজের খড়ের কুটিরের ভাঙ্গা দরজা-জানালা খোলা রাখিয়াই দেশ, পৈতৃকভিটা ইত্যাদির মায়া পরিত্যাগ করিয়া আসাম রওয়ানা হইল! সঙ্গে লইল তাহার একমাত্র লোটা আর ছেড়া মাদুরের উপর বিছানো শতছিদ্র কম্বলখানা!

দুর্ভিক্ষকে ফাঁকি দিবার মনস্থ করিলেও, শিউবরণকে দুর্ভিক্ষ অব্যাহতি দিল না। নির্ম্মম হস্তে এক দারুণ শেল তাহার বক্ষে হানিয়া গেল। আসামের পথে সুখলাল, পিতার

যত্ন আদর, ইহজগতের মায়া সমস্ত পরিহার করিয়া অজানার স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গেল! কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শিউবরণ ব্যথিত অন্তরকে দৃঢ় করিয়া ভাবিল, ভাঙ্গা কুটীরের খোলা দর্জা দিয়া একবার যখন সে বাহির হইয়াছে তখন সে বাহিরেই থাকিবে; প্রিয়তম বস্তু হারাইয়া রিক্ততাকে সম্বল করিয়া আর সে গৃহে ফিরিবে না! কিন্তু নানা জায়গা ঘুরিতে ঘুরিতে যখন নবাবগঞ্জে আসিল, তখনও মনটাকে সে কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেছিল না। কোন কাজে লাগিয়া থাকিয়া মানসিক বৃশ্চিক দংশন হইতে অব্যাহতি পাইবার অভিপ্রায়ে অবশেষে সে পুলিশেরই কাজে লাগিয়া গেল!

পুলিস সাহেব ছিলেন বাঙ্গালী—তাঁহার ছেলে পিলেদের কোলে পিঠে করিয়া সে প্রায় সুখলালের শোক অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছিল, এমন সময়ে আজ কুমারকে দেখিয়া তাঁহার লুপ্তস্মৃতি পুনরায় অন্তরে সাড়া দিল; সহসা তাহার মনে জাগিল, এমনি এক শান্ত সন্ধ্যার নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে দুর্ভিক্ষদানবের ব্যাদান মুখে, অক্ষম ও অনুপযুক্ত পিতা সে তাহার ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত সুখলালকে ডালি দিয়া আসিয়াছিল! তাহারই অক্ষমতায় সুখলাল মরিয়াছে—এই কথা মনে জাগিয়াছিল বলিয়াই, কুমারকে আজ পান করিবার জন্য সাগ্রহে বাল্‌তী দিয়া জল তুলিয়া

দিল—আর অপলক সতৃষ্ণ নয়নে কুমারের ললিত *অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।—কুমারের* মলিন মুখ লক্ষ্য করিয়া শিউবরণ জিজ্ঞাসা করিল "দিনভর কুছ্ খায়া নেহি বাবু?"—তারপর কুমারের দেহখানাকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "আহা! একদম্ শুখ্ গিয়া।"

লোকটার এই আশ্চর্য্য ব্যবহার কুমারকে যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত করিল! একি প্রহেলিকা? যে লোকটা জল খাইতে না দিয়া পুকুর হইতে গলা ধাক্কা দিয়া তুলিয়া আনিল, সেই আবার বাল্‌তী করিয়া জল তুলিয়া দিল—দিনভর কিছুই খায় নাই বলিয়া সোহাগ জড়িত স্বরে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

কুমারের উত্তরের কিছুমাত্র প্রতীক্ষা না করিয়া "কুছ্ খাবে চল বাবু," বলিয়াই শিউবরণ রাস্তার ধারের এক মুড়ী-মুড়্‌কীর দোকান হইতে দুই পয়সার মুড়্‌কী কিনিয়া কুমারের হাতে দিল। কুমার গ্রামবাসী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে তাই অনভ্যস্ততা হেতু প্রথম প্রথম ইহা খাইতে ইতঃস্তত করিতেছিল! শিউবরণ বলিল "খাওনা বাবু।"

"আমরা যে ব্রাহ্মণ!"

হাসিয়া শিউবরণ বলিল "কুছ্ দোষ নেহি বাবু; হামিও তেওয়ারী বামুন আছে; হামিওত খায়!"

ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়াছিল বলিয়া কুমার আর দ্বিরুক্তি করিল না! শিউবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে কুমার কোথায় যাইবে—তাহার ঠিকানা নাই, তখন সানন্দে সে বলিল "আজ রাত হামার কাছে থাক্‌বে বাবু?" নিরুপায় কুমার বর্ষার সাগরে উন্মাদ লহরী-লীলার মাঝে উপলখণ্ডের মতনই ক্রমশঃ শিউ-বরণকে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিতেছিল, তাই এই সন্ধ্যার ঘণায়িত অন্ধকারে একমাত্র আশ্রয়কে কিছুতেই উপেক্ষা করিল না!—সে মৌনভাবে শিউবরণের অনুসরণ করিল।

নানা রাস্তা অতিক্রম করিয়া যখন কুমারকে লইয়া শিউবরণ এক বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন কুমার এ বাড়ীর সৌন্দর্য্য, আসবাবপত্র ইত্যাদি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক খোলা গায়ে টেবিলের উপর উপুড় হইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। গরম খুব পড়িয়াছিল বলিয়া পুলিশ সাহেব মিঃ পি মুখার্জ্জি, ধড়া-চুড়া ছাড়িয়া খালিগায়ে বসিয়াছিলেন, তাঁহার গৌরদেহে শুভ্র যজ্ঞোপবীত লম্বিত দেখিয়া, কুমার তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিল।

কুমারকে লইয়া শিউবরণ সাহেবের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যা হ্যায়?"

শিউবরণ কাতর স্বরে উত্তর করিল "“এ ছোক্‌রা দিনভর কুছ্‌ খায়া নেহি, হুজুর ; আজ্‌ রাতকে লিয়ে হিয়া রহনে মাঙ্‌তা—”

বিরক্তির স্বরে “তব্‌ হিয়া কাঁহে,” বলিয়া তিনি পুনরায় কাগজে মন দিলেন ; ভাবটা, তাঁহার অনুমতির কি দরকার ! কে কবে খাইল না খাইল, সেজন্য এতটুকু কৈফিয়ৎ শিউবরণের কাছেত তিনি চাহেন নাই ! অবশ্য শিউবরণের উপরেই এযাবৎ সাংসারিক যাবতীয় ভার ছিল, কিন্তু কি জানি, কেন, আজ শিউবরণ, কেবল নিজের সেই অধিকারের দাবীতেই কুমারকে এবাড়ীতে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল !

মিনিট কয়েক নীরবে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেও সাহেবের আর কোনও প্রশ্ন করিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, শিউবরণ কুমারকে হাতে ধরিয়া রান্না ঘরের দিকে গেল।

অল্পদিন হইল পশুপতি বাবুর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল, সেই অবধি আর তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই ;— তবে পত্নীর মৃত্যুর পরে তাঁহার জীবনে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার রীতিনীতিকে প্রায়ই তিনি ব্যঙ্গ করিতেন। ভিক্ষুক দেখিলে, রাগে কট্‌মট্‌ করিতেন, বিলেত হইলে, এসব হতচ্ছাড়াগুলিকে নাকি জেলেই পঁচিয়া মরিতে হইত; গরীব ছাত্র কিংবা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কেউ সহায়প্রার্থী হইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে

রুষ্টভাবে তিনি বলিতেন "যাচ্ঞা করাটা যে লজ্জার বিষয় এ জ্ঞানটা এদেশের নেই বলেই, ইহার দুর্দ্দশারও অন্ত নেই।" এ দেশের বন্যাদায়ে-দুর্ভিক্ষে কি—যে-কোন সদনুষ্ঠানে আগে তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু বাহিরের কায়দা-কানুন বজায় থাকিলেও ভিতরে ভিতরে বর্ত্তমানে একটা সমম উদার ভাব তাঁহার গড়িয়া উঠিতেছিল।

আজ সন্ধ্যা হইতে না হইতেই, শিউবরণ রান্নার জন্য চাকর বাকরকে ডাক-হাক্ করিতে লাগিল। সকলেই ইহাতে কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অন্যদিন তাহাকে তাড়া করিলেও, তাহার কোনও তাড়ার ভাব দেখা যাইত না, সুর চড়াইয়া সে নির্ব্বিকল্পভাবে গাহিত "বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!"

সাহেবের মেজো ছেলে নন্দন কৌতুক করিয়া তেওয়ারিজী-কে বলিল "আজ বড় তাড়া-হুড়া; কোথাও বুঝি তুল্‌সী দাসী আছে?"

হাসিয়া শিউবরণ উত্তর করিল "আপ্ ঠিক মালুম কিয়া বাবু!"

তারপরে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না রাখিয়াই, সে উনুনে কাঠ ঢুকাইয়া দিতে মনঃ সংযোগ করিল।

রান্না সমাপ্ত হওয়ার আগেই শিউবরণ কুমারকে খাওয়াইয়া নিজের ছেড়া কম্বলের উপরে শোওয়াইয়া রাখিয়া আসিল; এবং

বাড়ীর সকলের আহারাদি হইয়া গেলে, ধীর পদবিক্ষেপে গিয়া নিদ্রামগ্ন কুমারের একপাশে শিউবরণ আপনার ঠাঁই করিয়া লইল।

(১৩)

ভোরে উঠিয়া শিউবরণ স্নান করিয়াই রান্নাঘরে ঢুকিল, আফিস আছে, ইস্কুল আছে, ৯টায় ভাত দিতেই হইবে। কিন্তু রাঁধিতে গিয়া কেবলই তাহার মনখানা ভাবনায় গোলাইয়া যাইতেছিল; অন্যমনস্ক হওয়ায় তরকারী পুড়িয়া যাইতেছিল, ডাইলে নুন দেওয়া হইল না, ভাত আধাসিদ্ধ রহিয়া গেল। কেবলই সে ভাবিতে লাগিল, কুমারকে সে কাছে রাখিতে পারে না? সাহেবকে একটু বুঝাইয়া বলিলে এখানেও হয়ত তাহার একটা সুবিধা হয়—কিন্তু—যাক্‌গে, তাহার অতশত ভাবিবার দরকার কি? এবেলা খাওয়ার পর কুমারকে ইস্কুলে পৌঁছাইয়া দিলেই সে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পায়।

খাওয়া দাওয়া সারিয়া শিউবরণ আপনার ডিউটির পথে কুমারকে ইস্কুলে পৌঁছাইয়া দিতে চলিল! ইস্কুলের কাছে গিয়াই কুমার দেখিল, সুরেশ ইস্কুল-গৃহের একটি কাম্‌রায় পায়চারি করিতেছে। দেখিবামাত্র শিউবরণকে কথাটি মাত্র না বলিয়া সে দৌড়িয়া সেখানে গেল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন আর কুমারের ফিরিবার সম্ভাবনা নাই দেখিল, তখন ব্যথিত চিত্তে, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিল। কিন্তু ফিরিতে গিয়া তাহার পা চলেনা, অথচ সে কিছুতেই ভাবিয়া

পায় না, কুমারের জন্য তাহার মন কেন এমন করে—কুমার তাহার কে ?

শিউবরণ ফিরিবার সময় দেখিল একটি ছেলে তাহার দিকেই আসিতেছে ! সে-ই সুরেশ ! কাছে আসিয়া সে বলিল "তুমি এখন যেতে পার, ও আমাদেরই খুজ্‌ছিল।"

ভগ্নস্বরে শিউবরণ বলিল "যাই বাবু! কিন্তু ইন্‌কো ঠিকানাটু—"

বাধা দিয়া সুরেশ বলিল "প্রয়োজন ?"

"কুছ্ নেহি বাবু ;"

"তবে ?"

"ফুরসৎ মিল্‌নেসে কোই ভকত মুলাকাত—"

"আমরা এখন একটু ব্যস্ত আছি। পরে একদিন তোমার র বাড়ী নিয়ে যাবো'খন।" বিজ্ঞের মত কথাটি বলিয়া সুরেশ ত পদবিক্ষেপে আফিসরুমে ঢুকিয়া গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শিউবরণ ডিউটিতে চলিল। কিন্তু সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না কেমন করিয়া কুমার অন্ততঃ ..কল্যাকার এই একান্ত সম্বলহীনতার কথাটা এত স..জে বিস্মৃত হইয়া গেল। আর সে এমনি বেকুব যে যথাসময়ে ডিউটিতে হাজিরা দেওয়াটা পর্য্যন্ত এই ছেলেটির জন্য ভুলিয়া গিয়াছিল !

কুমার জানিত তাঁহার পিতার শিষ্য উকিলের মুহুরী ! তাই *ইস্কুল হইতে সুরেশকে লইয়া সে কাছারীর দিকে গেল, ভরসা সেখানে গেলে সকল মুহুরীর সঙ্গেই দেখা হবে,* এবং তাহা হইলেই শিষ্যেরও সন্ধান মিলিবে।

বারলাইব্রেরীর পাশেই একটা খড়ের ঘরে বসিয়া মুহুরীরা লেখাপড়া করে। সুরেশ প্রভৃতি সেইঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল দেয়ালের কাছে একখানা ভাঙ্গা টেবিলের উপর কতকগুলি নথি-পত্রের উপরে হাত রাখিয়া উপুড় হইয়া একজন ভদ্রলোক কি লিখিতেছেন ! আর কেহ তখন সেখানে ছিল না।

ছেলেরা ঘরে ঢুকিতেই মাথা তুলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন —"কাকে চান্ ?"

সুরেশ ধীরে ধীরে বলিল—"জগৎকিশোর শাস্ত্রী মহাশয়ের একজন শিষ্য উকিলের মুহুরী।—আপনি তাহাকে চিনেন ?"

শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম শুনিয়া আগ্রহের সহিত ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রয়োজন ?"

"দরকার আছে মশাই !"

"আমিই শাস্ত্রী মহাশয়ের অধম শিষ্য।" কথা কয়টি বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়, দস্তার সাদা ফ্রেমওয়ালা চশ্‌মার দুইদিকে কানে—লাগানো সূতা দুই গাছাকে দুই হাতে ধরিয়া ঔৎসুক্যের সহিত ছেলেদের পানে চাহিলেন।

কুমারকে হাত ধরিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে দিতে সুরেশ বলিল "ইনি শাস্ত্রী মহাশয়ের ছেলে—নাম শ্রীজয়কুমার ভট্টাচার্য্য।"

শুনিবামাত্র সন্ত্রস্ত হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় চেয়ার হইতে উঠিয়া গুরুপুত্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুপাটের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলত ?"

"হাঁ আপাততঃ কুশল! ওর বাবা ওকে পাঠিয়ে দিলেন, আপনাদের বাড়ীতে থেকে সে এখানকার ইংরাজী ইস্কুলে পড়বে। দেশের ইস্কুলের পড়া তার শেষ হয়ে গিয়েছে কিনা!"

সুরেশ বেশ চতুরতার সহিত এই বানানো কথাগুলি বলিয়া গেল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—

"তা' বেশ!"

কিন্তু আরও একজনের অন্নসংস্থান করিতে হইবে ভাবিয়া তাহার পায়ের তলার মাটি কাঁপিতেছে বোধ হইল! মা ষষ্ঠির যেমনভাবে তাহার উপর বছর বছর কৃপা! তদুপরি গুরু-দেবের কৃপা যদি যোজিত হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধের কি গতি হইবে ইহা তিনি ভাবিয়া কুল পাইলেন না। আর্থিক অনটনের হেতু তাহার দুইটি মেয়ের 'গৌরীদানের' সময় উত্তীর্ণ অনেক কাল হইয়া গিয়াছিল! এদিকে উকিলদেরই যা হাল; আর মুহুরীদের কথা বলিয়াই কি লাভ!

তা'ছাড়া আরও একটা বিপদের কল্পনাও চক্রবর্ত্তী মহাশয় করিতেছিলেন। নীলিমা তাঁহার দ্বিতীয় সংসার। বৃদ্ধ বয়সে তরুণী-ভার্য্যা হইলে যেমন হয়, তদনুযায়ী নীলিমাও স্বামীর সহিত বেশ খাপ্ খাইয়া চলিতে পারিতেছিলেন না।

স্বামীর গৃহে পদার্পন করিয়া অবধিই, কারণে অকারণে, পদে পদে সপত্নীর মুক্ত-আত্মার উদ্দেশ্যে নীলিমার তীক্ষ্ণ বাক্যবান ছুটিত। এবং সেই বাক্যবান বিফলমনোরথ হইয়া দ্বিগুণ রোষে আসিয়া পড়িত মাতৃহারা নিরীহ মেয়ে মনির উপর। হেমলতার আমলে রামশরণের কর্ত্তৃত্ব যথেষ্ট থাকিলেও সে ব্যক্তিত্ব হারাইয়া নীলিমার কাছে এখন তিনি ছাগশিশুবৎ! তাই 'আই-বুড়ো' মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা না হইলেও, সংসারের ব্যয় ভার চালানো কষ্টকর হইলেও, নীলিমার মেয়েদের বিলাসিতার ব্যাঘাত হইত না, মেয়ের ইস্কুলে পড়িবার প্রত্যবায় ঘটিতে পারিত না; এমন কি ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হইলেও, প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য স্ত্রীর কাছে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তিলমাত্রও ছিল না।

সুরেশরা যে কখন নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, ভাবনাগ্রস্থ রামশরণ চক্রবর্ত্তী তাহা খেয়াল করে নাই; একটু পরে চিন্তার ভার কিছু কমিলে কাষ্ঠ হাসিয়া কুমারকে বলিলেন, "ইংরাজী পড়িলে, শিষ্য-সেবক কেমন করে বজায় থাক্‌বে প্রভু?"

কুমার ইহার কিছুই সদুত্তর খুঁজিয়া পাইতেছিল না বলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সৌভাগ্য, অতঃপর চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রশ্ন করিয়া আর তাহাকে বিব্রত করিলেন না। মোক্তেলের সঙ্গের কাজ যথাসম্ভব শীঘ্র সমাধা করিয়া তিনি কুমারকে লইয়া বাসাভিমুখে চলিলেন।

বাসায় ফিরিতে ফিরিতে বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল! চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মেয়ে চপলা বাবার সঙ্গে একটি নূতন ছেলেকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"ও কে বাবা ?"

"উনি আমাদের গুরুপুত্র, প্রণাম কর।"

কথাগুলি নীলিমার কাণে স্পষ্ট পৌঁছিয়াছিল না, তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে রে চপল ?"

চপল কোনও কথা বলিবার আগেই রামশরণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন "আমাদের গুরুদেব তাঁহার পুত্রকে পাঠিয়েছেন বৌ, এখানে ইস্কুলে থেকে পড়বেন।"

"আর এখানে পিণ্ডি চট্‌কাবেন বুঝি ? বাড়ীতে দেখতে পাচ্ছি রীতিমত অন্নসত্র বসে গেল!" ব্যঙ্গের সুরে কথা কয়টি বলিয়া দুম্‌দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না, "আমার আর তোমার মেয়েগুলোর বিলাস-প্রসাধনে যা' ব্যয় হয়, তার

দশভাগের একভাগ ব্যয় করলে ওঁর মতন দুটি ছেলের উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা করা যায়!"

কথাগুলি কুমারের কাণে গেল! বাহিরের ঘরে একখানা ভাঙ্গা জলচৌকীর উপর বসিয়া হতভম্ব হইয়া কেবলই ভাবিতেছিল—বাড়ীর নানা অভাব অস্বচ্ছলতার মাঝে একদিন-ওত এরূপ নির্দ্দয় বাক্যবান তাহাকে সহিতে হয় নাই! নীলিমার প্রকৃতিতে এক নির্ম্মম রুক্ষতা—একটা স্নেহহীনতা স্মরণ করিয়া ইহা সে ধ্রুব বুঝিতে পারিয়াছিল এখানে তাহার কিছুতেই থাকা হইবে না, এবং হইলেও ইহা মোটেই আরামের হইবে না।

ভাবনা, সুখেরই হউক, কি দুঃখেরই হউক, মানুষকে তাহা শ্রান্ত না করিয়া ছাড়ে না। কুমারও ভাবনার আতিশয্যে ক্লান্ত-অবসন্ন হইয়া, যেখানে বসিয়াছিল, সেখানে, সেইভাবেই নিদ্রার কোমল-ক্রোড়ে শ্রান্তি অপনোদন করিবার সুযোগ পাইল।

রান্না হইয়া গেলে অনেক রাত্রিতে রামশরণ যখন কুমারকে খাইতে ডাকিলেন, তখন সে ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া গিয়াই খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে রামশরণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন "ম্লেচ্ছ পড়া পড়তে হলেও কি নিজের বাপ-পিতামোর ক্রিয়া-কলাপ লোপ না করলেই নয়, কর্ত্তা?"

কথা কয়টির ইঙ্গিতে কুমারের বুঝিতে বাকী রহিলনা; পৈতা হওয়া অবধি এই প্রথমেই তাহার আহ্নিকে ত্রুটি হইল!

একান্ত, সময়ের অভাব হইলেও অন্ততঃ প্রতিদিন আঠারো বার গায়ত্রী জপও সে করিত! কিন্তু নানা দুর্ভাবনায় অভিভূত সে নিদ্রা হইতে যখন সহসা উঠিয়াছিল তখন তাহার পূর্ণমাত্রায় সংজ্ঞাই ছিল না! তথাপি এই অপ্রিয় সত্য শুনিয়া লজ্জায় সে অধোমুখে বসিয়া রহিল, কোনও কথা তাহার মুখ দিয়া সরিল না।

---

(১৪)

ভোরে উঠিয়া কুমার, ভর্ত্তি হওয়ার ভাবনায় বিব্রত হইয়া পড়িল! কিরূপে সে ভর্ত্তি হইবে? তাহার হাতে যে একটি কপর্দ্দকও নাই! তবু, দশটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ইস্কুলের দিকে ধীরে ধীরে রওয়ানা হইল। সারাদিন ধরিয়া সে দেখিল, নূতন নূতন ছেলেরা গ্রাম হইতে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়া আনন্দে কলরব করিতেছে! এ আনন্দ তাহাকে আরও বেশী অবসন্ন করিয়া তুলিল।

আজও কি তাহার তবে ভর্ত্তি হওয়া হইবে না? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, এমন সময় দেখিল, শিউবরণ দূরে দাঁড়াইয়া একান্তমনে ইস্কুলের দিকে চাহিয়া আছে; তাহার অপলক নেত্র, উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা দেখিলে মনে হয়, কি যেন তাহার একান্ত আপনার ধন সে খুঁজিতেছে!

আজ শিউবরণকে দেখিবামাত্রই কুমারের মনে হইল, এই নিঃসম্বল নিঃসঙ্গতার মধ্যে শিউবরণই তাহার একমাত্র আপনার! কাল সন্দেহ করিয়া যাহার সঙ্গ এড়াইতে সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহাকে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আসিয়া তাহারই বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সস্নেহে শিউবরণ জিজ্ঞাসা করিল "ক্যা হুয়া বাবু!"

জড়িত স্বরে কুমার চলিতে চলিতে বলিল "এদিকে এসো।"

উভয়ে নীরবে পথ চলিয়া পশুপতি বাবুর বাড়ীতে আসিলেন! কুমার মিথ্যার ভ্রান্তি দিয়া আর শিউবরণকে ভুলাইয়া রাখিল না, আগাগোড়া সমস্ত খুলিয়া বলিয়া, তাহার দয়া ভিক্ষা করিল।

কুমারের নিরুপায় অবস্থার কথা শুনিতে শুনিতে শিউবরণের স্নেহ-কাতর অন্তর সমবেদনায়—সহানুভূতিতে গলিয়া আসিল! গদ্‌গদ্ কণ্ঠে সে বলিল "হাম্ তোমারা ক্যা কর্‌নে সেক্‌তা ?"

অকুণ্ঠিত ভাবে কুমার বলিল "আমার পড়ার খরচ তোমায় দিতে হবে!"

এ ভাবে এতবড় একটা দাবী নিতান্ত অদ্ভূত হইলেও, শিউবরণের কাণে ইহা মোটেই অসম্ভব বলিয়া বাজিল না।

"কুছ্ পরোয়া নেহি বেটা।"

শিউবরণের কথা কয়টি শুনিয়া কুমার আশ্চর্য্য হইয়া গেল; তাঁহার বিস্ময়-স্তব্ধ অশ্রুযুগল জলসিক্ত হইয়া আসিল! শিউবরণ এ কৃতজ্ঞতা চাহে নাই; সে দ্রুত কুমারকে কোলে তুলিয়া চুমু খাইয়া বলিল "কাঁহে রুতা হায় বেটা, তোমে হামারা লেড়্‌কেকা মাফিক্।"

আনন্দের আতিশয়তায় কুমারের অন্তর নৃত্য করিতেছিল! কিন্তু ফিরিয়া বাসায় প্রবেশ করিতেই শুনিল নীলিমা কর্কশ

স্বরে স্বামীকে বলিতেছেন "বলি ব্যাপার খানা কি?" বলির পাঠার মত সন্ত্রস্ত বৃদ্ধ ধীরে উত্তর করিলেন "কি ?"

"কাল্ রাত্তিরে না বলেছিলে, আজই নানা অসুবিধা দেখিয়ে গুরুপুত্রকে বাড়ী যেতে বল্‌বে, কৈ তারত কিছুই কর্‌লে না।" আম্‌তা আম্‌তা মুখে চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—

"কিন্তু গুরুদেব যখন নেহাৎ পাঠিয়েই দিয়েছেন, তখন কি করে ফিরিয়ে দি-ই বল !"

"তা'ত বুঝলুম, কিন্তু ওদিকে সংসারের খবর রাখত !"

"রাখি, কিন্তু উপায় কি ?"

নীলিমা রাগের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিলেন "এ দেশটা যত সব সংকীর্ণতায় উচ্ছন্ন যেতে বসেছে ; বাপ গুরু, তার ছেলেও গুরু, তস্যপুত্র গুরু, এ ভাবেই চল্‌বে, হোক্ না কেন তারা যতই অসচ্চরিত্র, চোর কি বাটপাড় ।"

ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধ রামশরণ পত্নীকে যথেষ্ট ভয় করিলেও, গুরুর নিন্দা সহিবার মত ধৈর্য্য তাঁহার সরল অন্তরে ছিল না, তাই উত্তপ্ত হইয়া তিনি বলিলেন "মিশনারী ইস্কুলের দু'চারটা ইংরেজী বুলি শিখেই, হিন্দুধর্ম্মের উপর অবাধে বড় বড় মন্তব্য করার ধৃষ্টতা তোমার না থাকাই উচিত নীলিমা !" তারপরেই এত দিন যে কথা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিতেছিলেন না, তাহাই অসহিষ্ণু তাঁহার মুখদিয়া বাহির হইল,—

"তোমার আর তোমার মেয়েক'টির মেমসাহেবী চালের দরুণ যা' ব্যয় আমার করতে হয়, তার দশভাগের একভাগে একটা অসহায় ছেলের পড়ার সংস্থান হ'য়ে যেতে পারে না কি?"

এই বাক্যবাণ নীলিমার বক্ষে তীব্রভাবে গিয়া বিঁধিল। তিনি সরোষে উত্তর করিলেন "তা বেশ, পাঠিয়ে দাও, আমায় না হয় বাপের বাড়ী! একয়টি লোকের সেখানে অন্ন সংস্থান অ-ক্লেশেই হবে; তোমার মত ত আর তাদের 'অগ্ন্যভক্ষ্য-ধনুর্গুণ' অবস্থা নয়।"

আবেগের আতিশয্যে যদিও রামশরণ পত্নীকে কয়েকটা কড়া কথা শুনাইয়াইছিলেন, তবু পত্নীর রণচণ্ডীভাব দেখিয়া—তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইল না; হাসিয়া বলিলেন "বলি অত অভিমান কেন; ভেতরকার কথাটা আগে শোনই না! তোমার ও শরীর প্রায় ভাল থাকে না; ঠাকুর রাখতেও পয়সা চাই; এখন থেকে ওঁকেই রান্নার কাজটা কুলিয়ে নিতে বলা যাবে!"

রামশরণের এ কথাগুলি যে মোটেই আন্তরিক নয়—নেহাৎ প্রবোধ দিবার জন্যই বলা, নীলিমা ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়া, নিজের অকর্ম্মণ্যতার শ্লেষে অধিকতর উগ্র হইলেন, "নিজের শরীর দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারিনে বলেইত

তোমার এমন ধারা কটু কাটব্য আমায় রোজ রোজ শুন্‌তে হয়!',

বিতণ্ডা-বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া নিরীহ রামশরণ রণে ভঙ্গ দিলেন।

বেড়ার আড়াল হইতে কুমার সমস্তই শুনিয়াছিল! কেউ দেখিয়া শিখে, কেউ ঠেকিয়া শিখে! অবস্থা বিপর্য্যয়ে কুমারের ঠেকিয়া ঠেকিয়া যে শিক্ষা হইতেছিল, তাহাতে অবস্থার সহিত খাপ খাইয়া চলিবার অভ্যস্ততা ক্রমে সে আহরণ করিতেছিল! তাই প্রথম দিনের মত তাহার মন অতটা অবসন্ন হইয়া পড়িল না।

দিন কয়েক কুমারের বেশ চলিয়া যাইতে লাগিল! যে ছোট বেলায় একখানাও পাঠ্য পুস্তক সব সময়ে খরিদ করিবার পয়সা পায় নাই, আজ সে শিউবরণের অনুগ্রহে, ইস্কুলে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তার জন্য যথেষ্ঠ অর্থ পাইয়াছে, ইহাতে তাহার যে কি আনন্দ তাহার পরিমাণ করিবে কে?

সপ্তাহ খানিক পরে একদিন ভোরে, শিউবরণের নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া আনিয়া কুমার পোষ্ট-কার্ড্ কিনিল! মায়ের কাছে চিঠি এ যাবত সে দেয় নাই, না জানি মা কত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ইস্কুলে যাইতে ডাকে দিবে ভাবিয়া সে দোয়াত কলম নিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিতে মোটা-

মোটি সব লিখিয়া, আরও কিছু লিখিবার আছে কিনা, ভাবিতেছে, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে মণি আসিয়া কুমারকে জানাইল "দাদাবাবু; মা বলে পাঠাইলেন যে আজ তাঁর অসুখ করেছে বলে, তিনি রান্না করতে পারবেন না! লতা, রাণীও ইস্কুলে যাবে, তাই আপনি এসে চারটি ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিন্!"

হাতের কলমটা ঠক্ করিয়া লিখা কার্ডখানার উপরে পড়িয়া গেল! কুমার সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল "আমিত কোন দিনও রাঁধ্তে শিখিনি মণি? তা'ছাড়া, একথাটা আরও একটু আগে জানালেই কি হতো না; ইস্কুলে যাবার যে বেলা হয়ে এসেছে!"

মণি সে কথার উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "একি করলে, দাদাবাবু! কালী পড়ে চিঠিখানা কি হয়ে গেল দেখ দেখি!"

চিঠিখানার উপরেই যে কালীশুদ্ধ কলমটা রাখিয়া দিয়াছিল, কুমারের এ খেয়ালই ছিল না, তাই মণির কথায় মসিময় চিঠিখানার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কান্না পাইল! জড়িতস্বরে সে বলিল "সত্যি-ইত মনি, চিঠিখানা একেবারে—বিশ্রী হয়ে গেলরে!"

মণির মুখে অলক্ষ্যে একটা "আহা" শব্দ উচ্চারিত হইল। কিন্তু অশান্ত আক্রোশে কুমার রুক্ষভাবে বলিল "তুই-ইত যত অনর্থের মূল! কেন তুই বল্‌লি যে এখন আমার রাধ্‌তে হবে! বল্‌গে যা তোর মাকে—আমার ইস্কুলের বেলা হয়েছে, আমি রাঁধতে পার্‌বো না।"

মণি, রামশরণ চক্রবর্ত্তীর প্রথম পক্ষের সন্তান! এদিকে নীলিমা বয়স্থা হইয়া স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার ও সন্তানের মা হওয়ার সুযোগ শীঘ্রই হইয়া উঠিল; এবং সেই জন্যই বোধ করি নীলিমার মাতৃস্নেহের পবিত্র ধারায় অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য মণির কোনও কালেই মিলে নাই!

চাকর বাকর নাই গরীবের সংসার! একা নীলিমা কেমন করিয়া মেয়ে কোলে করিয়া সবগুলি কাজ করেন। কাজেই অল্প বয়সেই মণিকে মায়ের কর্ত্তব্যের অর্দ্ধেক ভার নিজের কাঁধে লইতে হইয়াছিল! অসাবধনতার জন্য নানা ত্রুটিতে কটূক্তির ভয়ে মণি সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত; এবং সেই জন্য অতি অল্প বয়সেই সে বেশী বুঝিতে শিখিয়াছিল। তাই বয়স-সুলভ আব্দার বা চাঞ্চল্য কিছুই তাহাতে দৃষ্ট হইত না—তাহার সুবিবেচনায় পরিমর্জ্জিত সকল কাজই অতিমাত্র গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রকাশ পাইত!

নীলিমার মেয়েরা যখন ক্রমে বড় হইতে লাগিল, নীলিমা ও তাহাদেরে 'মিশন ইস্কুলে' পাঠাবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

একে রামশরণ ছিলেন সেকালের লোক; তদুপরি অর্থ-কৃচ্ছ্রতা ছিল তাঁহার প্রবল, তাই মেম্-ইস্কুলের ব্যয়ভার বহন করা যেমন তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইল, তেমনি—স্কার্ট-জ্যাকেট্ ব্লাউজ—ইত্যাদির ঢংও তাঁহার ভাল লাগিত না। তবু নালিমাকে তিনি ভয় করিতেন বলিয়া নীলিমার মেয়েদিগকে ইস্কুলে পাঠাবার পীড়াপীড়িতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিতে হইল। কিন্তু মণি ইস্কুলে যাওয়ার আদেশ মায়ের নিকট পাইলনা!

রামশরণ একদিন খাইতে বসিয়া—বলিলেন "ওদের সঙ্গে মণিকেও ইস্কুলে দিলে হয়না?"

নীলিমা উত্তর করিলেন "আজ বাদে কাল ওর বিয়ে হবে; এখন আবার ইস্কুল?" অবশ্য নীলিমার ইহা অন্তরের কথা ছিলনা; মণি ইস্কুলে চলিয়া গেলে বাড়ীর কাজ কর্ম্ম তবে কে করিবে?

রামশরণ ইহা যে না বুঝিতেন এমন নয়; এবং শৈশবে মাতৃহারা মণিকে তিনি আন্তরিক স্নেহও করিতেন; কিন্তু নীলিমার ভয়ে, তাঁহার এই অন্তর্নিরুদ্ধ স্নেহধারা বহির্গত

হইয়া মণির দুঃখময় দেহ-মনকে প্লাবিত করিতে প্ররোচনা পাইতনা! শীতের সকালে জলে বসিয়া বর্ষার ধারাবর্ষণে আর্দ্রবস্ত্রে বাসন মাজিতে দেখিয়া কতদিন রামশরণ চক্রবর্ত্তীর চোখে জল আসিয়াছে! কিন্তু উপায় নাই; বৃদ্ধস্যতরুণীভার্য্যা।

ভাতের ফেন গালিতে প্রথম প্রথম মণির হাতে ফোস্কা পড়িত, সম্বরা দিতে গিয়া গরম ঘি-তেল ছুটিয়া হাতেপায়ে লাগিত। কিন্তু মণি এসকল দেহমনের কষ্ট নীরবে সহিয়া যাইতে শিখিয়াছিল। কখনও দারুণ মর্ম্মবেদনায় অশ্রু সজল হইয়া উঠিলে, আঁচলে তাহা সংগোপনে মুছিয়া লইত! কাহারও কাছে যে সমবেদনার প্রত্যাশা সে করে না!

এমনি সময় যখন কুমার এই বাড়ীতে আসিল, তখন কি জানি কেন উভয়ের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য জন্মিয়া গেল! বোধহয় সমদুঃখী বলিয়াই!

তাহাদের উভয়ের মধ্যে—গুরু-শিষ্য সম্পর্কের সমীহভাব মোটেই ছিলনা বলিয়া পিতার নিকট মণি অনেকদিন বকুনি খাইয়াছে। তবু, কুমারের প্রতি মণির স্নেহানুরক্তির কার্পণ্য দৃষ্ট হইত না।—স্নানের সময় সে তেল গামছা দিয়া আসিত—আহ্নিকের কুশাসন বিছাইয়া রাখিত, খাইতে বসিলে গরম গরম ভাত বাড়িয়া দিত। কুমারের যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা তাহার নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল।

সেদিন ডোবা পুকুরের ধারে বসিয়া সকালবেলা মণি একটা পোড়া কড়া মাজিতেছিল, এমন সময় শুনিল মা বলিতেছেন "মণি! তোমার দাদাবাবুকে বলে এসো, মায়ের শরীর ভাল নেই বলে মা রাঁধ্‌তে পারবেননা, আজ তাঁকেই রাঁধ্‌তে হবে!"

এ-ভাবের কথায় মণি স্তম্ভিত হইয়া গেল! তাই সে ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "দাদাবাবু কেন রাঁধ্‌তে যাবেন মা! আমিইত রোজ রাঁধি, আমিত কৈ বলিনি যে আমি রাঁধ্‌তে পার্‌বোনা!"

ঝঙ্কার দিয়া নীলিমা বলিলেন "তোর আর জ্যাঠামো করতে হবে না! যা' বল্‌ছি তাই কর্‌গে যা।"

মণি মায়ের এই উগ্রচণ্ডামূর্ত্তির কাছে, আর কিছুই বলিতে সাহস করিলনা; অদ্যকার এই অভিনয় কাহার উপরে নিমিত্ত করিয়া বুঝিতে পারিয়া, উঠিয়া সে কুমারকে এসংবাদ দিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল! নীলিমা তাহার গতি ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন "কোথা—রে কে? ওমা, তার জন্য মেয়ের আমার দরদ দেখনা!"

মায়ের আদেশ তামিল করিয়া মণি ফিরিয়া যাইতেছে দেখিয়া কুমার তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিয়া ডাকিল "মণি, একটা কথা আছে দিদি! শুনে যা'না!"

অভিমান হইলেও কুমারের এ কাকুতি মণি উপেক্ষা করিতে পারিলনা। কুমার বলিল, "মাকে ওসব কথা বলিস্‌নি যেন, ওকি আর আমি সত্যি-সত্যি বলেছি; রাগের মাথায় মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে!" তাহার পরে একটু থামিয়াই বলিল "তুই নাহয় উনুনটা ধরিয়ে দিস্ দিদি! আর কাছে বসে একটু দেখিয়েও দিস্, আমি যে কোনও দিনই রাঁধিনি!" "মণি কিছুই বলিতে ছিলনা, কুমার আস্তে আস্তে বলিল "রোজইত রাঁধিস্, আজও তুই-ই না হয় চারটা রেঁধেনেগেনা!"

মায়ের আদেশের প্রতিকূলে যাইতে সাহস তাহার ছিলনা; তাই—মিথ্যা কথার ভান করিয়া ঢোক্ গিলিয়া সে বলিল "কাল্ রাত্তিরে আমার জ্বর হয়েছিল বলে, আজ আমি চান্ করবোনা।"

"সত্যি জ্বর হয়েছিল মণি! তবে যে আজ সকালেই তোকে জলে দাঁড়িয়ে—বাসন মাজ্‌তে দেখ্‌লুম।" কুমারের স্বর উদ্বেগ-ভরা!

কি কৈফিয়ৎ দিবে ভাবিয়া না পাইয়া মণি বলিল "ওই যাঃ! কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে; কখন রান্না হবে; আর কখনই বা ওরা ইস্কুলে যাবে;—আমি যাই!"

বলিয়া মণি গমনোদ্যতা হইতেই, আস্তে আস্তে কুমার বলিল "যা মণি, উনুনটা ধরাগে—যা; আমি আস্‌ছি! কিন্তু সাবধান, তোর মার কাছে সে-কথা বলিস্‌নি যেন!

কুমার মণিকে এত করিয়া সাবধান করিল বটে; কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই যে বেড়ার আড়াল হইতে নীলিমার একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী লতা মায়ের কাণে যথাযথ সমস্ত গোচর করিয়াছিল উহা কুমার ও মণি বাহির হইয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল মা-মেয়ের চোখে কৌতুকনৃত্য দেখিয়া!

সপ্তাহ দুই পরে কুমার হাসিমুখে ইস্কুল হইতে ফিরিতেছিল; মণি তখন বাইরের বাগানে বেগুন গাছের গোড়ায় ছাই দিচ্ছিল; কুমারের হাসিমুখ লক্ষ্য করিয়া বলিল "আজ বড় যে খুসী! ব্যাপার কি?"

কুমার হাতের চিঠিখানা মণির দিকে ছুড়িয়া দিল। অপ্রতিভ হইয়া মণি চিঠিখানা তুলিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল "তুমিই পড়না, আমি ত পড়্‌তে জানিনে!"

কথাটা কুমারের কাছে এতই অদ্ভুত লাগিল যে, ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার বেগ পাইতে হইল; কেননা সে দেখে মণির মা সর্ব্বদাই লতা-রাণীর পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া সতর্ক থাকিতেন! তাই হাসিয়া সে বলিল "নে নে, তোর আর ন্যাকামো কর্‌তে হবেনা; অত গরিমা দেখাতে হবেনা!

এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা! তাই বিষণ্ণমুখে মণি বলিল "সত্যিই আমি লিখ্‌তে পড়্‌তে শিখিনি দাদাবাবু!"

"কেন তোর মা তোকে পড়াননি?"

"আমি যখন ছোট, ছিলাম, তখনই আমার মা মারা গিয়াছিলেন কিনা!—একা বাবা আর কতই-বা দেখ্‌বেন!"

অসীম বিস্ময়ে কুমার বলিল "ও! তাইবল্‌, কাকী-মা তোর মা নয়, সৎ-মা!" মণি ইহার কোনই উত্তর করিল না; চারিদিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে কুমার বলিল "তাই তোর-মা তোকে দেখ্‌তে পারে না!"

"দেখতে পারে কি না তা' তুমি কেমন করে বুঝ্‌লে? বাবার গরীবের সংসার! মার শরীর ও প্রায়ই ভাল থাকেনা; তাই সংসারের কাজগুলো আমায় না কর্‌লে চল্‌বে কেন?" তার পরেই সে বলিল "খালি বাজে কথায় সময় কাটিয়ে দিচ্ছ, চিঠি খানা কে দিয়েছেন কি লিখেছেন, তারত কিছু বল্‌ছ না!"

হাসিয়া কুমার বলিল "চিঠিখানা কাকা গৌহাটী হতে লিখেছেন; সেখানে তিনি একটা ইস্কুলে পণ্ডিতের কাজ পেয়েছেন। বাড়ীর পত্রে তিনি আমার কথা জেনে কুড়িটাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর ফি মাসেই টাকা পাঠাবেন বলে লিখেছেন। বলিয়া দুখানা নোট তুলিয়া কুমার মণিকে দেখাল!

মণি বলিল "ভাগ্যিস্‌ খামখানা তোমার হাতেই পড়েছিল; যদি আর কেউ এ চিঠিপেত, তা'হলে টাকাগুলো গিয়েছিল আর কি!"

কুমার অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল "দূর! আমার নামের খাম আর একজন খুল্‌তে যাবে কেন! বাড়ীতেই দেখেছি, কাকাবাবুর নামের খাম, মা তুলে রেখে দেন, কখ্‌খনো খুলেননা!"

মণি বলিল "মা কিন্তু যারতার চিঠিই খুলে পড়েন।"

কুমার আর কিছুই বলিল না; হয়তঃ তখন সে ভাবিতেছিল, কাকা তবে এভাবে টাকাগুলো পাঠাইয়া সত্যি ভাল করেন নাই!

উভয়ের ক্ষণেক নীরবতা ভগ্ন করিল একটা রুক্ষকণ্ঠস্বর "দেখত রাণী, ঘণ্টাখানেক বাইরে দাঁড়িয়ে ধাড়ীমেয়েটা করছে কি! লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে আর কি!"

চকিত হইয়া মণি, রাণীর এ সংবাদ বহন করিয়া আনিবার আগেই ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল!

ঘুরিয়া আসিবে বলিয়া কুমারও বাহির হইল!

ঘুরিয়া ঘুরিয়া কুমার যখন পশুপতিবাবুর বাড়ীর সাম্‌নে আসিল, তখন দেখিল, "শিউবরণ মোটা লাঠিগাছটা বগলে পুরিয়া, হাতে খৈনী টিপিতেছে!"

কুমারকে দেখিয়াই তাহারে মুখ-খানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল!

যদিও কুমার বিশেষ কোনও অভিপ্রায় লইয়া এদিকে আসে নাই তবু শিউবরণকে দেখিয়াই সে বলিল "এই নাও

তেওয়ারীজি দশটাকা, তোমার যা প্রাপ্য, তা কেটে রেখো! কাকার চিঠি পেয়েছি; তিনি দরকার মত টাকা পাঠাবেন লিখেছেন! আর তোমায় জুলুম করবোনা।"

কথাটা শুনিবা মাত্রই শিউবরণের প্রফুল্ল মুখ সহসা মলিন হইয়া গেল। সে কোন কথাই কহিলনা; হাত বাড়াইয়া নোট খানা লইবার আগ্রহও তাহাতে প্রকাশ পাইল না।

"বাঃ, নিচ্ছ না যে!" বলিয়া কুমার এক রকম জোর করিয়াই নোট খানা শিউবরণের হাতে গুঁজিয়া দিল।

নীরবে শিউবরণের বুকের ভিতর হইতে শুধু একটা বেদনার দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

আজো সকাল বেলা সুরেশরা বলাবলি করছিল—কুমারকে অমনভাবে মায়া-মমতা দেখানো এবং টাকা পয়সা দিয়া সহায় করার মধ্যে নিশ্চয়ই শিউবরণের কোনও একটা অভিসন্ধি আছে, তাই সবাই পুলিশের লোকের সহিত বেশী মাখা-মাখি ভালনয় বলিয়া কুমারকে সাবধানও করিয়াছিল। এই কথা স্মরণ হওয়ায়, কুমার সরলভাবেই শিউবরণকে বলিল "আর দেখ তেওয়ারীজী আমি যখন ক্লাসে পড়াশোনা করি তখন তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে থাক; ইস্কুল ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা কর এতে লোকে আমায় নানা কথা বলছে তাই আমি বলি কি—"

"বাড়ীর কর্ত্তার নিজের বলতে লজ্জা হয়, তাই, অপ্রিয় হলেও কথাটা আমায়ই বলতে হচ্ছে !"

কুমার হাঁ করিয়া নীলিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; নীলিমা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমাদের যে অবস্থা, তাতে এখানে আর আপনার থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হচ্ছেনা।"

"আমি চলে গেলে, একটা মাষ্টার বা একটা ঠাকুরও হয়তঃ রাখতে হবে কাকীমা ! তবে আমি কি অপরাধ করলুম ?"

"হয়তঃ রাখতে হবে, কিন্তু তাদের কাজ কি আপনার দ্বারা হচ্ছে ?"

"যখন যা বলছ, সব-ইত করছি কাকীমা, বাজার-হাট. রান্না-বান্না, খুকীকে দেখা, লতা-রাণীদের পড়ানো, সাধ্যমত কিছুরইত ক্রুটি করিনি কাকীমা !"

"ক্রুটি হচ্ছে কি না হচ্ছে, তা' আপনি কেমন করে বুঝলেন ? লতারাণী পড়তে গেলে আপনার মেজাজ গরম হয়ে যায় ; ওদিকেত দেখি লুকিয়ে লুকিয়ে মণিকে পড়ানোর খুব সময় মিলে।"

কাতরস্বরে কুমার বলিল "এ অনুযোগ তোমার একেবারেই সত্যি নয় কাকীমা ! সংসারের কাজ করে কতটুকু সময়ই বা ওর বাঁচে যে সব সময় ও আমার কাছে পড়বে ? মণি, তুমিই এর জবাব দাও না !"

মণি নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল্ বটে, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলনা !

নীলিমা অন্য ওজুহাত না পাইয়া বলিলেন "সে যা'হোক্ —আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, দুই একদিনের মধ্যে আপনি অন্য ব্যবস্থা দেখবেন !"

এখানে আসিয়া অবধি প্রায় প্রতি-পদেই কুমার ইহা অনুভব করিতেছিল—এখানে তাহার বেশীদিন থাকা হইবে না। আজ ইহা প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারিয়া কয়েকটা কড়া কথা শুনাইয়া দিবার লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল ! সে নীলিমাকে বলিল "যাব যে সে আমি এসে অবধিই জানি ; তবু—একবার কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করে যাবো; এও তাঁরই অভিমত কিনা !"

"জিজ্ঞেস্ করার প্রয়োজন ?"

"কেননা আমি এখনও তাঁকেই বাড়ীর কর্ত্তা বলেই জানি।"

নীলিমা একথার জবাব দিতে পারিলেন না ; বোধকরি ইহাতে যে পরোক্ষ শ্লেষ ছিল, তাহারই ধাক্কা সাম্‌লানোর চেষ্টা করিতেছিলেন !

কুমারও মুহূর্ত্তকাল নীরবে কি জানি কি ভাবিল, তাহার পরেই বলিল, "তা'বেশ, তবে আসি কাকীমা।";

কুমার বাহির হইয়া আসিল; পিছনে পিছনে মণি আসিয়া ডাকিল "আজই এখনই যাবে দাদাবাবু ?"

"ফের পিছু ডাক্‌ছিস্ !"

"আজ না হয় থেকেই যাওনা ? বেলা পড়ে এলো যে !"

"আস্থক, যেতেই যখন হবে, তখন আর সময় অসময় কি ?"

অনেক অনুনয় বিনয়েও যখন কোনও ফল হইল না, তখন অগত্যা মণি বলিল, "যাওয়ার জন্যই যখন মন বেঁধে নিয়েছ, তখন যাও ! কিন্তু দোহাই তোমার, আমার উপরে রাগ করো না যেন।"

কুমার কোনও জবাব দিল না ; কাপড় চোপড় বইটই দিয়ে একটা পুঁটলী বাঁধিয়া তাহা বগলে পুরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া হনহন্ করিয়া চলিয়া গেল !

জীবনকৃষ্ণের পত্র ও টাকা পাইয়া মহেন্দ্র, কল্যাণীও কুমারকে গৌহাটী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন. সে আজ তিন বছরের কথা! কুমার এ তিন বৎসর প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছে। জীবনকৃষ্ণ সামান্য বেতন পাইতেন, তদুপরি কিছু যাজনিকও করিতেন এবং এই সবে যাহা আয় হইত. তাহার কিছুটা বাড়ী পাঠাইতেন, আর অবশিষ্ট দিয়া সামান্য ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ও কুমারের পড়ার ব্যয় সংকুলান করিতেন।

গৌহাটী হইতে টাকা আসিবামাত্রই জগৎকিশোরের ব্যয়-তৎপরতা দৃষ্ট হইত—আজ সত্যনারায়ণের সিন্নি, কাল মঙ্গল-চণ্ডীর মানসিক, পরশ্ব একটা আরও কিছু, এইভাবে কপর্দ্দক ঘরে থাকা পর্য্যন্ত তাহার অবকাশ ছিল না; তারপরে টাকা ফুরাইয়া আসিলে পাওনাদারের জ্বালায় বিব্রত হইয়া পড়িলেও তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কোনও লক্ষণই দেখা যাইত না; তবু জীবনকৃষ্ণ যথার্থ ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ লইয়া জগৎকিশোরের দুশ্চিন্তা-জাল ছিন্ন করিতে সতত চেষ্টা করিতেন।

কুমারের ছোট বোন সুশীলারও বিবাহের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল; এতবড় মেয়েকে ঘরে রাখিতে জগৎকিশোরের ভয় হইতে লাগিল—কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির জন্য কিছুতেই সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠিতেছিল না! বাঙ্গালীর মেয়ের বিবাহ মানে ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন যাওয়া বইত নয়!

এ সম্বন্ধে আরও একটা অন্তরায় ছিল। কুলিনত্বকে যাঁহারা সামাজিক জীবনের সারসত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তেমন গোঁড়াদের মধ্যে জীবনকৃষ্ণও ছিলেন একজন! তাই কৌলিন্যকে বজায় রাখিবার জন্য পাল্টা ঘরে তিনি সুশীর বর খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু জগৎকিশোর অত-শত চিন্তা-ভাবনা করিতে পারিতেন না; তাঁহার মতে আভিজাত্য যাহাই হৌক, অন্ততঃ বরটি সুপাত্র হয়, আর মেয়েটি খাওয়া-পরার অভাবে না পড়ে, সুখে থাকে তাহা হইলেই হইল!

কিন্তু অন্নদাতা জীবনকৃষ্ণ; কাজেই তাঁহার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে! তাই, জগত্তারিণী যখন স্বামীকে সুশীলার বিবাহের জন্য তাড়া করিতেন, তখন তিনি নির্ব্বিকার ভাবে বলিতেন "জীবনইত সব কর্ব্বে!"

"তা'ত বুঝলুম, কিন্তু মেয়েকে যে আর ঘরে রাখা দায়!"

"তা' আমি কি করবো, জীবনকে চিঠি লেখ! এসে যা'হয় একটা করে ফেলুক!

"তাকে কি আর কম লিখ্‌ছি; কিন্তু সব চিঠিতেই তিনি লিখেন, 'আমার চেষ্টার মোটেই ক্রুটি হচ্ছে না বৌ-দি; কিন্তু অনুরূপ ঘর-বর কিছুতেই মিলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে", ।

হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "সাপটা মার্‌তে গেলে লাঠির ওত মায়া কর্‌লে চল্‌বে না। যদি বরই চাও তবে ঘরের আশা ছেড়ে দাও, আর যদি ঘরই চাইতে হয়, তবে বরের জন্য অত খুঁজে বেড়ালে চল্‌বে কেন?"

"কুল দিয়ে আর ওত কি হবে; মেয়েকে আমার একটা ভাল বরের হাতে দাও মুখ্যু সুখ্যু কি চোর বদ্‌মায়েস নয়; আর খাওয়া-পরার দুঃখু না থাকে।"

"সে-ত আমারও ইচ্ছে; কিন্তু জীবনের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। 'অনু' মা আমার কি যাতনাটাই পাচ্ছে দেখ না; শুধু কুল দেখে দেওয়ার এই-ত ফল!"

আক্ষেপের স্বরে জগত্তারিণী বলিলেন "সে কথা আর তুলোনা; কি কষ্টটাই না পাচ্ছে অনু-মা আমার! যোগাকে দিয়ে কিছু পাঠালে, সে এসে বলে মা-গো, দিদি একেবারে শুকিয়ে গেছে, পরনের কাপড় খানা অবধি ছিঁড়ে গিয়েচে। কিন্তু অক্ষম আমি, আমি-ই বা কি কর্‌বো, শুনে হতাশার দীর্ঘ শ্বাস ফেলা ভিন্ন আর কি কর্‌তে পারি।"

যোগা আরো বল্‌তো "আমি যদি দিদিকে বল্‌লুম, তুমি রাত্তিরে কিছু খাওনি দিদি? অবাক্ হয়ে দিদি বল্‌তো, একথা তোকে কে বল্‌লেরে!' আমি যদি বল্‌তুম, আমি কি আর কিছু টের পাইনে!' দিদি অমনি ক্ষুৎ-পীড়িত শীর্ণ দুর্ব্বল দেহখানাকে সবল কর্‌তে বৃথা চেষ্টা করে উত্তর করত, 'দূর মিছে কথা!" এবং পরক্ষণেই তার চোখের কোন জলে আর্দ্র হইয়া উঠিত, সে আর কোনও কথাই না।"

যদিও দুই একবেলা অনশনে থাকা তাহার পক্ষে কিছুই নয়, এবং যে-বেলা খাওয়া জুটিত, সে বেলাও পূর্ণমাত্রায় উদর-পূর্ত্তি হইত না, তবু পাছে মা জানিতে পারেন এই ভয়ে বাহির বাড়ী পর্য্যন্ত যোগেনের পিছনে পিছনে আসিয়া অন্নপূর্ণা কাকুতি করিয়া বলিত" দেখিস্ ভাই, মাকে যেন কিছু বলিস্ না।"

আট বছরের বালক যোগেন কিন্তু বাড়া আসিয়াই সব কথা মাকে না বলিয়া ছাড়িত না!

আহ্নিক করিতে করিতে হরিমোহিনী, জগৎকিশোরও জগত্তারিণীর এরূপ আলাপ কাণ পাতিয়া শুনিতেছিলেন, আহ্নিক শেষ করিয়া আসিয়া তিনিও সে আলাপে যোগদান করিলেন; তিনি বলিলেন "সুশীলা-মাকে আমার যার তার হাতে দেওয়া হবে না; মান্‌কের-চরের হেমেন্দ্রনাথের সঙ্গে যে কথা হচ্ছে—আমার মতে সেখানেই বিয়ে দেওয়া উচিত।'

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "আমার ত অমত নেই হরিমোহিনী; কিন্তু কুলে হীন বলে জীবনের কিছুতেই এতে মত হবে না।"

"কেন হবে না? আপনি একটু বুঝিয়ে লিখ্‌লেই হবে!" কথাটার সমীচীনতা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, জীবনকৃষ্ণকে তিনি জীবনে এই প্রথম পত্র লিখিলেন।

দিন কয়েক পরে উত্তর আসিল জীবনকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—"মেয়ে আপনাদের, ভালমন্দ আমার চাইতে আপনারাই ভাল বুঝেন? তা'ছাড়া আপনি অগ্রজ! আমার অনুমতির অপেক্ষা না রেখে যা ভাল মনে করেন করুন!"

পত্রে জীবনকৃষ্ণের পরোক্ষ বিরক্তির ভাব জগৎকিশোরও জগত্তারিণীর দৃষ্টি এড়াইল না; কাজেই ফেরত পত্রে তাঁহারা জীবনকৃষ্ণকে জানাইলেন, "তোমার সম্মতি না হ'লে কিছুতেই বিয়ে হবে না, তুমি শীঘ্র এসে সুশীর বিয়ের ব্যবস্থা করে যাও।"

কয়েকদিন পরে জীবনকৃষ্ণ পত্র লিখিলেন "আমার অসম্মতি কিসে বুঝতে পারলে বৌ-দি? তা ছাড়া এখন আমার ছুটি হবে না, তোমরাই কোনও মতে কন্যা দান করে দিও; শেষ কালে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাত্রটি হাত ছাড়া না হয়; আমি শীঘ্রই টাকা পাঠাচ্ছি।"

পত্রের এ বক্র ভাব এবার সরল স্বামী-স্ত্রীর চোখে পড়িল না, তাঁহারা পাত্রের পিতাকে 'বাক্‌দানের' চিঠি দিলেন এবং জীবনকেও বিবাহের তারিখ জানাইয়া, আসিতে লিখিলেন।

জীবনে এই প্রথম তাঁহার অন্তরঙ্গ ভ্রাতৃভাবে শৈথিল্য আসিল।

বিবাহে তিনি যাইবেনই না স্থির, কিন্তু দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনটা কেমন যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছিল; দাদাত সদানন্দ পুরুষ, বৌদি একা কি করিবেন, ইত্যাদি কত কথাই তাঁহার মনে হইল।

ইস্কুলে মাসখানেকের দরখাস্ত করিয়া, বিকালে কল্যাণীকে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "ওগো শুনছ; সকাল-সকাল চারটে ভাতেভার্ত নামিয়ে দিয়ো; আমায় আজকের গাড়ীতেই বাড়ী যেতে হবে!"

অবাক্ কল্যাণী বলিলেন "হঠাৎ এ খেয়াল?"

"খেয়াল আবার কি? ভেবে দেখ্‌লুম, নিজে উপস্থিত না থাক্‌লে সুশীর বিয়ে কেমন করে হবে?"

কুটিল হাসিয়া কল্যাণী বাললেন "ও! আমি বলি কি যে, বাড়ীতে বুঝি কারো কিছু ভালমন্দ হয়েছে!"

রুষ্ট ভাবে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "মনটাকে সব-সময় অত নীচ করে না রাখ্‌লেই কি একেবারে চলে না?"

আহত হইয়া কল্যাণী বলিলেন "না, চলে না;—কিসের জন্য শুনি ওঁদের কাছে এ দাসখত চিরকালধরে তোমার ?"

এই ঘৃণিত প্রশ্নের কোনই উত্তর জীবনকৃষ্ণ দিলেন না, রাস্তার জন্য একখানা কম্বল, একটা বালিশ—দুখানা কাপড় ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন !

ভ্রাতায়-ভ্রাতায় বিরাগ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াও কল্যাণী রোজই অপারগ হইতেন, আর যতই অপারগ হইতেন, ততই আরো বেশী আহত হইয়া দ্বিগুণ প্রতিহিংসা-প্রবন হইয়া উঠিতেন ! ইহার আঘাত গিয়া পড়িত কুমারের উপর, তাই সময়ে-অসময়ে নিরীহ কুমারকে নানা কথা সহিতে হইত ! —জীবনকৃষ্ণ অবশ্য ইহার কোন সংবাদই পাইতেন না, ইস্কুল করিয়া, দুইবেলা টিউসন করিয়া, যজমান চালাইয়া কোনও মতে দিন অতিবাহিত হইয়া যাইত !

সেদিন, সন্ধ্যাকালে কুমার হাট করিয়া ফিরিতেছিল, পথে কাকার সঙ্গে দেখা। সে জিজ্ঞাসা করিল "কোথা যাচ্ছেন কাকাবাবু"?

"বাড়ি!"

কাকার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উত্তরের উপরে কুমার আর কিছুই বলিতে সাহস করিলনা, হাটের জিনিষ পত্র কাঁধে করিয়া বাড়ী ফিরিল !

রাত্রে আহারে বসিয়া কুমার কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিল "কাকা কেন হঠাৎ বাড়ী গেলেন কাকীমা !"

"কি জানি বাপু, সবকাজই আমার পরামর্শ নিয়ে করে থাকেন কিনা !"

"তাত আমি বল্‌ছিনে কাকীমা ! তোমরা আজ ওত চটে আছ কেন ?"

আগুনে আহুতি পড়িল ! দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিলেন "চটে আছিত বেশ আছি ! আমার-ওত গায়ে মানুষের চাম্‌ড়া—সইবার একটা সীমা আছে !" তার পরেই রাগে গর্‌গর্‌ করিয়া কল্যাণী আপনমনে বলিতে লাগিলেন "দাদা, বৌদি কুমার,—অমুক-তমুক সাতগোষ্টীর পায়ের তলায় মাথা খুঁড়ে মর্‌বো—এরজন্যই ভগবান্ আমায় পৃথিবীতে এনেছেন আর কি; এমনিই পোড়াকপাল !"

"তোমার কি আজ শরীর ভালো নেই কাকী-মা ?"

"আমার আর শরীর কবেই ভালো থাকে বল ? এ-ত তোমার সাত গোষ্টীরই ধারণা, লোকে কথায় বলে পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কিনা খায় !—যাক্ ওপরে ভগবান্ আছেন !"

"ওকি সব অমঙ্গলে কথা বলছ কাকীমা !"

উষ্ণ হইয়া কল্যাণী বলিলেন, "আমার এই একটুখানি মনোদুঃখে কি আর তোমাদের অমঙ্গল হতে পারে? তারকেশ্বরে ধর্‌ণা দিলেও ত নয়!"

বিষয়টা ক্রমেই বিষদৃশ হইয়া দাঁড়াইতেছে দেখিয়া, আর কাকীমার অদ্যকার এ অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া কোনও রকমে নাকে-মুখে চারিটা গুঁজিয়া কুমার আচাইতে চলিয়া গেল!

(১৬)

বৈরী শক্তিহীন হইয়া পড়িলে গোপনে শক্তি সংগ্রহ করে, এবং নিজকে যথেষ্ট শক্তিমান্ মনে করিলে, তখনই সে অত্যাচার করিতে গা-ঝাড়া দিয়া পুনরায় অগ্রসর হয়। কল্যাণী বৈরিতা সাধনে জীবনকৃষ্ণকে স্বীয়পক্ষে আনয়ন-রূপ শক্তিসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন; তাই তাহার অন্তরের যথার্থ স্বরূপ কিছুকিছু করিয়া প্রকাশ পাইলেও, সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছিল না! কেননা অনেক চেষ্টা করিয়া—অনেক ফাঁদ পাতিয়াও তিনি জীবনকৃষ্ণকে পথে আনিতে পারিতেছিলেন না।

সেই রাত্রিতে কল্যাণী যে শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, দুবেলা চারটি খাওয়ার সময় ব্যতিত, আজ সাতদিন তিনি উহা ছাড়েন নাই; কুমার নিজেই রান্না-বান্না করে, বাসন-কোসন মাজে—খাওয়া দাওয়া করিয়া কাকীমার ভাত রাখিয়া ইস্কুলে যায়!

জীবনকৃষ্ণের যাওয়ার সাতদিন পরে ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে কুমার ডাকিল "কাকীমা, ও কাকীমা!"

কল্যাণীর কোনও সাড়া নাই; কুমার আবার ডাকিল "কাকীমা! ঘুমিয়ে আছ কি?"

আহত ফণিনীর ন্যায় এবার কল্যাণী বলিলেন "দিনরাত আমার ঐত কাজ!"

কুমার মনে মনে ভাবিল "কথাটা কি একেবারে মিথ্যে!" কিন্তু অপ্রিয় জবাবের লোভ সাম্‌লাইয়া সে হাসিয়া বলিল—

"কাকা চিঠি দিয়েছেন।"

লেপের ভিতরে মুখ রাখিয়াই কল্যাণী উত্তর করিলেন,— "দিয়েছেন-ত আমার কি?"

"কাকা লিখেছেন, উনিশে সুশীর বিয়ে, পত্রপাঠ তোমায় নিয়ে চলে যেতে!"

"ও! আমি না গেলে বুঝি বিয়ে আট্‌কে যাবে?"

"তা' নাহলেও তুমি-আমি না গেলে বাড়ীর সবা-ইর মনটা কেমন হবে বলত?"

গাঝাড়া দিয়া ক্ষিপ্তভাবে কল্যাণী বলিলেন "দেখ বাপু. ও সব নেকামোর জন্য তোমায় কেউ এখানে আনে নি! আমার শরীরটা মোটেই ভালো নেই!

একটা মস্তবড় উপদ্রব নিয়া সে পড়িয়াছে ভাবিয়া কুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

কাকীমার ধনুর্ভঙ্গপণ—কিছুতেই বাড়ী যাইবে না; তাঁহাকে একা রাখিয়া কুমারেরও বোনের বিবাহে যাওয়া হইল না! বিবাহের দিন দুই আগে—কিছু তরিতরকারী কাকার নামে

বুক করিয়া চিঠি লিখিল "কাকীমার শরীর সুস্থ নেই; আমারও একজামিন নিকটে, কাজেই আমাদের যাওয়া হবেনা; জিনিষগুলোর প্রাপ্তিসংবাদ দিবেন—ইত্যাদি!

যাহা হউক, ভগবানের কৃপায়, বিবাহক্রিয়া সু-সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; বর-পক্ষ কন্যা-পক্ষ সকলেই সন্তুষ্ট, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছিলেন না; বরের স্বভাব চরিত্র ভাল হইলেও, রূপগুণ যথেষ্ট থাকিলেও, কৌলিন্যে তাহারা জীবনকৃষ্ণের সমকক্ষ ছিলেন না! জগৎ কিশোর খুবই খুসী হইলেন; কৌলিন্যের মর্য্যাদা তাঁহার মনকে তোলপাড় করিতে পারিল না!—তিনি যে মেয়ের পিতা! মেয়ে সুখে থাকিবে ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট শান্তি! বাস্তবিক পিতামাতা হওয়ার সৌভাগ্য না হইলে, মাতৃত্ব কিংবা পিতৃত্বের যথার্থ অনুভূতি অন্তরে জাগিতে হয়ত পারে না!

ছুটি অল্পদিনের ছিল বলিয়া জীবনকৃষ্ণ দোল পূর্ণিমার আগেই চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের পীড়া-পীড়িতে বাধ্য হইয়া আরও কয়েকদিন তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হইল। জগৎ-কিশোর ঠাকুর ঘরে বসিয়া, দোলপূর্ণিমা দিবস, ঠাকুরের গায়ে আবির মাখাইতেছিলেন, সহসা বাড়ীর বাহিরে একটা ভয়ানক কলরোল শুনিতে পাওয়া গেল! অনতিবিলম্বে, ও বাড়ীর চন্দ্রাননী দেবী তাঁহার একমাত্র পিতৃহীনপুত্র 'অমলেশকে'

হাতে ধরিয়া জগৎকিশোরের ঠাকুর দালানের সাম্‌নে আসিয়া চেচাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন "ওরে বাবারে, মেরে ফেলেছে রে, আমার যে এই সবেধন নীলমণি রে, আমার কি হবে গো!"

অমলেশের মাথা যে কাপড় দিয়া ব্যাণ্ডেজ করা ছিল উহা একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই হোলির দিনে কতটুকু রক্ত আর কতটুকু রং ইহা বুঝিয়া উঠা সহজ ছিল না।

জীবনকৃষ্ণ ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দেখিলেন, জখম বিশেষ গুরুতর নয়! তবু, তখনি কাঁধে চাদর ফেলিয়া অমলেশকে লইয়া তিনি সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়া উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

ডাক্তারখানা হইতে ফিরিয়া অমলেশ নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া রহিয়াছে এমন সময় চোরের মতন পা-টিপিয়া যোগেন ঘরে ঢুকিল। অমলেশ চোখ বুজিয়াছিল, পায়ের শব্দে যোগেনকে দেখিয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। তাহার এই সন্ত্রস্তভাব দেখিয়া, তাড়াতাড়ি যোগেন বলিল "গোল্ করিস্‌নে ভাই! তোকে আমি কিছুই কর্‌বো না।" বলিয়া একটু নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল "তোর খুব লেগেছে না রে অমল? বড্ড কষ্ট হচ্ছে, নয়?"

শৈশবসুলভ সারল্যের স্বরে সে উত্তর করিল" কষ্ট বিশেষ

হচ্ছে না; কিন্তু এমন করে পিচ্‌কারী শুদ্ধ আমায় মাথায় কেন ভাঙ্গ্‌লে যোগেন্‌দা?"

"রাগের মাথায় ভারি অন্যায় করে ফেলেছি অমল; কিন্তু তোকেও তো কত করে সাবধান কর্‌লুম যে, আমি নিস্তার পিসির জন্য ভোগের প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছি, এখন রং দিস্‌নি! এঁটো হাত ধুয়ে, আমি বাড়ী থেকে রং নিয়ে বেরোই—তার পরে যত পারিস্‌ দিস্‌—কিন্তু তুই কেন সে মানা শুন্‌লি নে?

"ও বাড়ীর নিধি ঠাকুর্দ্দা যে সে দিন বল্‌ছিল, ফাগুয়ার দিনে কারো মানা শুন্‌তে নাই, সবাইকেই রং দিতে আছে!"

উষ্ণ হইয়া যোগেন বলিল "মানা নেই যদি তবে যে বলেছে তাকে দিয়ে আস্‌লি না কেন; আমার হাতে রং থাক্‌লে কি আমিও তোকে মানা কর্ত্তুম। কিন্তু সে যাক্‌, ডাক্তার ভাল করে ওসুধ লাগিয়ে দিয়েছ ত রে?"

"কেন জীবনকাকাই ত আমায় সঙ্গে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

কাকা নিজে ডাক্তারখানায় গিয়াছিলেন শুনিয়া, যোগেনের ভয়ানক ভয় হইল, তাই আস্তে আস্তে বলিল "কাকা তবে সব জান্‌তে পেরেছে অমল?"

অমল কোনও উত্তর করিল না; দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া যোগেন বলিয়া যাইতে লাগিল "মা কত মানা করেন, মন্দ

কাজ কর্‌তে নেই; আমিও মনে করি কর্‌বোনা; কিন্তু মন কিছুতেই বারণ শুন্‌তে চায় না। সেদিন দেখ্‌না, একটা ভিক্ষুক এসে চরণ ঘোষের কাছে ভিক্ষে চাইলে, ব্যাটা কসাই, মানুষের রক্ত চুষে-ত টাকা রাখবার জায়গা পায় না; কিন্তু ওদিকে গরীব দুঃখীকে এক পয়সা দিতে গেলেই মাথায় বজ্রাঘাত হয়! কিছুতেই যখন একমুঠো চালও ব্যাটা দিলে না, তখন ওর সব বাড়া ভাত নিয়ে ভিক্ষুকটার আঁচলে বেঁধে দিয়ে এলুম! ব্যাটার উচিত প্রতিফল হলো!—কিন্তু কাজটা আমিও কি ভাল করেছি?"

সন্ধ্যা হইয়া যাইতেছিল। অমলেশের মা প্রদীপ হস্তে ঘরে ঢুকিতেছেন দেখিয়া, যোগেন দৌড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যোগেন চলিয়া গেলে অমলেশের মা জিজ্ঞাসা করিলেন "যোগেন আবার কেন এসেছিল অমু?"

"আমি কেমন আছি, দেখ্‌তে—"

চন্দ্রাননী আর কোনও কথাই বলিলেন না। বাল্যের সরলতা ও অন্তরঙ্গতার মহত্ব কল্পনা করিয়া তিনি তৃপ্তি অনুভব করিলেন। হিংসার ভাব যে শৈশবের বক্ষে কর্পূরেরই মত উবিয়া যায়, বর্ষীয়ান্‌দেরই মনের উহা অবিনাশী সম্পত্তি!

(১৭)

তখন রাত হইয়া গিয়াছিল! অমলদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যোগেন যখন সন্তর্পণে বাড়ী ঢুকিতেছিল, তখন শুনিতে পাইল জগত্তারিণী গম্ভীর ভাবে বলিতেছেন "ছেলেটা যে এ বয়সে এত দস্যি হয়ে ওঠেছে—তার আর কি বল্‌বো! নিয়ে যাওনা ওকে তোমারই সঙ্গে গৌহাটীতে ঠাকুরপো? আমি দেখছি, যদি ও ভয় কাউকে করে ত তোমায়ই একটু করে থাকে!"

জগৎকিশোর সন্ধ্যারতির উদ্যোগ করিতে করিতে বলিলেন "আমাদের সংসারে এত দৌরাত্ম্য নিয়ে ও কেমন করে যে জন্মালে তাই আশ্চর্য্য!"

এই সব কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া যোগেন বাড়ী ঢুকিতে সাহস করিতে পারিল না, সারাদিনের দৌড়াদৌড়ি ও পরিশ্রমে সে যেখানে বসিয়াছিল, সেখানেই মাটির উপর ঘুমাইয়া পড়িল!

রাত্রি বেশী হইতে চলায় সকলেই উৎকণ্ঠিত হইলেন; হরিমোহিনীর কথায় জীবনকৃষ্ণ যোগাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন, সারা পাড়া তন্ন তন্ন করিয়াও যোগার কোনও

সন্ধান না পাইয়া চিন্তান্বিত মনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। বাহিরের ঘরের কোনে আসিতেই দেখেন যোগা সেখানে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!"

সুশীর বিবাহকে নিমিত্ত করিয়া কল্যাণীর অনবরত কুটিল পরামর্শের প্রভাবে জীবনকৃষ্ণের মনের গতিটা ক্রমেই অস্বাভাবিক ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, আগে যে চোখ দিয়া তিনি জগৎকিশোর ও পরিবারস্থ লোকদিগকে দেখিতেন, এখন যেন সে চোখে চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারেন না; তাই ক্রমেই একটা ব্যবধানের যেন সৃষ্টি হইয়া যাইতেছিল!

যোগাকে দেখিয়া আন্তরিক ক্ষোভ মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইল, ঘুমন্ত যোগাকে হাতের লাঠি গাছটি দিয়া তিনি এমন নির্ম্মম প্রহার করিলেন যে, তাহার গা ফুটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

যোগা প্রহারের চোটে জাগিয়া ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল, কাকার পায়ে ধরিয়া, আর সে এরূপ করিবে না বলিয়া কাতর বিনয় করিতে লাগিল, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ কর্ণপাত না করিয়া—অনবরত প্রহারই করিতে লাগিলেন।

কান্নার শব্দ শুনিয়া হরিমোহিনী চকিত হইয়া বলিলেন "মেজ ঠাকুর কুমারের কান্না শুনতে পাচ্ছি না, মা ঠাকরুণ?"

জগত্তারিণী বলিলেন "হবে!"

এ গাম্ভীর্য্য হরিমোহিনীর ভাল লাগিল না, তিনি ছুটিয়া বাহির হইলেন।

হরিমোহিনীকে দেখিয়া যোগেন চীৎকার করিয়া উঠিল "আমায় বাঁচাও হরিদিদি! আমি মরে গেলুম! দোহাই তোমার!"

ত্রস্তে হরিমোহিনী লাঠি গাছটি ছিনিয়া লইয়া, যোগেনকে কোলে তুলিয়া লইলেন!

ঘরে আসিয়া বাতির আলোতে জগত্তারিণীকে যোগার দেহ দেখাইয়া বলিলেন "কি নির্দ্দয় আপনারা, মা-ঠাক্‌রুণ! ছেলেটা চোখের সাম্‌নে খুন হয়ে যাচ্ছে, আর আপনারা বেশ নিশ্চিন্দি বসে আছেন!"

উষ্ণ হইয়া জগত্তারিণী বলিলেন "মরে গেলেই ত আপদ চুকে যায়!"

"যাট্" বলিয়া হরিমোহিনী যোগার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

জগৎকিশোর ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া উচ্চস্বরে বলিলেন "তুমি কি মানুষ না পশু, জীবন! ছেলে-পিলে হলে বুঝ্‌তে পার্‌তে, ছেলেপিলের উপরে আঘাত মা-বাপকে কতখানি আহত করে!"

জগৎকিশোর আরোও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভাতের হাঁড়িটা দুম্ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া জগত্তারিণী বাহির হইয়া বলিলেন "ঠাকুরপোকে এমন করে বক্‌ছো কেন, মেরেছেন বেশ করেছেন ; ও মলেই আমার হাড় জুড়োয় ! ওরই জন্যে লোকের কাছে আমার মুখ দেখানো ভার হয়েছে !"

জগৎকিশোর আর কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না, জীবনকৃষ্ণ লজ্জায় একেবারে মরিয়া যাইতেছিলেন ; কেন তাহার এ দুর্ম্মতি হইল ; কোন দিনও ত তিনি ছেলে-পিলের উপরে হাত তুলেন নাই ! আর জগত্তারিণী অসাধারণ ধৈর্য্যে সব দিক বজায় রাখিয়া ভ্রাতার আক্রোশের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ! কত মহৎ এ রমণী-রত্ন !"

রাত্রে জগৎকিশোর আহারে আসিয়া দেখিলেন, জায়গা কেবল একা তাঁহারই হইয়াছে ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "জীবন খাবেনা ?"

"শরীর সুস্থ নয় !"

"হুঁ" বলিয়া জগৎকিশোর খাইতে বসিলেন। "বাস্তবিক বৌ ! জীবনের ব্যবহারটা এখন যেন কেমনতর হয়ে যাচ্ছে দিন দিন !—নয় ?

এ প্রসঙ্গকে চাপা দিবার জন্য জগত্তারিণী তাড়াতাড়ি বলিয়া

যাইতে লাগিলেন "ওকি, কপির ডাল্‌নাটা পড়ে রইল যে—ভাল হয়নি বুঝি?"

মাথা নাড়িয়া জগৎকিশোর বলিলেন "কেন—বেশ হয়েছে ত।"

"তোমার মাছে কেমন ঝোঁক!—মাছ পড়েনি বলেই কপির ডাল্‌নাটা মুখে উঠ্‌লো না—সে কি আর আমি বুঝ্‌তে পারি নি!"

হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "কি কর্‌বো বল ছোট বেলা থেকে অভ্যাসটা বদ্‌ হয়ে এসেছে কিনা!"

জগৎকিশোরের দুই ছেলের মধ্যে যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ! বড় ছেলে কুমার কত নিরীহ! একান্ত মনে পড়া শুনা করা—অম্লানবদনে অবনত মস্তকে গুরুজনের আদেশ প্রতিপালন—তাঁহাদিগকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা—ইত্যাদি ছিল তাহার সুবোধ-শান্ত স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যোগেন্দ্রের প্রকৃতি ছিল ঠিক্ ইহার বিপরীত। পড়া শুনা বড় একটা তার ধাতে সইত না, কাহার সঙ্গে কি ব্যবহার করা উচিত সে জ্ঞান ও তাহার ছিল না। জগত্তারিণী খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া ইস্কুলে পাঠাইলে, মাসের মধ্যে কুড়ি দিনই—রাখালদের সাথে সাথে খেলিয়া কি ঘুড়ি উড়াইয়া কাটাইয়া দিত। কাহারও বাড়ী গাছে আম কি লিচু ধরিলে, যোগার জন্য উহার পাকার যোটি ছিল না।

বাস্তবিক, যাহা নিষেধ করা যাইবে তাহা করিতে—যাহা সহজ-সাধ্য নয় তাহাতে হাত দিতে তাহার উদ্দাম প্রবৃত্তি—অসীম মনোবেগ দেখা যাইত!

রমানাথের বোন একদিন লুকাইয়া যোগাকে গরম গরম হালুয়া খাওয়াইয়াছিল, সে অবধি সে যোগার সুনজরে পড়িয়া

গিয়াছিল।—লিচুটা-আমটা-জামটা যখনই যাহা যোগা আনিত, তখনই সে নন্দনীকে ভাগ দিত।

সে দিন কতকগুলি কমলা রামুদের বাগান হইতে চুরি করিয়া লইয়া রমানাথের বাড়ী গিয়া জানিল, নন্দিনীর বসন্ত হইয়াছে। দ্রুত সে নন্দিনীর ঘরে গিয়া ঢুকিল এবং ঘণ্টা খানেক সেখানে বসিয়া সেবা শুশ্রূষায় কাটাইয়া তবে ঘরে ফিরিল।

জগৎকিশোর ছেলেটার দৌরাত্ম্য-পূর্ণ মনোবৃত্তির জন্য দুঃখ করিলেও বলিতেন "তা'হলেও এটা ঠিক যে—বাছার আমার মন খুব সরল ও মহৎ।"

জগত্তারিণীও যে মনে মনে এ ভাব পোষণ না করিতেন, তা নয়, তবু বাহিরে ইহার দৌরাত্ম্যের ওজুহাত দিয়া তাহাকে তাহার কাকার সঙ্গে গৌহাটী পাঠাইয়া দিতে সাব্যস্ত করিলেন এই মনে করিয়া, বিদেশে কাকার কাছে থাকিলে, তাহার ভাল পড়াশুনাটা হইবে।

গৌহাটী যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে যোগা বলিল "আমি যাব না মা, গৌহাটীতে।" আশ্চর্য্য হইয়া জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "সে-কি রে?"

"আমি তোমায় ছেড়ে কিছুতেই যাবো না! যেতে হয়ত তুমিও চল।"

"পাগল আর কি ; আমি বাড়ী ঘর দোর ছেড়ে কেমন করে যাব রে ? বল্লেইত আর হয়না !"

"তবে আমিও যাব না !"

"কেন যাবি না, সেখানে তোর কাকা আছেন, কাকীমা আছেন, কত কি খেতে পাবি কত নতুন নতুন জামা কাপড় পর্বি, নতুন লোকের সঙ্গে দেখা হবে—কত সুখে থাক্‌বি !" রাগের স্বরে সে উত্তর করিল "ওঃ ভারিত ! লাগে না আমার—কিচ্ছুই !"

মাতৃস্নেহের আতিশয্যে জগত্তারিণীর চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল, কিন্তু একান্ত অভিভূত হইলেও কোনও প্রকার স্নেহ প্রবণতা তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞানকে ছাপাইয়া উঠিতে পারিল না।

পরদিন যাত্রার সময় হরিমোহিনী বলিলেন "মা'কে প্রণাম করুন !"

বিফল আক্রোশে যোগা বলিল "বয়ে গেছে আমার। কেন তিনি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন !" অবরুদ্ধ কণ্ঠে কথা গুলো বলিয়াই, সে দ্রুত বাহির হইয়া গেল, জগত্তারিণী—উচ্ছ্বসিত অশ্রু অঞ্চলে মুছিয়া যোগার জন্য ভগবানের স্নেহাশীষ যাচ্ঞা করিয়া উপরের দিকে হাত যোড় করিলেন।

বাসায় ফিরিয়া আসার দিন কয়েক পরেই, জীবনকৃষ্ণ তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্যামাপদ চাটুয্যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের

অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, তাঁহার সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইলেন; কল্যাণী অনেক পীড়াপীড়ি করায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকেও সঙ্গ লইতে হইল! বাসায় রহিল কুমার আর যোগা!

জীবনকৃষ্ণ যাওয়ার সময় যোগাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়া গেলেন। একটা নূতন যায়গায় হঠাৎ আসায়, দিন কয়েক যোগা বেশ শান্তশিষ্টই ছিল, কিন্তু অতঃপর পুনরায় তাঁহার স্বাভাবিক মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না।

কুমারের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল; কাজেই সে যোগাকে কখনও কখনও সকালবেলায় রান্না করিতে বলিত! যোগা স্নান করিতে বাহির হইয়া কিন্তু রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে মার্ব্বেল খেলিতে লাগিয়া যাইত!

কুমার পড়াশুনা শেষ করিয়া পাক ঘরে আসিয়া দেখিত— যোগার খবরই নাই; উনুনে আগুন পর্য্যন্ত জ্বলে নাই! ব্যথিত কুমার, তাড়াতাড়ি হাঁড়িতে জগার জন্য ভাতে-ভাত চারিটা বসাইয়া, সময় না থাকায় নিজে অভুক্ত অবস্থায়ই ইস্কুলে চলিয়া যাইত!

কোনও সময় যোগার অসম্ভব রকমের দৌরাত্ম্য ও পাঠে অবহেলা দেখিয়া কুমার যদিও,' কাকা এলে সব বলে দিব' বলিয়া শাসাইত, তবু যখন কাকা তিন মাস তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বাসায়

ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিরীহ কুমারের মুখ হইতে স্নেহ নিলয় অম্বুজের বিরুদ্ধে কোনও কথাই বাহির হইল না।

---

(১৯)

জীবনকৃষ্ণ তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর, কুমার গরমের ছুটিতে দেশে চলিয়া গেলে একদিন জীবনকৃষ্ণের মনটা প্রফুল্ল অনুমান করিয়া কল্যাণী বলিলেন "আচ্ছা, সুশীর বিয়েতে আমার দেশে না যাওয়ার আদত কারণটা কি তুমি জান ?"

"কেন ? কুমার ত লিখেছেই যে তোমার শরীর কাতর ছিল !"

কুটিল হাসিয়া কল্যাণী বলিলেন "তুমিও যেমন, কুমার বলেছে, অমনি বিশ্বেস করে বস্‌লে !—মুখে কথাটি নেই বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওকি কম শয়তান !"

কথা কয়টি বলিয়া জীবনকৃষ্ণের মনোভাব পরখ করিবার জন্য তিনি তাঁহার মুখের দিকে অলক্ষে একবার তাকাইলেন।

জীবনকৃষ্ণ নীরবে আহার করিতে ছিলেন, কল্যাণী বলিয়া যাইতে লাগিলেন "তোমার চিঠি পেয়েই ত একেবারে রেগে আগুন! বল্‌লে আমার যাওয়া ত অসম্ভব, তা'ছাড়া তোমারই যাবার কি কাজ—মিছিমিছি পয়সা খরচ!"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "অকর্ম্মা বলে না হয়—আমি একটা জঞ্জালই! কিন্তু আমার না যাওয়াতে লোকে তোমায় যে মিছি মিছি অপবাদ দিচ্ছে, এটাই আমার দুঃখু!"

উৎসুকভাবে এত সময় পরে জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অপবাদ শুনি?

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে কল্যাণী বলিলেন "অতশত খেয়াল কি আর আমার আছে; না করি? সে দিন কি কথায় যোগা বল্‌ছিল, তাই শুন্‌তে পেলাম।"

উৎকণ্ঠিত জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "কি কথা বলই না?"

"যোগা বল্‌ছিল, সুশীর বিয়েতে আমি না যাওয়ায়, তার মা বল্‌ছিলেন, ও সবই নাকি তোমার চাল; সুশীর বর তার বাবা ঠিক করে ছিলেন—আর সে বর তোমার নাকি মোটেই পছন্দ হয় নি। ও-ত ছেলে মানুষ, বাড়ীতে একটা কথা না হলে, ও সব কথা শুন্‌বেই বা কোত্থেকে—আর ও বোঝেই বা কি?

ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়! জীবনকৃষ্ণের মন যথেষ্ঠ দৃঢ় হইলেও কল্যাণীর কৌশলময় যে সকল আঘাত অনবরত পড়িতেছিল, তাহাতে উহা ক্রমেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল! এখন আর দাদা বৌ-ঠানকে তিনি আগেকার মতন শ্রদ্ধা-ভক্তির চোখে দেখিতে পারেন না। আগে যেখানে শত ত্রুটিও তাঁহার চোখে পড়িত না; এখন ত্রুটি না হইলেও, তাঁহার মনে সে সন্দেহ জাগিয়া উঠে।

বলিষ্ঠ জীবনকৃষ্ণের উপর আপনার কুহক বিস্তার করিতে এতদিন কল্যাণী বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে নিজের দুর্নামের নিমিত্ত করিয়া যে প্রবল দুর্ব্বলতা মনে স্থান পাইল, তাহাতেই জীবনকৃষ্ণের পতন সূচনা করিয়া গেল!

কল্যাণীর যে সব আব্দারকে অসৎ প্ররোচণা বলিয়া তিনি ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছেন, আজ আর তাহা পারিলেন না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র কথাই তাঁহার কাছে গুরুতর ও যথার্থ হইয়া প্রতিভাত হইল।

খাইতে খাইতে জীবনকৃষ্ণ মাথা তুলিয়া বলিলেন "সত্যি তারা এসবকথা রটিয়েছে কল্যাণী?"

ঔষধ প্রয়োগের সুফল লক্ষ্য করিয়া কল্যাণী নীরব রহিলেন, জীবনকৃষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন

"যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর? তাদেরই জন্য এত কষ্ট এত যাতনা সইছি—দূর বনবাসে আছি ; আর তারাই আমার কুৎসা রচনা করতে ছাড়ছে না ?"

অন্যমনস্ক ভাবে কল্যাণী বলিলেন "তবু ভাল ! এতদিনে ঘুম ভেঙ্গেছে।"

কঠোরভাবে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "দেখ প্রতিজ্ঞা করলুম এখন থেকে বাড়ীর সাথে সব সম্পর্ক শূন্য—! দেখি অবস্থাটা কি দাঁড়ায় !"

দিন কয়েক পরে জীবনকৃষ্ণ যখন কুমারের চিঠি পাইলেন "কাকা, বাড়ী এসে অবধি আপনার কোনও চিঠিপত্র পাইনি ; আমি দু'তিনখানা দিয়েছি, তারও কোনও উত্তর নেই। ইহার কারণ কি? আমরা সকলেই বিশেষ চিন্তিত; ফেরৎ পত্রে বাসার সকলের কুশল লিখ্‌বেন। বাড়ীতে টাকা পয়সার বড়ই অনটন !" ইত্যাদি। তখন তাঁহার ক্রোধ এতই হইয়াছিল যে, চিঠি খানা তখনই কুটি কুটি করিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

জীবনকৃষ্ণ চিঠিপত্র দেওয়াও বন্ধ করিয়াছেন—সংসারের খরচের টাকাও পাঠান না ; ইহাতে জগৎ ..শারের পরিবারের অনশন ক্লেশ উপস্থিত হইল। কুমার মায়ের কথামত কাকার কাছে টাকার জন্য অনেক লিখার পর অবশেষে, জীবনকৃষ্ণের লাইন চারেকের একখানা ছোট চিঠি

পাইল—তিনি লিখিয়াছেন "বৌ-দিকে বলো, এখন থেকে সব সময়ই নানা কারণে অর্থ সাহায্য করা আমার পক্ষে কঠিন হবে; আর তুমিও এখন লিখা পড়া শিখেছ; পিতামাতার ব্যয় ভার তুমিও ত মাথায় করে নিতে পার?"

পত্র পাইয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জগত্তারিণী বলিলেন "ঠাকুরপোর এটা কিছু মনের কথা নয়; ওটা আমায় ঠাট্টা করেছেন?"

"না মা, চিঠিতে ঠাট্টার আভাস মাত্র আছে বলে মোটেই মনে হচ্ছে না।"

রাগের ভাণ করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তুই ত সবই জানিস্ কি না?"

জগত্তারিণীর সুর একটু চড়া হইয়াছিল, শুনিয়া ঠাকুর ঘর হইতে জগৎকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে বৌ, জীবন চিঠিতে কি লিখেছে?"

ততোধিক উষ্ণভাবে জগত্তারিণী উত্তর করিলেন "আপনাদের সংসার আপনারা যেমন করেই পারুন চালান; একজনই যে দাসখত দিয়ে থাক্‌বে এমন ত কোনও কথা নেই?"

হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "ওকে কি আর দাসখত বলে? যার যার পূর্ব্বজন্মের ফল ভোগ যে করতেই হবে?"

"অর্থাৎ?" জগত্তারিণীর স্বর তীক্ষ্ণ!

হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণের মস্ত বড় অপরাধ, আমার ভাই হয়ে জন্মানো; কাজেই তাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করতেই হবে!"

"তোমার সঙ্গে কথা বলাই বৃথা!" বলিয়া জগত্তারিণী চলিয়া যাইতেছিলেন। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, দেখ, তোমার সংসারের জ্বালা আমি আর সইতে পারিনে; নিজেদের চিন্তা এখন থেকে নিজেরা করো, গতর খাটুলে যেখানে সেখানেই আমার এক পেটের দুটো ভাতের যোগাড় হয়ে যাবে।"

স্বভাব-সুলভ পবিত্র হাসি হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "শুধু তোমার অন্নের যোগাড় করলে চল্‌বে কেন বৌ? গতর খেটে যদি একজনের অন্নের যোগাড় হয়, তবে তোমার অথর্ব্ব স্বামীর জন্যও চারটে সংস্থান করে নিও না।"

জগত্তারিণী আর কোনও উত্তর করিলেন না, পালম্‌-শাকের চাঙ্গারি খানা হাতে তুলিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া গেলেন!

বছর খানেক পরের কথা। জীবনকৃষ্ণের উপর কল্যাণীর ঔষধপ্রয়োগ ক্রমে সফল হইতে চলিয়াছে!

সে দিন ভোর হইতেই নিঝুমভাবে বৃষ্টি পড়িতেছিল! কাকীমার শরীর ভাল ছিল না বলিয়া আগের দিন রাত্রে রান্না করিতে হইয়াছিল যোগাকেই। চাউল কতটা নিতে হয় সে জানিত না, অথচ ডাকিতে ডাকিতে কাকীমারও কোন সাড়া নাই, তাই আন্দাজে কিছুটা চাউল নিয়া সে রান্না করিয়াছিল।

কিন্তু চাউলের পরিমাণ এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহা হাড়িতে ধরিলনা, কতক চাউল-চাউল রহিল, কতক জল না থাকায় পুড়িয়া ছাই হইল!

পরদিন ইস্কুলে যাওয়ার সময়, সেই ভাত যোগা তাহার পাতে দেখিয়াই আগুন হইয়া গেল "এ ভাতগুলো আমার পাতে কেন—কাকী মা?"

"কাল রাত্তিরে যে পিণ্ডি চট্‌কিয়ে রেখেছিলে সে গুলো ত চালানো চাই!"

অভিমানের স্বরে সে বলিল "এত গুলোতে এক বেলায় চালাতে পার্‌বে না কাকীমা? তার চাইতে চার্‌টে সরিয়ে

রাখনা, রাত্তিরে দেবে—পাতে থাকলে মিছি মিছি নষ্ট হবে বৈ-ত নয় ?" বলিয়াই সে অর্দ্ধসিদ্ধ বুটের ডাল আর পোড়া ভাতের উপর সমস্ত ঘটির জল উপুড় করিয়া ঢালিয়া অভুক্তই উঠিয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিয়া গেল "তুমি আমাদের নেহাৎ কুকুর বেড়ালেরই মত মনে না করলে, এগুলো আমাদের পাতে তুলে দিতে কিছুতেই তোমার হাত উঠতো না কাকীমা! তাই কুকুর বেড়ালের জন্যই এগুলো রেখে গেলুম।"

কল্যাণীও উচ্চগলায় বলিলেন "এ দেমাক্ আর বেশী দিন নয়—বাবাজী!"

ফিরিয়া যোগা বলিল "ও সব ভয় দেখিও দাদাকে; তার মতন একটা আস্ত গাধাত আর আমি নই!

বলিয়াই হন্ হন্ করিয়া যোগা চলিয়া গেল। কাহারও কাছে এতটুকু নম্রতা স্বীকার করা তাহার কোনও দিনেরই অভ্যাস ছিল না।

কি কারণে জীবনকৃষ্ণের মনটা খুব ভাল ছিল না! খাইতে বসিয়া কল্যাণীর কাছে, অদ্যকার যোগার কীর্ত্তি শুনিয়া তিনি একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইস্কুলে রওয়ানা হইলেন।

জীবনকৃষ্ণের চেহারা এবং হাতের বেত দেখিয়া ছেলেরা সব সন্ত্রস্ত হইল, যোগাও ততোধিক!

পড়াতে বসিয়াই প্রথম প্রশ্ন করিলেন যোগাকে! উত্তর দিতে না পারায়, উঠিয়া জীবনকৃষ্ণ যোগাকে এমন প্রহার করিলেন যে অসাড় যোগা ইস্কুলের কয়েক ঘণ্টা অতি কষ্টে কাটাইয়া দিয়া, বাড়ী ফিরিয়া মড়ার মতন বিছানায় শুইয়া পড়িল। রাত্রি ন'টার সময় ছেলে পড়াইয়া জীবনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রান্নাঘরে দরজা দেওয়া; কাহারও কোনও সাড়া নাই, কেবল কল্যাণী বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছেন। কল্যাণীকে "রান্না হয়েছে কি না" জিজ্ঞাসা করিলে, কল্যাণী কাঁদিয়া জবাব দিলেন "ভয়ানক মাথা ধরেছে আমার, যোগাকে কতকরে বল্লুম, কিন্তু সে কিছু গেরাহ্যি না করে বিছনায় শুয়ে পড়েছে—মরে গেলেও দেখবার একটি লোক নেই; দাসীবৃত্তি চিরকাল ধরে করবার জন্যেই এ সংসারে এসেছি!"

কুমার বড় হইয়াছে, কলেজে পড়ে, তাহাকে এখন আর বড় কাকীমার অত্যাচার সহিতে হইত না, কাজেই সকল নিষ্ঠুরতা পড়িত গিয়া যোগারই উপরে!

কঠোর স্বরে জীবনকৃষ্ণ ডাকিলেন—"যোগা!"

মেঘের ডাকে ধরণীর বুক যেমন করিয়া কাঁপিয়া ওঠে, তন্দ্রাশ্রিত যোগা সহসা চেতনা লাভ করিয়া তেমনি কাঁপিয়া উঠিয়া আকুলস্বরে—কষ্টে উত্তর করিল "কেন, কাকাবাবু!"

এই কেনর উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই, যোগার উপরে পড়িল জীবনকৃষ্ণের জর্জ্জর পদাঘাত !

—"রোজ রোজ ভাতের পাহাড় ভাঙ্গার জন্য সবাই আছি, কিন্তু করবার কর্ম্মাবার সময় কারো টিকিটি নাই !"

মানুষ যাতনা পাইলে কাঁদিয়া উঠে তখন, যখন অপরের কিছুমাত্র সহানুভূতি পাওয়ার আশা থাকে ! কিন্তু যখন বুঝিতে পারে, অকূল বিপদে সে পরিপূর্ণ অসহায়, তখন সে কাঁদিতে পারে না ! যোগা বুঝিল, এই তমঃশ্যামল নিশিথিণীতে সে একা—সম্পূর্ণ একা ! তাই তাহার ক্রন্দনের অশ্রুজল মনের আগুণের উত্তাপে শুকাইয়া অতিকষ্টে বিষজর্জ্জরিত দেহখানাকে টানিয়া তুলিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল !

পা-ধুইতে ধুইতে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "যত সব নেমক্হারামের দল ; এদের পোষার চাইতে কুকুর পোষাতেও লাভ !"

এতক্ষণ কুমার একটা ট্রিগনমেট্রির প্রব্লেম নিয়া এতই বিভোর হইয়া রহিয়াছিল যে, এদিকে যে রাত ন'টা—এ খেয়াল তাহার হয় নাই ! এখন কাকার কঠোর স্বর শুনিয়া চকিতে বহিগুলি যেমন-তেমনি রাখিয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটিল !

আসিতে আসিতে দেখিল, যোগা গুলিখোরের মতন রান্না-ঘরে ঢুকিতেছে ! স্নেহের স্বরে কুমার ডাকিল "যোগা" !

দুই তিনবার ডাকিয়াও কোনও উত্তর না পাওয়ায় কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া কুমার বলিল "রাগ করিস্‌নি ভাই, আগে আমায় কেন জানালি না ?"

"বেশী বক্‌বক্‌ করোনা বল্‌ছি! আমায়ই আরো দশজন জানিয়েছিল কিনা!" বলিয়া বিফল আক্রোশে যোগা উনুন ধরাণোর উদ্যোগ করিতে লাগিল!

"হয়েছে, এখন তুই সর দেখি!" বলিয়াই, হাত দিয়া যোগাকে সরাইতে গিয়াই কুমার দেখিল, যোগার শরীর একেবারে আগুনের মতন গরম্‌! ব্যথা-মিশ্রিত স্নেহ-কোমল স্বরে কুমার বলিল "এতবড় জ্বর গায়ে নিয়ে তুই কাউকে কিছু না বলেই পড়ে আছিস্‌ যোগা ?"

"কার কাছে বল্‌বো দাদা! গাছ-পাথর লোহা-লক্কড়ের কাছে ?" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে যোগা—দ্রুত বাহির হইয়া গেল! কুমার নীরবে রান্নার উদ্যোগ করিতে লাগিল!

আহারে বসিয়া জীবনকৃষ্ণ একমনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তোমরাইত যোগাকে নষ্ট করেছ, বেশী বেশী আস্কারা দিয়ে; নইলে কি আর ও অতটুকু বয়সে এত বেড়ে উঠ্‌তে পার্‌তো ?—হতচ্ছাড়া গেল কোথায় ? খাবে না ? তুমিই বা ওকে সরিয়ে আদর দেখাতে এলে কেন ?"

কুমার ধীরে ধীরে উত্তর করিল "সে রাত্তিরে খাবে না, কাকাবাবু, তার ভয়ানক জ্বর এসেছে!"

"সবই এক ছাঁচে ঢালা" বলিয়া জীবনকৃষ্ণ উঠিয়া গেলেন। কাকার পাতে কল্যাণীর ভাততরকারী রাখিয়া, কুমার অভুক্ত অবস্থায়ই বাহির হইয়া গেল; জীবনে এই প্রথম তাহার নিরীহ প্রকৃতিতে সংগ্রামের ক্ষুব্ধ-চাঞ্চল্য দৃপ্ত হইয়া উঠিল!

অন্ধকারে যোগার শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া স্নেহ-জড়িত স্বরে কুমার জিজ্ঞাসা করিল "যোগা, ঘুমিয়ে আছিস নাকি রে?"

"হাঁ"!

কুমার বুঝিল যোগার রাগ হইয়াছে। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে যোগা?"

"হাঁ, একটু বিষ এনে দিতে পার আমায়?"

ব্যথিত হইয়া কুমার উত্তর করিল "এত অল্প বয়সে এ সব কি কথা তোর যোগা? সংসারে থাক্‌তে গেলে যে অনেকই সইতে হয় ভাই!"

"দেখ, আমায় আর বেশী বকিও না বল্‌ছি।" যোগার শরীর সুস্থ নয় ভাবিয়া—কুমার আর অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িল!

যোগার ঘুম আসিতেছিল না, গায়ের ব্যথায় ও জ্বরের

প্রকোপে কেবলই উঃ, আঃ করিতেছিল! যন্ত্রনা যখন অসহ্য হইল তখন মাঝামাঝি রাতে ডাকিয়া উঠিল—"দাদা ?"

"কেন রে ?"

"বড্ড ব্যথা দাদা ?"

"কোথায় রে ?"

"যাও তুমি নেহাৎ বোকা! কোথায় হবে আবার ?"

"দিন রাত ত কারু মানা শুনবিনে; রোদে বৃষ্টিতে দৌড়াদৌড়ি—না আছে চানের সময়, না আছে খাওয়ার সময়, না আছে ঘুমের সময়—তোকে আর কি বলে বুঝাব!"

যোগা হঠাৎ কাতরভাবে কাঁদিয়া বলিল "সবই আমার দোষ দাদা! কিন্তু কাকা এমন ধারা মারলেও তাঁর মোটেই দোষ নেই না!"

"আজ আবার কি দুষ্টুমি করেছিলি যোগা ?"

"দুষ্টুমী করেছি—বেশ করেছি; যাও! হয়নি আমার কিছু, আমায় আর জ্বালাতন করো না বল্‌ছি!" বলিয়া যোগা পাশ ফিরিয়া শুইল; স্নেহ-কোমল কুমার আলো জ্বালাইয়া দেখিল সত্যি সত্যিই যোগার সারা গা ভয়ানক ফুলিয়া উঠিয়াছে।

অন্যায় অবশ্য যোগা অনেকই করিত! এবং যোগার একগুঁয়েমি শোধরাইবার চেষ্টা কুমারও অনেক করিয়াছে; কিন্তু আজ যোগার জন্য কুমার কোনও উপদেশের বাণীই

যেন নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না, কাকার অত্যকার এই নৃশংস আচরণ কুমারের সহিষ্ণু মনকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

(২১)

সপ্তাহ তিনেক ভুগিয়া আজ দুই দিন হইল যোগা অন্ন পথ্য করিয়াছে। এ কয়দিন কুমার কলেজে যায় নাই; ছোট ভাইয়ের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া একমনে কাতরে ভগবানকে ডাকিয়াছে, আর ঔষধ পথ্য দান ও সেবা শুশ্রূষা অক্লান্ত পরিশ্রমে করিয়াছে।

প্রলাপ বকিতে বকিতে যোগা কখনও হঠাৎ বলিয়া উঠিত "দোহাই তোমার, কাকীমা! কাকাবাবুকে বলে দিও না; আমি বাসি, পঁচা, পোড়া সবই খেতে পারবো—কিছুই আপত্তি করবো না!"

একটু নীরব থাকিয়াই আবার বলিত "আর আমায় মেরো না কাকাবাবু; উঃ বড্ড ব্যথা। আর আমি দুষ্টুমী করবোনা, সত্যি বলছি!"

কল্যাণী এই সব শুনিয়া বলিতেন "ছেলেটা কত বড় শয়তান্

দেখনা, রোগের বাহান্না করে লোকদের জানান হচ্ছে, আমর তাকে না জানি কত কষ্টই দিই!”

—যাহাহৌক ভগবানের ইচ্ছায়, ক্রমে যোগা সারিয় উঠিল!

যেদিন অন্ন পথ্য করিবে, সেদিন ভোরে উঠিয়াই যোগা বলিল “দাদা, তুমিই না হয় আমার জন্যে চারটি রেঁধে ফেলনা?” বিস্মিত কুমার বলিল “কেন রে? কাল্ রাত্তিরে মাগুর মাছ এনে কাকীমাকে বলে রেখেছি, সকাল সকাল চারটে ভাত তোকে দিতে।”

“না দাদা; উনি কখন উঠ্‌বেন তার ঠিকানা নেই, ত ছাড়া, আজ্‌কের দিনেও কি বাসি—পচা খাইয়ে মার্‌তে চাও তুমি আমায়?”

হাসিয়া কুমার বলিল “কি যে তুই বলিস্! কাকীমাকে তুই এত অমানুষ ঠাওরাস্, যে আজকের দিনেও তোকে বাসি পচা দিবে?”

খাইতে বসিয়া যোগা দেখিল, সে যাহা পূর্ব্ব হইতে ভাবিয় রাখিয়াছিল, ঠিক তাহাই হইয়াছে; রাত্রের ভাত গুলিকেই একটু গরম করিয়া কল্যাণী তাহাকে দিয়াছেন!

কুমারকে ডাকিয়া বলিল, “দেখে যাও দাদা; আমাকে আগে না তুমি কাকীমার হয়ে কত কি বলেছিলে।

কুমার কাছেই কি একটা কাজ করিতেছিল; যোগার কথায় ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল! "এ ভাত যে কাল্‌কের কাকীমা"!

ক্ষিপ্ত কল্যাণী উত্তর করিলেন "কে জানে বাপু তোমাদের নিয়ে আমি আর কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি নে! ভগবান্ কবে যে আমায় নিস্তার দেবেন জানিনে।"

দুঃখিত হইয়া কুমার বলিল "যোগার যে এতে অসুখ কর্‌বে কাকীমা! এত বড় শক্ত ব্যামো থেকে ওঠে সবে আজ ভাত খেতে বসেছে, এতে কি ওর বাঁসি পঁচা সইবে? ও গুলো আমায় দিলেইত পার্‌তে!"

—"পানথেকে চূণটুকু খসার যোটি নেই! আমার কাজ যদি তোমাদের না মনঃপূত হয় তবে আমিও বলি, যার যার কাজ নিজেরা করে নিলেই পার।"

রোগে এবং অনাহারে যোগার মেজাজ একেবারে খিট্‌খিটে হইয়া রহিয়াছিল; সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমরাই যদি সব করে নেঁবো, ত তোমায় রাখা হয়েছে কি শুধুশুধু শুয়ে নবাবী কর্‌তে?"

কুমার, যোগার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "উঠে আয় যোগা; একটু পরে খেলে আর কি হবে? গরম ভাতটা হয়েই যাক্‌না।" বলিয়া রোগশীর্ণ বলহীন যোগাকে টানিয়া লইয়া কুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

পরিপূর্ণ বুভুক্ষায়, অন্ন-বঞ্চিত যোগা যাইতে যাইতে কাতর কণ্ঠে বলিল "মরার উপর খাড়ার ঘা দিচ্ছ কাকীমা? এর চেয়েও বড় শত্রুতা কী করতে পারো ভেবে রেখো!"

ছেলে পড়াইয়া জীবনকৃষ্ণ বাড়ী আসিবার আগেই কুমার নিজে চারিটী ভাত রান্না কবিয়া যোগাকে খাওয়াইয়া কলেজে চলিয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের ইতিহাস কল্যাণী যে হাজার রকমের রং ফলাইয়া জীবনকৃষ্ণের সাম্‌নে ধরিবেন, কুমার ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল; তবু এ সম্বন্ধে সে কাকাকে কিছুই নিবেদন করিল না! সহিষ্ণুতা তাঁহার প্রকৃতিতে এমনি স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল!

কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কুমার দেখিল বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে; মা লিখিয়াছেনঃ—"বাবা কুমার; তোম্‌রা যে কি রকম করে বাড়ী সম্বন্ধে একেবারে চোখ কাণ বুঁজে আছ—বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে। সংসারটা যে চলে কেমন করে, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার এতটুকুও কি দরকার তোমরা মনে করোনা? এখন ভগবান্ আমায় নিলেই বাঁচি!"

তাঁহার চিঠির সঙ্গে কাকার নামে আরও একখানা চিঠি ছিল; মহেন্দ্র লিখিয়াছে "জীবন দা; বাড়ীতে যে বড়দা'

বৌঠান্ এরা উপোস কচ্ছেন, এ খবর ঘন ঘন পেয়েও চুপ্ করে আছ; এ কি কথা? পত্র পেয়েই টাকা পাঠিয়ে দেবে! দেশটা আমাদের এম্‌নি যে নিজের দেহ বিক্রী করেও একটি আধ্‌লা পাবার যো নেই!"

ঐ পত্রের উত্তরে জীবনকৃষ্ণ লিখিলেন—"সারা জীবনইত দাসখত দিয়ে এলুম মহেন্দ্র! কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, তবু লোকের ধারণা; প্রত্যবায়টা আমারই!

"যাক্, বৌঠানকে বল্‌বে, তাঁদের উপায় যেন তাঁরা করেন; আমি আর কত ঘাড়ে করে বইব!"

পত্র পাইয়া মহেন্দ্রর চক্ষু স্থির হইয়া গেল; জীবনকৃষ্ণের এ আদর্শ চরিত্রও এমন ধারা পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে, এ ধারণা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! তাঁহার কেবলি মনে হইতেছিল কামরূপে মন্ত্রতন্ত্রের দেশে থাকিয়াই কি তবে জীবনদার মনের গতি এমন হইল?

(২২)

ঘরে জিনিষ পত্র যাহা ছিল প্রায় সবই একে একে বিক্রয় করিয়া দুইদিন যাবৎ জীবনকৃষ্ণের নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করিয়াও যখন হতাশ হইলেন, তখন সারাদিনের

অভুক্ত পরিবারের জন্য কিছুও সংস্থান হয় কিনা দেখিবার আশায়, এই মাত্র জগৎকিশোর আপনার শতছিন্ন চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়াছিলেন !

জগত্তারিণী বিষণ্ণ মনে বারান্দায় বসিয়াছিলেন ; অন্ধকার হইয়া যাইতেছে; তবু ঘরে বাতি জ্বলে নাই ; কেননা কেরাসিন বাড়ন্ত ! সেইজন্য, এ কয়দিন ধরিয়া দিনেই, রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া ছেলেমেয়েদের শোওয়াইয়া রাখিতেন— নিজেদের জুটিলে, উনুনে কাঠের আগুনের আলোতে রাত্রে কোনরূপ স্বামীস্ত্রীতে আহারাদি সমাধা করিতেন !

অন্ধকারে অন্যমনস্ক জগত্তারিণীকে সচকিত করিয়া, মহেন্দ্র "বৌঠান কোথায় গো !" বলিয়া ঘরে ঢুকিলেন ! জগত্তারিণী ফিরিয়া তাকাইলেন ; কোন সাড়া দিলেন না।

"আমাদের দেশের চা'ল মোটেই ভালনয় কিনা, বৌ-ঠান্ ; তাই ফি বছরেই কাছাড় থেকে পূজোর জন্য আমাদের চা'ল আসে। মা তাই থেকে কিছুটা আপনাদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।"

এই সন্ধ্যায় কেন যে মহেন্দ্র চাউল নিয়া আসিয়াছিলেন, বুদ্ধিমতী জগত্তারিণীর ইহা বুঝিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না ! আজ দুইদিন ধরিয়া তাঁহাদের কি ভাবে চলিতেছে, তাহা অপরে ঘুণাক্ষরে না জানিলেও, মহেন্দ্রের সতর্ক দৃষ্টি

এড়ায় নাই! কিন্তু পরদুঃখকাতর মন থাকিলেও তদনুযায়ী বিত্ত-সামর্থ্য মহেন্দ্রের ছিল না; তাই থাকিয়া থাকিয়া অক্ষমতার অভিঘাত সহ্য করা ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর ছিল না!

আজ দুপুরে আসিয়া যখন দেখিলেন, বৌ-ঠানের উনুনে হাঁড়ি চড়ে নাই, তখন তাঁহার মনটা অভিভূত হইয়া গেল; কিন্তু বৌদি যাহাতে তাঁহার এই মনোভাব জানিতে পারিয়া লজ্জা না পান, সেই অভিপ্রায়ে তিনি বলিলেন "একি বৌ-ঠান্, আজ যে বড় সকাল সকাল তোমাদের খাওয়া দাওয়া সারা?"

বিমর্ষভাবে জগত্তারিণী উত্তর দিলেন "সকাল আর কোথায় ভাই?"

"বেলা কি অনেক হয়েছে? তবে আমারও ত ভাতগুলো ঠাণ্ডা হচ্ছে; বাড়ী গিয়ে মার বকুনি শুন্‌তে হবে আর কি!"

"এত বেলা অবধি কোথায় ছিলে?"

"আর বলো না বৌ-ঠান্; নন্দী গ্রামের মাধুর মার ভয়ানক দাস্ত বমি হচ্ছে; সকালে এসে মাধু কেঁদে পড়্‌লো; কাজেই কি করি, বেচারীকে দেখ্‌তে গেলুম; তাই ফির্‌তে দেরী হলো! দূরত আর কম নয়, প্রায় চার ক্রোশের উপর!"

আহারে বসিয়া মহেন্দ্রের অন্নগুলি গলা দিয়া নামিতেছিলনা; পূজা নিরত প্রশান্ত জগৎকিশোর অভুক্ত! দেবতার ভোগ

আর জগত্তারিণীর দুর্ব্বিষহ মনোব্যথা কল্পনা করিয়া, প্রত্যেকটি গ্রাস যেন কাঁটা হইয়া তাঁহার গলায় বিঁধিতেছিল!

সারা বিকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায়ও একটা পয়সা যোগাড় করিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে যখন মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা হয় হয়! তাঁহার বাবা হাটে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, আর মা, ছোট নাতিনীটিকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন। এই অবসরে, চুপি চুপি মহেন্দ্র ভাড়ারে ঢুকিয়া সের দশেক চাউল একটা বস্তায় পুরিয়া লইয়া অস্ত গমনোমুখ সূর্য্যের স্তিমিত আলোকে, বাহির হইয়া গেলেন। পথে মুদীর দোকান হইতে সেরখানেক আলু ধারে কিনিয়া মহেন্দ্র জগত্তারিণীর দুয়ারে আনিয়া ফেলিলেন! তারপরে ত্রস্তস্বরে মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "এখন চল্লুম বৌদি; কত কাজ যে আমার পড়ে রয়েছে, সে আর বল্‌বার নয়!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "বেশী কাজের তাড়াই যদি ছিল ভাই; তবে এখনই চা'লগুলো না নিয়ে এলেও ত হতো; পূজোর ত এখনও ঢেরই দেরী।"

মহেন্দ্র ক্ষিপ্রতার সহিত বলিলেন "মা যদি বলেছেন, এই কাজটা এক্ষুণি কর, তাহলে কি আর সেটা ফেলে রাখার যো-টি আছে?" তার পরেই হো হো করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন "আমার সব কথাকেই অত গুরুতর বলে ধরে

নিয়োনা বৌ-ঠান্! তাড়াহুড়া করা এমনি আমার স্বভাব! লিখা-পড়া শিখিনি; টাকা পয়সা উপার্জ্জন কর্‌তে পারিনে, কাজেই, তেমন কোনও দায়িত্ব আমার থাক্‌তেই পারে না। এর-তার দু'দশটা ফায় ফরমায়েস্ কুলিয়ে দেওয়া, এইত আমার কাজের মধ্যে কাজ!"

চাউলগুলি বস্তা হইতে খুলিতে খুলিতে, ইহার মধ্যে আলু দেখিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "এগুলো আবার কেন ঠাকুরপো।"

মহেন্দ্র আগে হইতেই উত্তর যোগাইয়া রাখিয়াছিলেন, বলিলেন "মা বলেন, শুধু চাউল, দিতে নেই, ঘরের লক্ষ্মী অন্তর হন; তাই সঙ্গে আরও কি দিয়াছেন; অত খবর আমি রাখিনি।"

মিথ্যা কথা বলিতে, মহেন্দ্রের বুকে বজ্রের মত বাজিত, কিন্তু আজ যাত্রার দলের অভিনেতার মত অক্লেশে সেই মিথ্যা তিনি আওড়াইয়া গেলেন—একটুও মুখে আট্‌কাইলো না। ইহা কিসের জন্য, জগত্তারিণী অন্তরতম প্রদেশে সুস্পষ্ট অনুভব করিলেন!

ও পাড়ার কেশব কি একটা মতলবে মহেন্দ্রের পেছনে পেছনে ঘুরিতেছিল! মহেন্দ্র ভূমিশয্যা হইতে চারুশীলার সু-সুপ্ত দেহখানাকে সন্তর্পণে তুলিয়া বিছানায় শোওয়াইতে শোওয়াইতে বলিলেন "তুই না হয় এখন যা কেশব, আমার

একটু দেরীই হবে দেখ্‌তে পাচ্ছি। দাদাকে না পেয়ে আমার যাওয়া হবে না!"

কেশব বলিল "এইনা বল্‌লে ঠাকুর, যে তোমার জরুরী কাজ আছে;—লোকে সাধে কি তোমায় ছন্নছাড়া বলে থাকে?" উত্তপ্ত হইয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "তোর অত কথায় কাজ কি রে বেটা পাজী!"

মহেন্দ্রনাথ প্রথম ভাবিয়াছিলেন, এখানে একটু বসিলে, গল্প-গুজবে জগত্তারিণীর বিমর্ষ মনটা একটু প্রফুল্ল হবে, কিন্তু পরক্ষণেই যখন ভাবিলেন, এখানে থাকিলে পূজার-মানসিক চাউল আজ্‌কে হাঁড়িতে চড়িবে না, তখনই বলিয়া উঠিলেন "দাদার আস্‌তে হয়তঃ অনেক দেরী হবে বৌ-ঠান্; আজ্‌কে তবে আসি; কাল সকালে এসে দেখা কর্‌বো।"

এই লোকটার জীবনভরা নিঃস্বার্থপরতার আর পবিত্র পরোপকার প্রবৃত্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে জগত্তারিণী তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, হঠাৎ জগৎকিশোরের পদশব্দে, চকিত মাথার ঘুমটা টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রুই মাছের একখানা মোটা গাদা ঘরের মাঝখানে ফেলিয়া দিতে দিতে জগৎকিশোর বলিলেন "টাকার জোগাড় কোথাও হ'ল না বৌ; কেউ একটা পয়সাও ধার দিতে চায় না।"

মাছের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উষ্ণ জগত্তারিণী বলিলেন

"চালের টাকার জোগাড় হয়নি। কিন্তু মাছের পয়সা ত বেশ জোগাড় হয়ে গিয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি!"

হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "মাছের ও কি আর পয়সা দিয়েছি? রাস্তায় একটি শিষ্য প্রণাম করে দু'আনা পয়সা দিয়েছিল; মেছো বেটাকে তাই দিয়ে এসেছি, বাকী পয়সা পরে দিলেও চল্‌বেখন!"

"পরে দিলেত চল্‌বে বুঝ্‌লুম; কিন্তু পরেই বা তা আস্‌বে কোত্থেকে?"

নির্ব্বিকারভাবে জগৎকিশোর বলিলেন "মদনমোহন তার উপায় করে দেবেন।"

"তা না হয় দিবেন; কিন্তু আপাততঃ শুধু মাছে ত আর ক্ষুধা মিট্‌বেনা।"

দুঃখিত জগৎকিশোর বলিলেন "কি কর্‌বো বৌ, একটা টাকা অন্ততঃ কোথায়ও পেলে চা'ল নিয়ে আস্‌তে পারতুম্ কিন্তু তাও পেলাম না।"

"যে দু'আনা জুটেছিল, তাই দিয়ে চা'ল নিয়ে এলেইত হতো।"

"বলকি বৌ! দুআনার চা'ল! চা'লের মন যে ৮৲ টাকা?"

"যে কয়টাই পাওয়া যেত! দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ ভাত

পায়না-ক্ষুদকুঁড়ো খায়, ফেণ খায়, আজ আমাদেরও এই দুর্দ্দৈবের মাঝে, দুআনার চালের ফেণ খেয়েই দুবেলা চালিয়ে দিতে হবে!"

"মনটাকে এমন করে অধীর করে তুলোনা বৌ! ভগবানে বিশ্বাস রাখ! তিনিই আমাদের দেখ্‌বেন উপকার কর্‌বেন।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন" আমি জানি, তুমি নিজের জন্য মোটেই ভাবনা, যা'কিছু—ভাবনা, আমাদেরই জন্য; কিন্তু ভেবে কি কর্‌বে; কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ না করে আর উপায় কি?"

কাছেই একটা বস্তা দেখিয়া, জগৎকিশোর জগত্তারিণীকে বলিলেন "এর মধ্যে কি বৌ!"

পতিপ্রাণা জগত্তারিণী জগৎকিশোরের সঙ্গে, এসম্বন্ধে একটু—রহস্য ও করিতে পারিলেন না, চাউলের বৃত্তান্ত আদ্যো-পান্ত সমস্তই জগৎকিশোরকে বলিলেন! পরিপূর্ণ ভগবদ্বিশ্বাসে জগৎকিশোর বলিয়া উঠিলেন "বুঝ্‌লে বৌ! আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন, আমাদের পালন করার জন্য তাঁর পরোক্ষভাবে, কত বড় সতর্ক দৃষ্টি! ভাব্‌ছো কি! উঠে, উনুন ধরিয়ে দাও!"

স্বামীর এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের বাঁধ ভাঙ্গ্‌বার সাধ্য—জগৎত্তারিণীর ছিলনা; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জগৎত্তারিণী রান্নার

আয়োজন করিতে চলিয়া গেলেন ; জগৎকিশোরও হাত-পাও ধুইয়া নির্ব্বিকার মনে আহ্নিক করিতে বসিলেন।

আহারে বসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "জীবন যে আমাদের উপর এমন নির্দ্দয় হবে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল!"

"সে আর বিচিত্র কি? মানুষ আর কত দিন সইতে পারে? তার সইবার ও ত একটা সীমা আছে!"

"তা আছে জানি; কিন্তু এটা তুমি ঠিক্ জেনো বৌ; ভাই ভাইকে ছেড়ে বেশীদিন থাক্‌তে পারেনা—কিছুতেই না!"

---

(২৩)

দিন কয়েক পরে, মহেন্দ্র আসিয়া জগত্তারিণীকে বলিলেন "জীবনদা পত্র দিয়েছে বৌ-ঠান, যে তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্বা এবং এ অবস্থায় দেশ থেকে কারো বাসায় যাওয়া প্রয়োজন!"

পুলকিত হইয়া জগত্তারিণী বলিলেন "মদন-মোহন মুখ তুলে তবে চেয়েছেন! তা' বেশ, এ সময়ে আর কে যাবে; আমিই যাবো! তুমি নিয়ে যেতে পার্‌বেনা? ঠাকুরপোকে লিখে দাওনা যে তুমিই, আমাকে নিয়ে যাচ্ছ!"

মহেন্দ্রনাথ ইতঃস্ততঃ বলিলেন "নিয়ে ত যেতে পারি বৌ-ঠান, কিন্তু জীবনদা লিখেছে "কল্যাণীর মাস্‌তুতো বোন্‌ আরতিকে নিয়ে তুমি যথা সম্ভব শীঘ্র চলে এসো! বৌদির আসাতে তার কিছুতেই মত নাই!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "বেশ্‌ তাই হোক্‌!" কিন্তু পরমূহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন "না মহেন্দ্র আমিই যাবো; কেন যে কল্যাণী আমায় যাওয়া বারণ করেছে এখন তা আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছি!"

"ছোট বেলা অবধি একটি কথা কেউ তাকে বল্‌তে পারেনি; কিন্তু সে দিন আমারই কেমন দুর্ম্মতি হলো; রেগে

তাকে একটু বকেছিলুম সে অবধি অভিমান করে ছোট বোন্‌টি আমার! আমার সাথে কথাটি পর্য্যন্ত কয়নি; গৌহাটী যাবার দিনে আমার দিকে ফিরেও চায়নি! —আমিই আমার পায়ের ধূলো তার মাথায় তুলে দিয়ে আশীর্ব্বাদ—করেছিলুম মাত্র!

ধীরে ধীরে মহেন্দ্র বলিলেন "গুরুজনের তিরস্কারকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে গ্রহণ করাই মনুষ্যত্বের কাজ বৌ-ঠান্!"

"কিন্তু মনটা যখন অভিমানে ডুবে থাকে তখন কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য জ্ঞান কয়জনের থাকে মহেন্দ্র ?

জগত্তারিণী চলিয়া গেলে পরনির্ভরশীল তাঁহার কেমন করিয়া চলিবে, এই চিন্তা করিয়া প্রথম প্রথম জগৎকিশোর এ প্রস্তাবে কতকটা অসম্মত হইলেন; কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় ও জগত্তারিণীর সনির্ব্বন্ধতায় পরে তাহাকে সম্মতি দিতে হইল! মহেন্দ্র জগত্তারিণীকে লইয়া গৌহাটী রওয়ানা হইলেন; বাড়ীতে সুশীলাকে রাখিয়া গেলেন।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে যখন সকালে গিয়া গৌহাটীর বাড়ীতে পৌঁছিলেন, তখন সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল! কুমার যোগা ত মাকে দেখিয়া, একেবারে আনন্দে আটুখানা!

জগত্তারিণী ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন "কৈ গো, আমার বোন কল্যাণ কোথায়? কিরে কুমার? কিরে যোগা? তোরা ভাল আছিস্ ত?"

জগত্তারিণীর এই আগমনের জন্য কল্যাণী মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, তাই এত বেলাতেও তিনি বিছানায়ই ছিলেন!

কল্যাণীর কাছে বসিয়া তাঁহার হাতখানা টানিয়া ধরিয়া, বলিলেন "এত বেলাতে ও বিছানায় শুয়ে আছিস্, কোনও অসুখ করেছে কি?"

যোগা কাছেই ছিল; চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিল "অসুখত ওঁর বারোমাস লেগেই আছে মা!"

কুমার চোখ লাল করিয়া যোগার দিকে চাহিল; জগত্তারিণী যোগার কথায় কর্ণপাত না করিয়াই বলিলেন "তোদের না জানিয়েই চলে এলুম কল্যাণ! রাগ হয়েছে কি?"

কল্যাণী কোনও জবাবই দিলেন না; জগত্তারিণী বলিলেন "ঠাকুরপো বাড়ী নেই বুঝি?"

কুমার বলিল "না মা; তিনি ছেলে পড়াতে গিয়েছেন!"

এই কথা বলিয়াই কুমার যোগাকে ইসারা করিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিল! মা দুইদিনের অভুক্ত; তাড়াতাড়ি চারিটা রান্না করিয়া ফেলিতে হইবে!

উনুনে আগুন ধরাইতে ধরাইতে কুমার বলিল "তোর কেমন একটা কুস্বভাব যোগা, যাকেতাকে, যাতা বল্‌তে একটুও ভাবিস্‌না।"

রাগে আগুন হইয়া যোগা বলিল; "চোরের মতন গাঁট-

কাটার স্বভাবত আর আমার নেই; যাবল্‌তে হয় সাম্‌না-সাম্‌নি।”

চোরাকে ধর্ম্মের কাহিনী শুনানো বৃথা ভাবিয়া, কুমার কাল রাত্রের সক্‌ড়ি বাসন দু'খানা মাজিতে চলিয়া গেল।

জগত্তারিণী বাহির হইয়া কুমারকে ডাকিলেন!

বাসন মাজিতে মাজিতে উত্তর করিল “এই যে আমি এখানে মা!”

“কি কর্চ্ছিস্?”

“রাত্তিরের দু'খানা বাসন রয়েছিল; কাকা অনেক রাত্রে এসেছিলেন কিনা!”

কুমারকে সরাইয়া জগত্তারিণী বলিলেন “ওঠ্ তুই; এ বাসন দুখানা আমি ধুয়ে নিচ্ছি।

কুমার সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া পাক ঘরে, এক উনুনে ডাল—আর এক উনুনে ভাত চড়াইয়া দিল! জগত্তারিণী বাসন ধুইয়া চট্ করিয়া দুঘটি জল মাথায় ঢালিয়া পাক ঘরে উপস্থিত হইলেন!

কুমারকে সরিয়া যাইতে বলিয়া পাকের সরঞ্জাম কোথায় কি আছে, খবর করিতে লাগিলেন।

কুমার বলিল “এ বেলা আমিই নাহয় রান্না করে নিই মা, তুমি দুই তিন দিনের অভুক্ত হয়ে আছ!”

"তাত বুঝলুম্; কিন্তু আমার সাম্‌নে তুই রাঁধ্‌বি, সে কি আমার ভাল লাগে রে?"

আলু কুটিতে কুটিতে যোগা ফস্‌ করিয়া বলিয়া ফেলিল "আজ সাম্‌নে এসেছ বলে একথা বল্‌ছো মা, কিন্তু এতদিন ত কৈ একখানা চিঠি দিয়েও খবর নাওনি!"

সম্ভ্রমের সহিত কুমার বলিল "এ পশুটার অপরাধ নিয়োনা মা; কা'কে কি বল্‌তে হয় ও এখনও শিখ্‌তে পার্‌লেনা!"

ইহার কোনও উত্তর জগত্তারিণী দিলেন না, কড়াতে তরকারী ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু দুইটিও জলে ভরিয়া উঠিল; পরোক্ষেও সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণে কতটুকু বেদনা জাগে; তা শুধু মাই জানেন, নির্ব্বোধ শিশু—ইহার কি বুঝিবে!"

জীবনকৃষ্ণ বাড়ীতে আসিয়াই পৌঁছিবার আগেই জগত্তারিণী যে আসিয়াছেন এ সংবাদ পাইলেন কুমারের কাছে!

বাসায় প্রবেশ করিতেই জগত্তারিণী বলিলেন "কেমন আছ, ঠাকুরপো!"

জীবনকৃষ্ণ আগের মতন প্রাণ খুলিয়া যেন বৌদি'র সঙ্গে কথা কহিতে পারিতে ছিলেন না; কোন রকমে "ভালই আছি"—বলিয়া একটা প্রণাম করিয়া মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিবার অজুহাতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কুশল প্রশ্নাদির পরে মহেন্দ্রই প্রথমে বলিলেন "বৌ-ঠান্‌কে নিয়ে আসাতে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গিয়েছ জীবনদা, নয়? কিন্তু ভেবে দেখলুম, অপরকে নিয়ে আসার চেয়ে বৌ-ঠানেরই আসা সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন!"

"ভাল করোনি মহেন্দ্র! এ সময়ে কল্যাণীর মনে আঘাত দেওয়া কি উচিত হয়েছে?"

স্তম্ভিত মহেন্দ্র বলিলেন "মনু বলেছেন ন-স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্‌ অর্হতি! আমিও বলি, সকল স্ত্রীর না হোক, অন্ততঃ অনেক স্ত্রীলোকের অবাধ স্বাতন্ত্র্য সমাজের পক্ষে কিছুতেই মঙ্গলজনক নহে।"

বিরক্তির স্বরে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "কল্যাণীকে তুমি বৃথাই দোষারোপ কর্চ্ছ—মহেন্দ্র!"

"বৌদিকে মোটেই দোষারোপ কর্চ্ছিনা জীবনদা! তোমার মনের পরিবর্ত্তন দেখে দুঃখিত হয়েছি মাত্র! আজ কল্যাণী—কল্যাণী বল্লে, যাকে অন্তরতম বলে ভাব্‌ছ, তাঁকে যমের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে মানুষ করার কঠোর শ্রম কে করেছিলেন জানো? এটা যদি মনে রাখ্‌তে, শৈশবে মা-বাপ মরা হাড়গিলাকে, কে মায়ের স্নেহে—বোনের আদরে আর দাসীর যত্নে, রসে-রক্তে-মেদে-মাংসে ভরে তুলেছিলেন, তাহলে, এই দেবীর মহীয়সী প্রকৃতির উপরে অযথা সন্দেহ করে এতটা

অকৃতজ্ঞতার ভাষা মুখে উচ্চারণ করতে পারতেনা।"

অসহিষ্ণু হইয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "তোমার উপদেশ আপাততঃ শুন্‌বার আমার মোটেই সময় নেই।"

"তোমায় উপদেশ দেওয়া আমার ধৃষ্টতা জীবনদা; কেননা উপদেশ সারাজীবন তোমার কাছ্‌ থেকেই পেয়ে এসেছি! তবে তোমায় এটা বল্‌তে পারি, তোমার মনটা স্বাভাবিক অবস্থায় বর্ত্তমানে নেই বলেই আজ যে কথা আমি বল্‌ছি, তা' তোমার ভাল লাগ্‌ছেনা; ঠিক এইরূপ অবস্থায় হয়তঃ তুমি এসে আমায় উপদেশ দিলে আমিও মুখ বিকৃত করে ফিরিয়ে নিতুম!"

জীবনকৃষ্ণ আর কোনও জবাব না দিয়াই, ইস্কুলের বেলা হইয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন!

(২৪)

কল্যাণীর প্রসবকাল আসন্ন হইলে, কয়েক দিন ধরিয়া অসহ্য ব্যথা ভুগিবার পর ও যখন প্রসবের কোনও লক্ষণ দেখা গেলনা, তখন ডাক্তারদের পরামর্শ হইল, অস্ত্র প্রয়োগ করা ; কেননা, ইহাতে, আর কিছু হোক্ কি না হোক্, অন্ততঃ কল্যাণী জীবন রক্ষা পাইবে !

কিন্তু ইহাতে জগত্তারিণীর হইল ভীষণ অমত ! বোধ করি তিনি গ্রামদেশের লোক বলিয়া, সহরের নাটক-নভেল পড়া মেয়েদের এ বনিয়াদে মোটেই অভ্যস্ত ছিলেন না !

জীবনকৃষ্ণেরও অস্ত্র প্রয়োগে সম্পূর্ণ মত থাকিলেও, জগত্তারিণীর নিকট হইতে কর্ত্রীত্বভার ছিনাইয়া আনা, এখনও তাঁহার সাহসের মধ্যে ছিল না ; তাই তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বাহিরে নানা ছন্দে নানা বর্ণে জীবনকৃষ্ণের যে অভিমত প্রকাশ পাইল, তাহা জগত্তারিণীর পক্ষে নিতান্ত প্রিয় বা প্রীতিকর নহে !

যাহা হউক, আরো দিন দুই পরে এক মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল !—কল্যাণী রক্ষা পাইলেন ! সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ

বলিলেন "আর্টিফিসিয়াল মিল্ক এপ্লাই করলে ডেলিভারিতে এত কষ্টও হতো না, ছেলেটিও হয়ত বেঁচে যেতো।"

মৃত্যুকালিমা মণ্ডিত শিশুপুত্রকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার জন্য, জীবনকৃষ্ণ কুমার সহ কৃষ্ণানিশিথিনীর অন্ধকারে, শ্মশানে চলিলেন। আর চারিদিকের উত্থিত নানাজনের নানাকথায় জগত্তারিণী যেন মর্ম্মে মরিয়া গেলেন। কি দুর্ম্মতিই তাঁহার হইয়াছিল যে অন্য সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি সুদৃঢ় অসম্মতি নিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন! দেশে বিদেশে এ কলঙ্কের অবধি রহিল না! আজ তাঁহার মনে হইল, দেবকল্প স্বামী তাঁহার, তাঁহাকে অনাহূত অবস্থায় আসিতে মানা করিয়াছিলেন!

শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনকৃষ্ণ কিছু না খাইয়াই শুইয়া রহিলেন! পরদিন ভোরে উঠিয়া যখন জীবনকৃষ্ণ বাহির হইতেছিলেন, তখন জগত্তারিণী বলিলেন "দেরী করোনা ঠাকুরপো! আমি রান্না চড়িয়ে দিচ্ছি; কাল রাতও কিছু খাওনি'!

জীবনকৃষ্ণের মুখ দিয়া এই প্রথম জগত্তারিণীর প্রতি—অশোভন কথা বাহির হইল "আমার উপর দিয়ে তোমার শত্রুতাটা পুরোদমেই চল্‌ছে বৌ-ঠান্; কিন্তু দোহাই তোমার, আর এগিয়ো না,—এই আধ্‌খানা মানুষটাকে এখন বিষটিষ কিছু দিয়ে, আমার বুকখানা যেন সাহারা-মরু ক'রে দিও না।"

অনেক কথাই অনেক সময়ে জগত্তারিণী আপনার অতি-মানুষিক সহনশীলতার অন্তরালে চাপিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাই পুত্র-প্রতিম দেবরের অদ্যকার এই রূঢ় বাক্যের কোন উত্তরই তিনি দিলেন না। জীবনকৃষ্ণও আর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দিনকয়েক অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে! সকলেই গম্ভীরভাবে যার যার কাজ করিয়া যাইতেছেন! একদিন সকালে পড়ানো হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনকৃষ্ণ স্ত্রীর কাছে শুনিলেন, যোগা, গোয়ালবাড়ীতে দুধ আন্‌তে আজ যায় নাই!

রুদ্ররোষে তিনি যোগার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যোগা একান্তমনে পাঠ মুখস্থ করিতেছে!

বজ্রস্বরে যোগাকে চমকিত করিয়া তিনি বলিলেন "দুধ আন্‌তে গিয়েছিলি যোগা?"

"এই যাই কাকাবাবু!"

"এত দেরী কেন?"

"গয়লানী সকাল সকাল দুধ দু'য় না বলে, আস্‌তে আস্‌তে দেরী হয়ে যায়; তাই গ্রামারের পড়াটা একটু শিখে নিচ্ছিলুম।"

রাগে অধীর হইয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "গোষ্ঠীশুদ্ধ লোককে পিণ্ডী চট্‌কানোর বেলা পাওয়া যায়; ওদিকে কাজের বেলা

মাটে খবর নেই! এত মনোযোগ আর কোনও দিন দেখ্‌তে পাওয়া যায় না বাবাজি!"

"পড়া না শিখে ইস্কুলে গেলে আপনিও ত' বেত মার্‌তে কসুর করেন না কাকাবাবু!"

জীবনকৃষ্ণের ক্রোধের মাত্রা আপনার হিতাহিত বিবেককে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল; তাই সাম্‌নে পড়িয়া থাকা দেশলাই হইতে একটা কাঠি খট্‌ করিয়া জ্বালাইয়া যোগার বইয়ে ধরাইয়া দিলেন, আর কেরোসিনের ডিবা হইতে সেই জ্বলন্ত আগুনে বল্‌ ঘল্‌ করিয়া কেরোসিন ঢালিয়া দিলেন!

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি লাফাইয়া উঠিয়া টেবিলের উপরের ছোটবড় বইগুলি লক্‌ লক্‌ গ্রাসে গিলিয়া, মুহূর্ত্তে ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল!

চীৎকার করিয়া যোগা, দুই হাতে আগুন চাপিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল! জীবনকৃষ্ণও ভীত হইয়াছিলেন; তাই আপাততঃ যোগাকে উত্তম মধ্যমের চিন্তা পরিহার করিয়া, তিনিও আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইল! অগ্নিদেব তাঁহার ব্যাদান মুখে, মুহূর্ত্তে খড়ের চালখানাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন! বাতাস বেশী ছিল না; তাই অনর্থ অধিকদূর গড়াইল না! বৈশ্বানর আশে পাশে আর

কিছুই না পাইয়া, এই ছোট্ট খড়ের কুটীরখানা দ্বারাই আপনার খাণ্ডবদহনের বিরাট বুভুক্ষার তর্পণ করিলেন।

আগুন নিবিয়া গেলে, যখন বাহিরের লোক সব জল্পকল্পনা করিতেছিলেন—কেমন করিয়া এই সময়ে ঘরে আগুন লাগিল, তখন কথাটা সকলের গোচর করিবার পরম উৎসাহে যোগা দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে, দেখিল আড়াল হইতে জগত্তারিণী তাহাকে ইসারা করিতেছেন। সবাইকে "ডোণ্ট-কেয়ার" করিলেও, অন্ততঃ মা'র অবাধ্য আজও যোগা হয় নাই ; তাই প্রবল উৎসাহটাকে সবলে চাপিয়া, ফিরিয়া মায়ের কাছে আসিল !

মুখভার করিয়া বলিল "কেন ডাক্‌লে—মা ?"

সন্তানের দিকে স্নেহাকুল সজলদৃষ্টি স্থাপন করিয়া জড়িত স্বরে জগত্তারিণী বলিলেন "যোগা, বাপ আমার !"

সহসা মায়ের এ স্নেহকোমল সম্ভাষণে যোগার মনকে যুগপৎ বিস্মিত ও আর্দ্র করিয়া তুলিল, মুখ ফিরাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন-মা ?"

"একটা কথা আমার রাখ্‌বি, যোগা ?"

"যাও, তোমার সবতাতেই ভূমিকা ! কি বল্‌বে বলেই ফেলনা !"

"আজকের ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথাই যেন তোর মুখ দিয়ে না বেরোয়!"

দারুণ দুঃখে মায়ের দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া যোগা বলিল "কেন মা?"

"যে কারণেই হোক; কিন্তু এটাত তোর ছোট বেলা থেকেই অভ্যেস যোগা, যে, মানুষ বিপদে পড়্‌লে, তাকে প্রাণপণে রক্ষা করিস্! পরের অপমান—পরের বিপদ নিজের ঘাড়ে করে নিয়ে পরকে অব্যাহতি দিয়ে পরোপকারের আত্মপ্রসাদ ভোগ করা কি মহতের লক্ষণ নয়?"

"বেশী বকোনা মা: কি কর্‌তে হবে বলেই ফেলো চট্ করে!"

"তুই কাউকে বল্‌বিনে যে এ কাণ্ডটা তোর কাকাই করেছেন! বরং দরকার হলে, নিজের ঘাড়েই দোষটা চাপাতে ইতস্ততঃ করিস্‌নে।"

"বেশ, তাই হবে! খুসী হলেত এবারে?"

স্নেহের স্বরে জগত্তারিণী বলিলেন "আমি সেটা ভাল রকমেই জানি যোগা, যে তুই যেটাতে অভয় দিস্, সেটাতে সবাইকে নিশ্চিন্ত করেই রাখিস্!"

যোগা চলিয়া গেল। জগত্তারিণী ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া,

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "ভগবান্, তোমার মঙ্গলেচ্ছ পূর্ণ হোক্!"

যোগা মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল লোকে জিজ্ঞাসা করিলে অম্লান বদনে বলিয়া গেল—"সে দিন আমাদের ক্লাশের লতিফ্, কেমন করে একহাতে দেশলাইয়ের কাটিতে আগুন ধরিয়ে ছিল, তাই পরীক্ষা করতে গিয়েছিলুম; হঠাৎ একটা কাটির বারুদ জ্বলে খড়ের অবধি চলে গিয়েছিল বলেই এ অনর্থপাত!"

এমন হাসিমুখে, পরিপূর্ণ উৎসাহে আর জাঁকালো ভাষায় সে এই দুর্ঘটনার কথা বলিয়া গেল যে, এতবড় একটা দুষ্ক্রিয়া করিয়াও মোটেই অনুতাপ হইতেছেনা বলিয়া অনেকেই তাহাকে একটা আস্তগোয়ার ঠাওরাইল!

যদিও জীবনকৃষ্ণ এত বড় একটা অপরাধের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন, তথাপি স্বাভাবিক সঙ্কোচ তাঁহাকে দিন কয়েক অপরাধীরই মতন করিয়া রাখিয়াছিল! আরও, তিনি যোগার এই প্রকার ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন; এই ছেলেটার মনে এ মহৎ প্রবৃত্তি কে জাগাইয়া দিল? জগত্তারিণীর ভাব-ভঙ্গীতে তিনি ইহার সূচনা মাত্র পাইলেন না!

(২৫)

সেদিন বাদ্‌লার সন্ধ্যা!

জীবনকৃষ্ণ পড়াইতে গিয়া জানিলেন, ছাত্রটির সহসা কি একটা কঠিন পীড়ার সূত্রপাত হওয়ায়, সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে; আপাততঃ জীবনকৃষ্ণকে মাস দুয়েকের জন্য পড়াইতে আসিতে হইবে না!

কল্যাণী স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন "দিদি আসার পর আমাদের যত বিড়ম্বনা! পেটের সন্তান গেল, ঘর জ্বলিয়া যাওয়ায় সর্ব্বস্বান্ত হতেই হলো, যজমানে যা-কিছু আয় ছিল তা' কমে গেল, ছেলে পড়ানোটা পর্য্যন্ত গেল—এর উপরে আর কি হতে পারে বল? তবুও তোমার ঘুম ভাঙ্গ্‌ছে না যে কেন, তা' বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনে! আমার কথা যদি শোন, তবে ভালোয় ভালোয় আপদ বিদায় করে দাও—আলোয় আলয় চলে যান্।"

কল্যাণীর প্রভাব ইদানীং জীবনকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণভাবে ক্রিয়া করিতেছে! তাই, তখন মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন!

দিন কয়েক পরে, সকালে টিউসন্ হইতে ফিরিয়া আসিতেই শুনিলেন কল্যাণী বলিতেছেন, "না খাইয়ে—না দাইয়ে, এমন করে তিল তিল করে মারার চাইতে, একসঙ্গে গলাটিপে মেরে ফেললেইত হয়!"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "কি, তোমার এখনও খাওয়া হয়নি? বেলা যে অনেক হয়ে গেছে?"

"দাসী বাঁদীদের আবার সময় অসময় কি?"

বারান্দায় জায়গা এঁটো দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে তবে কে খেলে?"

"নন্দের ছুলাল"!

রাগ সাম্লাইতে না পারিয়া জীবনকৃষ্ণ বাহির হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "তোমার আক্কেলখানা কেমনতর বৌ-ঠান; একটি রোগীর পথ্য এত বেলাতেও দিতে পার্লে না; ওদিকে পেটের ছেলেটিকেত খাইয়ে দাইয়ে বিদেয় করেছ!"

"কেন অনাহত দোষারোপ কর্চ্ছ, ঠাকুরপো? কুমারের পরীক্ষা ছিল বলে কল্যাণী আর কুমারকে একই সঙ্গে ঠাঁই করে দিয়েছিলুম; কিন্তু অনেক সাধা-সাধনা ... কল্যাণী কিছুতেই খেলেনা—হয়-নয় কল্যাণীকে জিজ্ঞেস্ করোনা!"

"মাইরি বৌ-ঠান, লোকের সাম্নে বেশ ভালমানুষটি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ানক প্যাঁচালো বুদ্ধি তোমার!"

এতদিন পরে, ধৈর্য্যশীলা জগত্তারিণীর ধৈর্য্য চ্যুত হইল! দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন "নিজ্‌কে সাম্‌লিয়ে কথা কয়ো ঠাকুর পো!"

তারপরেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এত দিনে বুঝ্‌তে পার্‌লুম, কত দ্রুত, কতখানি অধঃপতন তোমার হয়েছে! কত উপরে তুমি ছিলে, আজ কত নিম্নে নেমে এসেছ!"

জগত্তারিণীর এই গর্ব্বিত-দৃপ্ত-দৃষ্টির সম্মুখে জীবনকৃষ্ণের চক্ষু অবনমিত হইয়া আসিল! পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে তিনি বলিলেন "সে যাই হোক্, তুমি দেশেই চলে যাও; আমার যেমন করেই হোক্ চল্‌বে! তোমার আর অভিশাপ দিতে হবেনা! কড়ি দিয়ে কোঁদল সৃষ্টি করার সময় কিংবা অবসর আমার নেই!"

দুঃখিতা জগত্তারিণী বলিলেন "আজ যাকে অভিশম্পাত বলে মনে কর্‌ছো ঠাকুরপো, এমন দিন হয়তঃ আস্‌বে, যখন সেটাকেই আশীর্ব্বাদ বলে গ্রহণ কর্‌বে!"

ইহার উত্তরে আরও কি একটা কথা জীবনকৃষ্ণ বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ পদশব্দে ফিরিয়া দেখিলেন বিমর্ষ মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া! বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন "কি হে মহেন্দ্র, হঠাৎ যে আগমন? দাদা, বৌ-ঠান্‌কে নিতে পাঠিয়েছেন বুঝি?"

"তা নয় জীবনদা! তোমরা একেবারে চিঠিপত্র বন্ধ করে দিয়েছ! তা'ছাড়া একটা উড়ো-কথাও দেশে শুন্‌তে এলুম, তাই তোমাদের শুধু দেখ্‌তে এসেছি!"

জীবনকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন "এসেছ যদি, ভালই হয়েছে মহেন্দ্র! তোমার বৌ-ঠান্‌কে নিয়ে যাও; জঞ্জাল বইবার মতন অবস্থা বা মনের গতি আমার নেই!

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মহেন্দ্র বলিলেন "আজ এই স্নেহময়ী বৌ-ঠান্ তোমার কাছে জঞ্জাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন—জীবনদা?"

"সকল দিন কি সমান ভাবে যায় মহেন্দ্র! পরিবর্ত্তন সকলেরই হয়ে থাকে।—আমার যেমন পরিবর্ত্তন হয়েছে বল্‌ছো; তেমনি বৌ-ঠানের ও কি হতে পারেনা?

বিশেষ আর কোনো কথা হইল না। জীবনকৃষ্ণ ইস্কুলে চলিয়া গেলে স্নানাহ্নিক সারিয়া মহেন্দ্র খাইতে বসিলেন!

খাইতে খাইতে মহেন্দ্র বলিলেন "জীবনদার, এ অধঃপতন কেমন করে হলো, ভেবে পাইনে!"

"সে আমাদেরই দুরদৃষ্ট, মহেন্দ্র!"

"যাক্, কিন্তু তোমায় যে নিয়ে যেতে বল্‌ছেন।"

"কল্যাণীকে এ অবস্থায় রেখে যাওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়; কিন্তু তবু ভাবি, সমুদ্র মন্থন কর্‌তে কর্‌তে যেমন অবশেষে হলাহল উঠেছিল, তেমনি আমাদের একত্রবাসের

সংঘর্ষে আরও না জানি কত পারিবারিক বিষের সৃষ্টি হয়! তাই মনে হয় ব্যবধান থাকাই ভাল!

রাত্রে কল্যাণী স্বামীকে একা পাইয়া বলিলেন "কুমার যোগাকেও ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দাওনা কেন?"

যদিও জীবনকৃষ্ণ মুখে বলিলেন "বেশ!" তবু মনে মনে এ প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করিতে পারিলেন না, কেননা, তাঁহার ভয় হইতেছিল—ইহারা চলিয়া গেলে, হাট বাজার করা হইতে আরম্ভ করিয়া, ঘর সংসার দেখা, রান্নাবান্না সবই তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে!

জীবনকৃষ্ণ, জগত্তারিণীর যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করায়, দুই চারি দিনের মধ্যেই যাত্রার দিন স্থির হইয়া গেল!

যোগা তাহার অগ্নিদগ্ধ হস্ত দু'খানা দিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আমায়ও সঙ্গে নিয়ে চল মা; আমি আর এখানে থাক্‌বোনা।"

অশ্রুপূর্ণ চোখে জগত্তারিণী বলিলেন "তোমরা গেলে, তোমাদের কাকা-কাকীমার চল্‌বে কেন বাবা? তোমার কাকী এখনও দুর্ব্বল; তোমার কাকার শতেক কাজ!"

"তবে তুমি চলে যাচ্ছ কেন, তুমিও আরো কিছুদিন থাক না!"

আবেগের আতিশয্যকে সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, যোগাকে চুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন "তোমার বাবার যে বয়েস হয়েছে; আমি না যাওয়াতে তাঁর যে খুবই কষ্ট হচ্ছে যোগা!"

"যাও; তুমি সবাইকে খুবই ফাঁকি দিতে পারো; চাইনে তোমায়!" বলিয়া যোগা রাগ করিয়া চলিয়া গেল, কল্যাণীকে অযাচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া, সবলে বুক চাপিয়া ধীরে ধীরে তিনি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন!

গাড়ী ছাড়িয়া দিবার সময় জীবনকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া, জগত্তারিণী বলিলেন "তোমাদের মনে যে মালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে ঠাকুরপো; আমার অপরাধ মার্জ্জনা করে—ব্যবধানের অতলজলে যেন সে বৈরিতাটাকে বিসর্জ্জন দিও! কুমার যোগা রইল! আগেরই মতন স্নেহের চক্ষে এদেরে দেখো! আর তোমার অশীতিপর বৃদ্ধ ভাইকে উপেক্ষা করে কষ্ট দিওনা! নিতান্ত অসম্পর্কিতকেও অনুকম্পা করলে, ভগবান কল্যাণ করেন; একটা আত্মপ্রসাদও লাভ হয়!"

জীবনকৃষ্ণ কুটিল হাসিয়া বলিলেন "মায়া কান্নায় বেশীদিন চিড়ে ভিজেনা মহেন্দ্র!"

"তুমি যে মায়া লাগিয়ে দিয়েছ, তা নিয়ে বৌ-ঠান্‌কে সারাজীবনই কাঁদ্‌তে হবে সে ঠিক! সে অজস্র চক্ষের

জলেও কি তবে চিঁড়ে ভিঁজ্‌বেনা মনে কর? কিন্তু সে যাহোক; তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি জীবনদা, দেবকল্পবৃদ্ধ ভাই আর মাতৃসমা ভ্রাতৃবধুকে উপোস করে মর্‌তে দিয়োনা— দোহাই তোমার!"

"তোমার কথাবার্ত্তা আজ্‌ কাল বড্ড বেড়ে গিয়েছে মহেন্দ্র!"

উচ্চ হাসিয়া মহেন্দ্র বলিলেন "উচিত কথা বল্‌বার সাহস, অনেক আগেতো তোমারি কাছে পেয়েছি জীবনদা!"

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, জীবনকৃষ্ণ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ আপদগুলিকেও পাঠিয়ে দিলে না কেন?"

মনের কথা চাপিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "ভাড়ার টাকার অভাব ছিল বলে।"

হাসিয়া জীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করিলেন "আচ্ছা কেশব তোর চাকুরিটি কেন গেল বল্ দেখি ?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেশবের যে অত্যধিক আগ্রহ সব-সময়েই প্রকাশ পাইত, তাহা সকলেরই জানা ছিল! তাই কেশবের সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই গ্রামের লোক মজা দেখিবার জন্য তাহাকে এই প্রশ্ন প্রথমেই করিত।

কেশব বিনয়-প্রকাশ করিয়া উত্তর করিল "সে কথা আর তুলে' লাভ কি বাবু।"

"কেন-রে ?"

"যে কোন কারণেই হোক্, সে কথা আর বল্‌তে চাইনে। কেউ হয়ত বল্‌বে, দোষী আমিই ; গায়ের জোর রাখবার জায়গা পাইনে ; কিন্তু ভগবান্ জানেন আমি নির্দ্দোষ,—আর এতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিতও নই! ভগবানই হয়ত আমায় চাকরি থেকে রেহাই দিয়েছেন ; চাকুরি কি বাবু মানুষে করে ?"

হাসিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "যারা চাকুরি করে, তারা কি তবে সবাই অমানুষ—কেশব ?"

অপ্রতিভ-ভাবে কেশব উত্তর করিল "সে আমি কি জানি ; যারা চাকুরি করে, তারাই, সেটা ভাল বোঝে!—তা' ছাড়া, ওটা একটা কথার কথা বল্‌লুম বৈ-ত নয়, ছোটবাবু!"

"তাই বুঝি চাকুরি ছেড়ে 'গাজনে' মন দিয়েছিস্?

কেশব মৌন হইয়া রহিল; জীবনকৃষ্ণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "সে ভালই, কেননা, সারাদিন খেটেখুটে একটু আমোদ করার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিকই; কিন্তু কেশব, শুনলুম এ সব গাজন-টাজনে শিবঠাকুরের নামে সিদ্ধি-টিদ্ধিরও সদ্ব্যবহার তোমরা করে থাকো?"

কেশব মাথা নীচু করিয়া মৃদু-স্বরে উত্তর করিল 'সারা-দিনের খাটুনিতে—এলিয়ে পড়া দেহটাকে একটু চাঙ্গা করে নিতে—"

বাধা দিয়া, দৃঢ়তার সহিত জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "না কেশব, গাঁজা-ভাঙ্ এ গুলো খাওয়া পাপ! শরীরটাকে সতেজ রাখবার ওজুহাতে বিষ খাওয়া অভ্যাস করা কি ঠিক্?"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন "আমাদের এ গরিব দেশে সকলের একবেলা রীতি-মত অন্ন জুটে না; অনশনে-অর্দ্ধাশনে, আর ছেড়া-কাপড় পরে কোনও মতে লজ্জাসরম ঢেকে রাখ্তে হয়! এর উপরে উচ্ছন্ন যাবার জন্যে নেশা করাটা কি খুব দুঃখের বিষয় নয়?"

অনুচ্চস্বরে কেশব উত্তর করিল "বিলেত হতে যে সকল বোতলের আম্দানী হয়ে থাকে, তার সবই ত এ গরীব দেশে উজাড় হয়ে থাকে—ছোটবাবু! তার অনুপাতে আমাদের

একটু-আধটু নেশা আর তেমন কি বেশী? তবে হাঁ, সেগুলো সব বড়লোকদের ভোগের জন্য! ছোটলোক তার সোয়াদ পাবে কেমন করে?"

"আদার বেপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি কেশব? তোরা গরীব; গরীবের কথাই তোদের ভাবা উচিত? যে পয়সাটুকু নেশাতে তোদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাতে দুবেলা, চারিটি ভাত পেটভরে তোরা নিশ্চয়ই খেতে পেতিস্!"

লজ্জা পাইয়া কেশব উত্তর খুঁজিয়া পাইল না—মাথা নীচু করিয়া নীরবে রহিল।

জীবনকৃষ্ণ আর বেশী কথা না বলিয়া, গোটা দুয়েক গাজনের গান বাঁধিয়া কেশবের হাতে দিলেন;—রাত অধিক হইয়াছে বলিয়া কেশবের দল ছোট কর্ত্তাবাবুকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল।

আহ্নিক সারিয়া ঠাকুর-দালান হইতে হরিমোহিনী জীবনকৃষ্ণকে ডাকিয়া জানাইলেন "ভাত দেওয়া হয়েছে!"

হরিমোহিনী এ বাড়ীর শিষ্যা। বাল্যকালে বিধবা হইয়া স্বামীর তিনকুলে আর কেহ না থাকায়, যথা সর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়া গুরু-গৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন। জীবনকৃষ্ণের অগ্রজ জগৎকিশোরের নিকট হইতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিষ্যা হইলেও এ বাড়ীতে হরিমোহিনীর প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। পূজাপার্ব্বণে, বৈষয়িক পরামর্শে, অতিথি-অভ্যাগতের অভ্যর্থনায় হরিমোহিনীর ব্যবস্থাই সকলের আগে চলিত। বহুদিন ধরিয়া বাস করায়, এ বাড়ী তাঁহার স্বগৃহেরই মত মনে হইত! দিনে ত্রি-সন্ধ্যা, প্রত্যূষে ঠাকুরের জন্য পুষ্পচয়ন, মধ্যাহ্নে গুরুদেবের চরণামৃত পান এবং আহারাদির পর অপরাহ্নে তত্ত্বকথা শ্রবণ তাঁহার অবশ্য করণীয় নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল।

---

(২)

জীবনকৃষ্ণ আহারে বসিলে বিনা-ভূমিকায়ই জগত্তারিণী বলিলেন "আচ্ছা, ঠাকুরপো, তোমায় কতকরে বল্‌ছি যে আরো একটি বিয়ে কর; কিন্তু কিছুতেই তা'তে কান দিচ্ছ না। আমাদের কথাগুলোর দাম কি কিছুমাত্র নেই?"

জীবনকৃষ্ণের পিছনে হরিমোহিনীও সেখানে আসিয়াছিলেন। কর্ত্রী-মা'র কথার সমর্থন করিয়া তিনিও বলিলেন "আমিও মা, ঐ কথাটি ওঁকে কত করে বলেছি—একটা ছেলে পিলের পিত্যেশ কে না করে?"

ঈষৎ রুষ্ট-ভাব প্রকাশ করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "অনেক অনুরোধ-উপরোধই করা হ'ল, কিন্তু কিছুতেই তা' যেন গেরাহ্যির মধ্যে আস্‌ছে না!—আজ 'সাম্‌না-সাম্‌নিই কথাটা পাড়া গেল—দেখা যাক্ কি আদেশ হয়!"

হরিমোহিনী বলিলেন "সত্যি মা, বড়কর্ত্তাপ্রভু একটি কথা বল্‌লেই ওঁর কি আর অসম্মতি হয়; দাদার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি ওঁর।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটু দুঃখিত ভাবে জগত্তারিণী বলিলেন "না-বলুন নাই ; আমরা মূখ্যু-সুখ্যু মানুষ ; ওঁদের মনের কথার আমরা কি বুঝি !"

আহারে বসিয়াছিলেন জগৎকিশোর, তাঁহার এগার বছরের ছেলে কুমার আর জীবনকৃষ্ণ ! এমনি জীবনকৃষ্ণ আলাপে ব্যবহারে জগত্তারিণীকে বিশেষ সম্ভ্রম করিয়া চলিতেন, তদুপরি দাদার সাম্‌নে ত তিনি একেবারে বলির ছা।... জীবনকৃষ্ণ এ প্রৌঢ় বয়সেও অগ্রজের চোখে চোখে চাহিয়া কথা বলিতেন না ; তাই আজ জগৎকিশোরের সাম্‌নে জগত্তারিণীর কোনও কথার উত্তর করাই জীবনকৃষ্ণের অসম্ভব হইল। নাকে-মুখে কোনও রকমে চারিটা ভাত ত্রস্তে গুঁজিয়া উঠিয়া যাওয়ার জন্যই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বুভুক্ষায় পরিতৃপ্তির অঃ তাহার কাছে বিষ বোধ হইতে লাগিল। জগত্তারিণী বুদ্ধিমতী প্রশ্নে-প্রশ্নে জ্বালাতন করিয়া তুলিলেও এক্ষেত্রে যে বিন্দুমাত্র উত্তরের প্রত্যাশা করেন না, ইহা তিনি আগে হইতেই জানিতেন ! সুতরাং আর বিশেষ কিছুই বলিলেন না, শুধু পরিবেশন করিতে করিতে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন কেমন করিয়া তিনটি প্রাণীর অত্যধিক মনোযোগের সহিত নীরবে আহার-কার্য্য সমাধা হইতেছে ; আর, একটা কথাও

দেখী

বলিতে না পারার উদ্বেগ কিরূপে জীবনকৃষ্ণের আহার পং করিয়া কঠোর পীড়া দিতেছে !

এতগুলি কথাবার্ত্তার মধ্যেও কিন্তু জগৎকিশোর টুঁ শব্দটি করিলেন না। সময়ে সময়ে তিনি একটু বেশীরকমেই গম্ভীর হইয়া পড়িতেন, এবং তাঁহার এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য জগত্তারিণীকে অল্প-বিস্তর পীড়িত ও ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিত।

কর্ত্তাদের আহার হইয়া গেলে, জগত্তারিণী স্বামীর পাতে ভাত বাড়িয়া লইয়া, খাইতে বসিলেন ; কিন্তু খাইতে বসিয়া একা তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, ছোট-জা কল্যাণীর আজ পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়ার দরুণ মন খানা কেমন শূন্য বোধ হইতেছিল।

খাইতে রুচি না হওয়ায় জগত্তারিণী অন্যমনে বসিয়া মাখা ভাতগুলি থালার উপর হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে সন্তর্পণে জীবনকৃষ্ণ ঘরে ঢুকিলেন। জগত্তারিণী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"একি ঠাকুরপো ! এখনও ঘুমোও নি যে ?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "বৌদি ! একটা কথা তোমায় বল্‌বো—অপরাধ নেবেনাত ?"

"অপরাধের না হলেও, অপরাধ নেওয়ার মতন ততটা পাগল ত আর আমি এখনও হইনি"।

"অপরাধের না হলেও, খুব স্বাভাবিকও নয় বলেই, কথাটা বল্‌তে একটু বাধা-বাধা ঠেক্‌ছে।"

জগত্তারিণী উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নীরব রহিলেন; জীবনকৃষ্ণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "বৌদি! মাঝখানে একটা বাজে কথা তোমায় বলি;—একজন ইংরেজ কবি একখানা খুব বই লিখেছেন; সে খবর তুমি অবশ্য জান না; তবে এটা হয়ত তোমার বুঝতে বেগ পেতে হবে না যে, তিনি তাতে দেখিয়েছেন—একটা প্রবল আবেগ মানুষের বুকে চেপে রাখ্‌লে তার প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হতে পারে!"

অসহিষ্ণু হইয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তোমার অত শত ভূমিকা সরিয়ে রেখে, আসল কথাটা কি খুলেই বলে ফেলো শুনি!"

জীবনকৃষ্ণ কথাটা একচোটেই বলিয়া ফেলিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে গিয়া কথাটা তাঁহার কাছে এমনি বে-মানানো লাগিতেছিল যে কিছুতেই সহজে ইহা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল না; তাই আরম্ভ করিতে গিয়াই অনেকগুলি বাজে কথা বাহির হইয়া পড়িল। তবু আজ তার বলা চাই-ই! তাই কাসিয়া গলাটাকে একটু সরল করিয়া তিনি বলিলেন "আচ্ছা বৌ-দি, কেউ যদি এসে তোমায়

বলে, দাদা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তোমার আরও একটি বিয়ে হোক্, এ তা'হলে তোমার কেমন লাগে ?"

"এই অপ্রিয় কথাটা বল্‌বার জন্যই বুঝি তোমার অত ভূমিকা করা হচ্ছিল ?"

"আমার স্ত্রী বর্ত্তমান থাক্‌তে তবে, আরও একটি বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি কেন কর শুনি ?"

"ছেলেপিলে না হলে, পুরুষমানুষ অনেকবারই বিয়ে করতে পারে, সেত শাস্তরেরই কথা ; কিন্তু স্বামী থাক্‌তে মেয়েদের অনেক বিয়ে, এ অনাছিষ্টি কথা তোমায় কে শেখালে বল্‌তে ?"

কথাগুলি যদিও তীব্র বিতৃষ্ণার ভাবেই জগত্তারিণী বলিয়াছিলেন, তথাপি সেই দিকে লক্ষ্য না করিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "শোন বৌ-দি ! পদে পদে শাস্ত্রের সমাজের-ধর্ম্মের কথা তোমরা আওড়াও, যেন তোমরা জাননা এমন কিছুই এ জগতে নাই। কিন্তু যদি বুঝতে, কত'টা তোমাদের জানার বাইরেও রয়েছে, তা'হলে আর এসব আজ্‌গুবি কথা বল্‌তে ইচ্ছা হতো না। তোমরা কি মনে কর, শাস্ত্র, যুক্তি তর্কের বাইরে—একটা যাচ্ছেতাই, খামখেয়ালী। কিন্তু, তা' নয়, শাস্ত্র, যথার্থই নানা বহুদর্শিতার, নানা চিন্তা গবেষণার ফল। সুতরাং ইহা যুক্তিতর্কের

বাহিরে নয় ; যা কিছু ব্যতিক্রম, তা আমাদের আচরণের জন্যেই হয়ে থাকে।

অবাক্ বিস্ময়ে জগত্তারিণী বলিলেন, "তবে কি যা' সমাজ করে তা' শাস্ত্রে বলে না ?"

"বলেনা ঠিক নয় ; তবে অনেকটা বলে আর অনেকটা না ? যে টা আমাদের স্বার্থ-সিদ্ধির প্রতিকূল, তার জন্য আমিরা একটা মনগড়া শাস্ত্র তৈয়ারী করতে কিছুমাত্র ইতঃস্তত করিনে !"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন" এই ধর-না তোমাদের নারী-জাতির কথা ; সমাজে তোমরা পুরুষের বিলাস-সামগ্রী, আর শাস্ত্রে তোমরা জগদ্বিকাশের আদিরূপা !—নিজ স্বার্থসিদ্ধির এমন অমোঘ অস্ত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে বলতো ?"

এ সব কথার উত্তরে কি বলিবার আছে স্থির করিতে না পারিয়া জগত্তারিণী অবাক নেত্রে জীবনকৃষ্ণের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, আর জীবনকৃষ্ণ অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিলেন "মেয়েদের উন্নতির পথ থেকে বঞ্চিত করে যে কি ঘোর অহিত-সাধন আমরা নিজেদের করছি ; আজিকার এই নানা সমস্যার দিনে, তা আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দরকার করে না বৌ-দি !"

"সে অহিতটা কি ঠাকুর পো ?"

অহিত অনেক কিছু। তবে একটা কথা বলি শোন ছোট ছোট শিশুরাই বড় হয়ে দেশের ভবিষ্যৎ তৈরী করে আর, তাদের শিক্ষার দায়িত্ব প্রথমে তোমাদেরই হাতে থাকে তাই দেশের উন্নতির জন্য তোমাদের কর্ত্তব্য কত গুরুত্ব ভেবে দেখ দেখি ? আর তোমরাই যদি ঠিক্-ঠিক্ তৈরী না হও, তবে তারাই বা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠবে কেমন করে ?"

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া জীবনকৃষ্ণ আবেগের সুরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন "বল্‌তে মনে দুঃখ হয়, সংসারকে সমাজকে সুদৃঢ় কর্‌তে হলে, চলনশীলতার ঘাত প্রতিঘাত সয়ে যাওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তা আমাদের মোটেই নেই বলেই অভাবটা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে !"

বিরক্তির সুরে জগত্তারিণী বলিলেন "ও সব বক্তিমা ছেড়ে দিয়ে, কথাটা স্পষ্ট করে বল্‌লে কিছু দোষ নেইত ?"

"স্পষ্ট আর কি বল্‌বো ! এই ধর-না, আমার এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাক্‌তেও আর এক বিয়ের জন্য তোমরা পীড়া-পীড়ি কর্‌ছো ! কিন্তু এতে পরে যে কি ভীষণ বিষের সৃষ্টি হতে পারে, সে চিন্তাত কস্মিন্ কালেও তোমাদের মনে জাগে না আমাদের মাঝে সব চেয়ে বড় ধার্ম্মিক সে, যার "ষাট্-বছরে

আছে পঞ্চম পক্ষ ;" আর তিনি অসতী, যিনি সঙ্গত কারণে আবার বিবাহিত হতে ইচ্ছে করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মিলিত আন্দোলন উদ্দাম হয়ে ওঠে !"

"বিধবার বিবাহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা কি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর ?"

"মঙ্গলকর কি নয়, সে কথা আলোচনা করার সময় এ নয়, তবে একথা জোর করে বলা চলে যে, বিধবা-বিবাহ সত্যি সত্যিই যদি সমাজের মঙ্গল-সাধনের অন্তরায় হয়, তবে পুরুষের বহু বিবাহও কোনও দিক দিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করে না।"

"তা যেন হলো, কিন্তু যদি কারো সন্তানাদি না হয় ?"

জগত্তারিণী আন্তরিক বিশ্বাসের সহিতই কথাটা বলিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ কথাটাকে এমনি হাল্কা ভাবে গ্রহণ করিলেন যে, বস্তুতঃ ইহার একটা কিছু বিদ্রোহ সূচক উত্তর দিবার প্রেরণা তাঁহার মনেই আসিল না ; তাই অনাকৃষ্ট ভাবে তিনি বলিলেন "সে'ত ভগবানেরই অভিপ্রায়, তার জন্য একটা নিরীহ প্রাণীকে প্রত্যাখ্যান কিংবা উপেক্ষা করা কি উচিত ?"

তারপর জগত্তারিণীর কথায় তাঁহার সম্বন্ধে একটা গোপন ইঙ্গিত অনুভব করিয়া একটু সলজ্জ হাসিয়া তিনি বলিলেন

"বুঝেছি বৌ-দি! আমার পরকালের নরকযন্ত্রণার আতঙ্কই তোমাদের এমনধারা ব্যাকুল করে' তুলেছে; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে গুলো থাকা সত্বেও কি পুন্নাম-নরক হতে আমার পরিত্রাণ হবে না?"

বিরাট্ ঝঞ্ঝাবর্ত্তের অবসানে মহাসাগর যেমন শান্ত প্রকৃতি ধারণ করে, জীবনকৃষ্ণও উদ্দাম আবেগ নিঃশেষে উদগীরণ করিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাহার আরো বক্তব্য থাকিলেও তিনি কিছুতেই যেন কথা বলিতে পারিতেছিলেন না—ক্লান্তিতে তাঁহার চোখ দুটিও ঢুলিয়া পড়িতেছিল! জগত্তারিণী এ ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন "তোমার যুক্তি-তর্কের ভাঁড়ারটা আজই সমুদয় উজাড় করে দিয়োনা যেন —ভবিষ্যতের প্রয়োজন কতক সঞ্চয় রাখা মন্দ নয়! রাত অনেক হয়েছে এখন শোওগে যাও!"

---

(৩)

জগৎকিশোর ও জীবনকৃষ্ণ সহোদর ভাই। জগৎকিশোরের জন্মের পর তাঁহার আরও চারি ভগ্নীর জন্ম হয়। জীবনকৃষ্ণ সর্ব্ব কনিষ্ঠ, তাই তিনি অগ্রজ হইতে প্রায় সতের বছরের ছোট। তাঁহাদের নিবাস শ্রীহট্ট জিলায়—ভট্টপল্লী গ্রামে। প্রচলিত কথায় লোকে ইহাকে ভট্-পাড়া বলিয়া থাকে।

গ্রামখানি দেখিতে মনোহর, এবং স্বাস্থ্যকরও বটে। গ্রামের মাঝখান দিয়া যে বড় রাস্তা গিয়াছে, তাহারই দুই ধারে সারিবদ্ধ-ভাবে সাজানো বাড়ীগুলি; তাহাতে ইট্-কাঠের ইমারত নাই—অভ্রভেদী প্রাসাদ-রাজি ধনীর গর্ব্ব প্রকাশ করে না; ইহারা সহজ সরল কুটিরাবলী,—দারিদ্র্যের ব্যঞ্জক! গ্রামটি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে অবস্থিত এবং সেইজন্য বর্ষার বারি বর্ষণে যখন সমস্ত আবর্জ্জনা ধুইয়া লইয়া যায়, তখন গ্রামখানাকে একখানা বসন্ত-প্রাতের কুসুমোদ্যানের মত সতেজ ও হাস্যময় দেখায়! প্রকৃতির এই বিমোহনী সহজ শোভা পথিকের চিত্ত আকর্ষণ না করিয়া ছাড়েনা।

গ্রামের মাঝে ধানের ক্ষেত নাই ; তা' সত্ত্বেও 'রৌদ্র-ছায়ার' লুকোচুরি খেলার অভাব এ গ্রামে অনুভূত হয় না ; স্থানে স্থানে বায়ুর হিল্লোলে যখন বাঁশবন নাচিয়া উঠে, তখন ঐ বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে যেন 'রৌদ্র-ছায়া' পুলকে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিয়া দেয়। পুকুর-পারের সারি-সারি কদম্ব-ফুলের গাছ হইতে ফুলের রেণু জলের উপর ঝরিয়া পড়িয়া, এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটাইয়া তুলে! তদ্ভিন্ন, দিবানিশি মাথায় 'জট' ধারণ করিয়া একটি প্রধান বটও সে গ্রামে আছে, আর কোন কালের ভূমিকম্পে ধ্বংস-প্রাপ্ত শিবমন্দিরের একটি লতাগুল্ম জড়িত ইষ্টক-স্তূপ তাহারই পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যায়।

এই গ্রামেই জগৎকিশোরের বাস। অবস্থায় না হউক বিদ্যার গৌরবে জ্ঞাতি চারি ঘরের মধ্যেই জগৎকিশোরের ঘর-খানা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। শৈশবে জগৎকিশোর পিতার টোলেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিষ্য-সেবকে যাজনাদির দ্বারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহে তিনি পিতার সাহায্য করিতেন এবং পিতৃবিয়োগের পরে নিজেই এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া কিছুদিন অধ্যাপনা কার্য্যও করিয়াছিলেন।

কাব্য-সাহিত্যে জগৎকিশোরের জ্ঞান ছিল অগাধ। তিনি নিজেও ছিলেন একজন কবি ; তাঁহার রচনা ছিল প্রাঞ্জল

ভাব ছিল গম্ভীর এবং সুললিত, আর তাঁহার চরিত্র ছিল অনন্য সাধারণ মহৎ! অর্থের অসচ্ছলতা, পরিবারের অন্ন-সংস্থান-চিন্তা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ ব্যস্ত করিলেও ব্যাকুল করিতে পারিত না। প্রত্যূষে উঠিয়া ঠাকুরের পুষ্পচয়ন, সাজ-সজ্জা, পূজা অর্চ্চনাদিতেই দিবসের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত, অবশিষ্ট সময়টুকু তিনি কবিতাদি রচনা করিয়াই কাটাইয়া দিতেন। বাড়ীর কাহারও মারাত্মক অসুখ-বিসুখ পর্য্যন্ত তাঁহাকে টলাইতে পারিত না; শুধু 'মদনমোহনের' দুয়ারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ধৈর্য্যে আপনার আর্ত্ততা নিবেদন করিয়া দিতেন! ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া তিনি যে নানা প্রকার ফুল তুলিয়া আনিতেন, শিষ্যা হারমোহিনী ভক্তির সহিত সেইগুলি দিয়া সুন্দর মালা গাঁথিতেন, আর সেই মালা জগৎকিশোর মদনমোহনের গলায় পরাইয়া দিয়া পরমানন্দে ঠাকুরের রূপ-সুধা পান করিতেন! দাস্য অপেক্ষা সখ্য ভাবই তাঁহার ভক্তিতে অধিক মাত্রায় প্রকট হইত।

জগৎকিশোরের প্রথমা ভগিনী হৈমবতী, স্বামী কি বস্তু চিনিবার আগেই ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। পরপর দুইটি মৃত সন্তান প্রসব করার পর জীবনকৃষ্ণের আগে জগৎ-কিশোরের মাতা মহামায়াকে পান। ভগিনীদের মধ্যে এখন একমাত্র মহামায়াদেবীই বাঁচিয়া আছেন। জীবনকৃষ্ণ যখন

জন্ম গ্রহণ করেন তখন অনবরত দুর্ভিক্ষে ও রাজনৈতিক বিপ্লবাদিতে দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই জগৎকিশোরের পিতা রামলোচন বিদ্যানিধি পৈতৃক জমী-জমা কতক বিক্রী, কতক বন্ধক ইত্যাদি দ্বারা কষ্টে সংসার চালাইতেছিলেন।

জীবনকৃষ্ণের প্রতিভা ছিল অসাধারণ! ইহা লক্ষ্য করিয়াই অর্থের অসচ্ছলতা সত্ত্বেও গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মনোবৃত্তির প্রতিকূলে বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহাকে ইংরেজী স্কুলে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এন্‌ট্রেন্স-পরীক্ষা দিবার মুখেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং দিনকয়েকের মধ্যেই তাঁহার মাতাও স্বামীর অনুগমন করেন। পরপর এই দুইটি দুর্ঘটনায় জগৎ-কিশোর দারুণ ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন; কাজেই বাধ্য হইয়া জীবনকৃষ্ণকে পড়াশুনা ছাড়িয়া সংসারের দিকে মনো-নিবেশ করিতে হইল।

ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে জীবনকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল। অন্নের সংস্থান থাকুক আর নাই থাকুক বাঙ্গালী-পরি-বারে বিবাহ জিনিষটার অসদ্ভাব নাই, বরং তৎপ্রতি একটা চমৎকার মোহই আছে! ছেলে জন্মিবামাত্রই, রাঙ্গাপাণা বৌ আনার কল্পনা পরিবারস্থ লোকের মনে জাগে। তাই, জগৎ-কিশোরের সংসারে যদিও বিপুল অভাব অনটন ছিল, অর্থাভাব

যদিও জীবনকৃষ্ণের পড়াশোনা পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল, তথাপি যখন শুভ মুহূর্তে জীবনকৃষ্ণের বিবাহ হইয়া গেল, তখন তাহার বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর!

জীবনকৃষ্ণের বিবাহের দুই বৎসর অতীত হইলে, জগৎকিশোরের প্রথমা কন্যা অন্নপূর্ণার জন্ম হয়, তৎপর একটি পুত্র জন্মে, তাহার নাম জয়কুমার; সে এখন এগার বছরের। তার পরে আর একটি শিশুপুত্রের জন্ম হয়, যাহাকে দত্তক নেবার জন্য নিঃসন্তান জীবনকৃষ্ণ জগত্তারিণীর সহিত একদিন সবিষাদ রসিকতা করিয়াছিলেন।

জীবনকৃষ্ণের ইহা সৌভাগ্যই বলিতে হইবে, যে পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহারা যখন নিদারুণ অর্থাভাবে পড়িয়াছিলেন, তখন গ্রামের দশজনের সুপারিশে তত্রত্য ইংরাজী ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে নিয়োজিত হইলেন। সেই অবধি তিনি সেই ইস্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন।

চৈত্রের এক রুদ্র অপরাহ্নে ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনকৃষ্ণ আপনার ঘর্ম্মসিক্ত জামা কাপড়গুলি, অতিষ্ঠ হইয়া ছাড়িয়া ফেলিতেছিলেন, এমন সময় হাসিতে হাসিতে মহেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ; জীবনকৃষ্ণের সমবয়স্ক ও এক গ্রামবাসী। কোনও বিশেষ রক্তসম্পর্ক না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে আবাল্য এক অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতার বন্ধন ছিল।

মহেন্দ্রনাথকে গ্রামের অনেকেই সুনজরে দেখিতেন না। বোধ হয়, ইহা মহেন্দ্রনাথের পরোপকার—প্রবৃত্তি বলিয়া একটা গুণ ছিল বলিয়াই! গ্রামের শিশু-বৃদ্ধ-যুবক, সকল

মহলেই তাঁহার সমানভাবে অবাধগতি ছিল। বক্তব্য থাকুক আর নাই থাকুক সভাসমিতিতে বক্তৃতাদান, সেবা-সমিতি সদনুষ্ঠানের চাঁদা সংগ্রহ, রোগীর সুশ্রূষায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ তাঁহার যেমনটি ছিল, তেমনটি প্রায় সচরাচর দেখা যাইত না। নিজের অবস্থা যদিও সচ্ছল ছিল না, তবু, সেদিকে ভ্রূক্ষেপের অবসর তাহার কমই থাকিত; সারা গ্রাম ঘুরিয়া নিঃস্ব গরিবদের খবর নেওয়া তাঁহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যেই ছিল। তথা-কথিত শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহার হইয়া না উঠিলেও, জানিবার একটা দুর্ব্বার প্রবৃত্তি তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল, আর মহতের অনুকরণ করিয়া মহৎ হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তাঁহার মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার অত্যধিক পবিত্র সারল্যের জন্য লোকে অনেক সময় তাঁহাকে পাগল বলিত, কিন্তু জীবনকৃষ্ণ তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সারল্যমণ্ডিত বহু কাল্পনিক বাক্যালাপ শুনিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

মহেন্দ্রনাথকে সহাস্যমুখে আসিতে দেখিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন, "কিহে মহেন্দ্র! বড্ড হাসছ যে! গরমেত ভাই, আমার প্রাণটা প্রায় ওষ্ঠাগত।"

"বলকি জীবনদা! আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন শীতে

কাঁপছি !" এই ব্যঙ্গোক্তির বিনিময়ে জীবনকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিলেন "বিচিত্র কি !" কথাটার অন্তরালে বিশেষ কিছুই ইঙ্গিত না থাকিলেও, কি খেয়ালে জানি না, মহেন্দ্র খপ্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "অর্থাৎ পাগলের আবার কথা ! তার আবার মূল্য !—বলেই ফেলনা জীবনদা ! কথাটা আর ভেতরে রেখেই বা লাভ কি ?"

মহেন্দ্রনাথের স্বতঃপ্রফুল্ল মুখ মলিন দেখিয়া জীবনকৃষ্ণ কাঁধে একখানা চাদর ত্রস্তে ফেলিয়া বলিলেন "চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্; দেখি একটু হাওয়া পাওয়া যায় কি না।"

এই বলিয়া জীবনকৃষ্ণ অগ্রসর হইলেন, মহেন্দ্র নীরবে তাঁহার অনুগমন করিলেন ! গ্রামের যেখানে প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় শিবমন্দিরের ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ পড়িয়াছিল, উভয়ে সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন। লালরং-এর একখানা বড় থালার মতন সূর্য্য যখন পশ্চিমের এক অজানার সাগর কোলে ঢলিয়া পড়িতেন, তখন বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে অস্তরবির এই কিরণলেখা প্রকৃতির গায়ে যে রক্তচ্ছবির আলিপনা আঁকিয়া দিয়া যাইত, সেই মাধুরীমণ্ডিত দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রত্যহই এ সময়ে উভয়ের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। ভগ্ন মন্দিরের এই সমাধিস্তূপে বসিয়া কত সন্ধ্যা তাঁহাদের আকাশকুসুমের

কল্পনায় কাটিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সিপাহীরা ইংরেজের সহিত লড়াই করিয়াছিল, পুষ্পরথের কথা রামায়ণে পড়িতে পড়িতে বিদেশীরা কেমন করিয়া এরোপ্লেন্ আবিষ্কার করিয়াছিল, শা-জাহানকে মমতাজ মরিবার আগে কি অনুরোধ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি কত শত গল্প যে তাঁহাদের মধ্যে হইত, ইহার খবর কেহ রাখিত না, তাহারাও বড় একটা এসব কথাও স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা মনে করিতেন না।

—যাইতে যাইতে হঠাৎ মহেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন "না জীবনদা, আজ ওদিকে যাওয়া হবে না!

বিস্মিত জীবনকৃষ্ণ উত্তর করিলেন "কেন?"

"ভাল লাগছে না।"

জীবনকৃষ্ণ অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোমার কি হয়েছে মহেন্দ্র?"

"কিছু না।"

"বেশ, যে দিকে তোমার অভিপ্রায় হয়, চল!"

ভ্রমণের গতি ফিরিল বটে, কিন্তু অন্যদিনের মত জমাট্ হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া তাঁহারা চলেন নাই; কেননা আলাপটা জমাইতেন মহেন্দ্রনাথ; তিনি যখন বিমনা, তখন জীবনকৃষ্ণকেও বাধ্য হইয়াই নির্ব্বাক্ হইয়া চলিতে হইতেছে।

রাস্তার ধারে একটা মাথা-ভাঙ্গা তেঁতুল গাছের তলায় যাইতেই মহেন্দ্রনাথ হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া বলিলেন "এখানেই বস জীবনদা, চল্‌তে আমার ভাল লাগ্‌ছে না।" জীবনকৃষ্ণ বসিলে তাঁহার গা-ঘেঁসিয়া বসিয়া মহেন্দ্রনাথ ব্যাকুল-আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "সবাই আমায় পাগল, অকেজো ইত্যাদি বলে, তুমিও কি আমায় তাই ভাব, জীবনদা !"

"সবাই তোমায় যা বলুক, আমি তোমায় মহৎ বলেই জানি মহেন্দ্র !"

"কিন্তু সবাই যে আমায় পাগল বলে ক্ষ্যাপায় !"

"ক্ষ্যাপাক না, তাতে তোমার কি ? পাগল বস্তুতঃ তারাই, যারা আপনাকে পরের কারণে বিলিয়ে দিতে পারে। দেখ্‌ছনা, শিব পাগল ; কেননা, সাগরমন্থনে উদ্ভূত রাশি রাশি জিনিসপত্র সকল দেবতা মিলে ভাগ করে নিলেন ; তার সঙ্গে যে কালকূট উঠেছিল, সেটাকে কণ্ঠে ধারণ করে সকল দেবতাকে বাঁচিয়েছিলেন ঐ পাগল মহেশ্বর ; তেমনই চৈতন্য পাগল, কবীর-নানক পাগল—আধুনিক যুগে [illegible] পাগল !"

"কিন্তু আমি যে লেখাপড়াও শিখিনি আমি যে, একবারে মূর্খ জীবনদা !"

"কতকগুলো ইস্কুলের বই মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব পেলেই যে কেবল শিক্ষিত হয় সে-টা আমি মনে

করিনে ! মানব-প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে যাঁরা উন্নত প্রণালীর পথে চলার ক্ষমতা লাভ করতে পেরেছেন, তাঁরাই যথার্থ শিক্ষিত !"

জীবনকৃষ্ণ, মহেন্দ্রনাথের কতকগুলি খাপ্‌ছাড়া কথার মধ্যে আদত ইঙ্গিতটা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। অনেক জিজ্ঞাসা-বাদ করিয়া তবে বুঝিতে পারিলেন—গ্রামের একটা দুশ্চরিত্র ছেলের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়া মহেন্দ্র তাহাকে সদুপদেশ দিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু ছেলেটা উত্তরে তাঁহার অনধিকার চর্চ্চার কথা শুনাইয়া শাসাইয়াছিল। ইহাতেও মহেন্দ্রনাথের মনে বিশেষ কিছু লাগে নাই। কিন্তু যখন ছেলেটির বাবাও ঘটনাক্ষেত্রে আসিয়া 'মায়ে-তাড়ানো-বাপে খেদানো' তাঁহাকে 'নিজের চরকায় তেল দিতে' কড়া আদেশ করিলেন, এবং 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' সেজে পাড়া জুড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ানো তাঁহার উচিত নয়, ইত্যাদি কটু-কাটব্য করিলেন তখন মহেন্দ্রনাথ অন্তরে যথার্থই ব্যথা পাইলেন ! একটা অপগণ্ড শিশুর সামনে তাহারই পিতা কর্ত্তৃক এই প্রকার অবমাননা, মহেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যকে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল, এবং ইহারই ফলে, জীবনকৃষ্ণের নিকট তাঁহার অন্তকার এই অভিমান-মিশ্রিত খেদ !

এই অবান্তর চিন্তা হইতে মহেন্দ্রনাথকে ফিরাইতে জীবন-কৃষ্ণ নানা কথা বলিলেন, 'দেখ মহেন্দ্র, উপকার করাই যাঁহাদের

জীবনের ব্রত, কোন রকমের বাধা বিঘ্ন দেখেই তাঁরা দমে যান্ না, কোন প্রকার নিন্দা কুৎসায় তাঁহারা ব্যথিত হন না— তাঁ'রা প্রশংসা নিন্দার অতীত! নিত্যানন্দ মারখেয়েও জগাই মাধাইকে কোলে করেছিলেন; যিশু এক গালে চড় খেয়ে অপর গাল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন!) অল্পেতেই এমন দমে গেলে দেশের কাজ করতে পারবে কেন'?

একটা দুর্দ্দান্ত ছেলের দ্বারা অপদস্থ হইয়া অবধি মহেন্দ্র নাথের কেবলই মনে জাগিতেছিল, ভাল করিতে গিয়া কেন তিনি এমন ধারা অপমানিত হইবেন! কিন্তু ভাল করিতে গেলেই যে অনেক সইতেও হয়, ইহা তখন পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণায় আসে নাই। কিন্তু জীবনকৃষ্ণের কথায় তাঁহার কাছে এ বিষয় এমনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, লজ্জায় বন্ধুর চোখে-চোখে চাওয়াই তাঁহার পক্ষে যেন অসহ্য হইয়া পড়িল!

এক প্রকার মানুষ আছে, যাহারা বিষ ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াও বেশ চলিতে পারে, বাহিরে উহার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায় না! কিন্তু আর এক রকমের লোক তা' কিছুতেই পারে না, হয় বিষ-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া শেষ হইয়া যায়, নতুবা উহা উদ্গার করিয়া তবে নিস্তার পায়! মহেন্দ্রনাথ ছিলেন, এই শেষোক্ত প্রকারের লোক। জঞ্জাল ভিতরে

জোর করিয়া আট্‌কাইয়া রাখা কোনও কালেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাই আজিকার জমাট্‌ আবর্জ্জনা জীবনকৃষ্ণের সম্মুখে উদ্গার করিয়া তবে তিনি সোয়াস্তি পাইলেন।

(৫)

কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায় রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছিল! তখন তারকা-খচিত নীল আকাশ-চন্দ্রাতপতলে শান্ত ধরিত্রীর শ্যামল অঙ্গনে চন্দ্রকর বিশ্রাম-লাভ করিতেছিল আর মুক্ত হাওয়া আপনার লুপ্ত পুলক ফিরিয়া পাইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে চঞ্চল নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

অভিমান দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মহেন্দ্র আপনার স্বভাব-সুলভ প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইতেছিলেন; তাই উৎফুল্লভাবে তিনি বলিলেন "চল-না জীবনদা" আমাদের বাড়ীতে, মা যে আজ খুব চমৎকার ঘুগ্‌নিদানা বানিয়েছেন!"

"আজ থাক মহেন্দ্র! আর একদিন হবে।"

"না আজই! এখনই!"

মহেন্দ্রনাথের মনটা সরস হইয়া আসিতেছিল, তাই তাঁহার কথাটা উপেক্ষা করিয়া পুনরায় অভিমানের অভিনয় সৃষ্টি করার অভিপ্রায় জীবনকৃষ্ণের হইল না—কাজেই মহেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

উভয়ে বাড়ী পৌঁছিলে, রাত অধিক হইয়া গিয়াছে বলিয়া মহেন্দ্রনাথের মাতা জীবনকৃষ্ণকে খাইয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ! কাজেই গত্যন্তর না দেখিয়া উভয়ে খাইতে বসিলেন। খাইতে বসিয়া মহেন্দ্রনাথের কল্পনার বস্তা খুলিয়া গেল, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন "একটা কথা সব সময়েই আমার মনে হয়, জীবনদা ! সবদেশের সবজাতির মাঝেই যাতে প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ রেখাটা মুছে না যায়, তার জন্য উদ্যম দেখা যায় ; কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীনতার গৌরব সব চেয়ে বেশী থাকিলেও, এ বিষয়ে আমাদেরই সর্ব্বাধিক উপেক্ষার ভাব দৃষ্ট হয়। আমাদের এ নিশ্চেষ্টতার কি কোন কৈফিয়ৎ আছে, জীবনদা ?"

জীবনকৃষ্ণ ইহার উত্তরে কিছুই বলিলেন না ; মহেন্দ্রনাথ অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিলেন "তাই, এক-এক সময় আমার খেয়াল হয়, দেশের লুপ্ত পুঁথিগুলি সংগ্রহ করে, একটা ছোট খাট লাইব্রেরী করি। শুনেছি এমন অনেক পুঁথি আমাদের ছিল যার কতক একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে, আর কতক বিদেশীদের পুস্তকালয়ে স্থান লাভ করেছে !

"তা সত্যি বটে ! তবু মনে হয়, মধ্যযুগের আমাদের হারাইয়া যাওয়া 'স্ব'কে, বাস্তব বৈশিষ্ট্যকে, চিনে নেবার সুযোগও বিদেশীরাই আমাদের দিয়েছেন।"

"অপকারও তারা কিছু কম করেন নি জীবনদা! পরের উপকার করতে গেলে নিজের স্বার্থকে বলি দিতে হয়; তা'ত তুমিই বললে! কিন্তু তাঁদের মধ্যে উপকারের ভাব যতটুকু ছিল, স্বার্থপরতা ছিল, তার অন্তরালে তদপেক্ষা অধিক!"—

"তবু তারা অনেক করেছেন মহেন্দ্র! ইহাতেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পর ক'দিন মুখে গ্রাস তুলে দিতে পারে বল? যদি কেউ দেয়, সেটা তার দয়া! কিন্তু দয়াতে মানুষের ক'দন চলে? টিকে থাকবার জন্য চাই স্বাবলম্বন; তদ্ভিন্ন আমাদের অদৃষ্টে সুখলাভ নেই? ঋষিরা যথার্থই বলে গিয়েছেন, "ভিক্ষায়াং নৈবচ'—ভিক্ষাতে আর চলবার সময় নেই। দেশের লোক যে এদিকে সজাগ হচ্ছে, ইহা সৌভাগ্যেরই সূচনা বলে মনে হয়!"

উচ্চ হাসি হাসিয়া মহেন্দ্রনাথ বলিলেন "তবে চল জীবনদা, দেশের কাজে আমরাও সজাগ হই! আর এই ওজুহাতে আমার মত নিষ্কর্ম্মারও কাজে লেগে থাকার একটা সুযোগ হয়!"

কাজের সম্ভব-অসম্ভব ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সহিত কথা বলার অভ্যাস মহেন্দ্রনাথের ছিল না, তবু জীবনকৃষ্ণ জানিতেন, মহেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া যাহা বাহির হয়, তাহা

অসম্ভব হইলেও কৃত্রিম নহে, তাহাতে একটা যথার্থ অনুভূতি বর্ত্তমান আছে।

—রাত বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। একটু-একটু শীত বোধ করায় চাদরখানা খুলিয়া গায়ে দিয়া জীবনকৃষ্ণ "ভেবে দেখা যাক্" বলিয়া উঠিলেন।—বাড়ী ফিরিয়া জীবনকৃষ্ণ নিজের ঘরে দরজা টানিয়া সবে ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময়, রান্না ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কে, ঠাকুরপো ? খাবে এসো। এত রাত্তির কোথায় ছিলে ? —ভাত গুলো যে একেবারে জল হয়ে গেল!"

বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া জীবনকৃষ্ণ বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধতায় বাধ্য হইয়া অনেক-দিনই বাহিরে আহারাদি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। বাড়ীতে যে খাইবেন না, যাওয়ার সময় এ কথা না বলিয়া যাওয়ায়, জগত্তারিণী জীবনকৃষ্ণের জন্যও রান্না করিতেন। জীবনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলে দুইজনে একত্রে খাইতেন;—আর জীবনকৃষ্ণ অন্যত্র খাইয়া আসিলে একাই খাইতেন।

জগত্তারিণীর প্রকৃতিটা মাতৃত্বের কোমল স্নেহে এমনই পরিপূর্ণ ছিল যে, জীবনকৃষ্ণের না খাওয়ার দরুণ ঠাণ্ডা ভাতগুলি, এমন কি চাকর বাকরদের পাতেও তিনি তুলিয়া দিতে পারিতেন না। পরদিন সকালের আহারাদি হইয়া গেলে, অবেলায়

যখন জগত্তারিণী পান্তা-ভাতগুলি লইয়া বসিতেন, তখন, লজ্জিত জীবনকৃষ্ণ কোন কোন দিন বলিতেন "কিছুটা আমায় দিলেও ত পারতে বৌ-দি ?"

হাসিয়া শান্ত স্বরে জগত্তারিণী বলিতেন "এ গুলো তোমাদের শরীরে সইবে কেন ঠাকুরপো ?" একটা কিছু অসুখ-বিসুখ হলে দুশ্চিন্তাটা ত আমারই ভাগে ষোল আনা পড়বে।"

"অসুখত তোমারও হতে পারে বৌ-দি ! আর যদি আমায় না দাও ত' ও গুলো ফেলে দিলেইত পার।"

বিস্মিত জগত্তারিণী উত্তর করিলেন "কি বলছ ঠাকুরপো ! এত গুলো ভাত ফেলে দেবো ! অন্নকে উপেক্ষা করা আর নিজের জীবনকে উপেক্ষা করাতে কিছুমাত্র তফাত নেই জেনো। তা'ছাড়া বাসি ভাতে আমাদের কিছুই অসুখ করে না ত ? স্বামীর ঘর করতে যেতে হবে বলে, ছোটবেলা থেকেই আমরা সব অভ্যাস করে নিই।"

জীবনকৃষ্ণ আর কিছুই বলিতেন না, অবাক্ হইয়া শুধু ভাবিতেন "তোমরা যে জাতের বৌদি ! তা'কে এক অস্বাস্থ্যকর অচলায়তনে আবদ্ধ রেখে, একটা মহীয়সী শক্তির অধিকার হতে আমরা বঞ্চিত আছি। আমরা সেটা বুঝেও বুঝি না ; তাই যে দোষারোপ তোমাদের আমরা করে থাকি, তা'তে তোমরা বিন্দুমাত্র অপরাধী নও।"

যাহা হৌক, অন্যদিনের মত, আজও জগত্তারিণী অপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া জীবনকৃষ্ণ লজ্জিত হইয়া সসঙ্কোচে বলিলেন "আমি খাবোনা বৌ-দি! জ্যাঠাইমা অনেক পীড়াপীড়ি করাতে সেখানেই খেয়ে এসেছি।"

অভিমান বস্তুটা স্ত্রীজাতির মধ্যেই একটু বেশী রকমের হয়; আর যেখানে অন্তরঙ্গ স্নেহ-বন্ধন বর্ত্তমান, সেখানেত কথাই নাই। ইদানীং জীবনকৃষ্ণ প্রায়ই অন্যত্র খাওয়া দাওয়া সারিয়া আসিতেন বলিয়া জগত্তারিণী মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন; আজ তাই তাঁহার কর্ত্রীত্বের ক্রুদ্ধ অভিমান আহত হইয়া জীবনকৃষ্ণের উপরে পড়িল। তিনি উত্তর করিলেন "সে কি আর আমার জানা নেই ঠাকুরপো? পোড়ামন বোঝেনা, তাই বসে থাকি! তা'ছাড়া আমাদের রান্নাটা কি তেমন রুচিকর হয়; তাই মাঝে মাঝে মুখটা বদ্‌লিয়ে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক—নয়?"

কথা কয়টি বলিয়া, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই, সশব্দে রান্নাঘরের দরজা খুলিয়া জগত্তারিণী ঘরে ঢুকিলেন। বৌ-দির অদ্ভুত এই ভাবান্তরে হতভম্ব জীবনকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গিয়া আপন বিছানায় উঠিলেন।

৮

বৈশাখের এক সকালে জমাট্ মেঘ চারিদিক অন্ধকার করিয়া সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, আর গুরু-গুরু গর্জ্জনের সঙ্গে একটু একটু জলও ঝরিতেছিল! জগৎকিশোর প্রাতঃস্নান করিয়া ঠাকুরঘরে ঢুকিয়াছিলেন;—বারান্দায় বসিয়া হরিমোহিণী ফুলের মালা গাঁথিতেছিলেন।

চন্দন ঘষিতে ঘষিতে তখন জগৎকিশোর হরিমোহিণীর সহিত ভক্তিতত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন; এমন সময়ে জগত্তারিণী দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া, রুক্ষভাবে বলিলেন "ভগবৎপ্রেমের আস্বাদনে পেটের ক্ষুধা যে মেটেনা, তা'র কি খেয়াল আছে?"

কথাকয়টি শুনিবামাত্র ইহার ভিতরে একটা রঙ্গ উপলব্ধি করিয়া, বাধাপ্রাপ্ত জগৎকিশোর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এই হাসিটা ছিল তাঁহার এমন একটা নিজস্ব বস্তু, যা' মানসিক নানা দুশ্চিন্তার দংশন হতে দূরে রেখে তখনকার মত তাঁহাকে প্রশান্তির আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিত! পারিবারিক ব্যয়ভার বহনের অক্ষমতা সময়ে সময়ে তাঁহাকে একটু অস্থির করিয়া তুলিলেও, অন্য কোন রকম চিন্তাই তাঁহাকে

বিশেষ করিয়া অভিভূত করিতে পারিত না। এই আর্থিক অসঙ্গতির উৎকট চিন্তাও এমন কি বহু সময়ে তাঁহার প্রশান্ত ও সরল হাসির অন্তরালে চাপা পড়িয়া যাইত! তাই দুঃখে *অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ জগৎকিশোরের আজও এই গুরুতর অন্নাভাবের বিজ্ঞাপনটা সরলহাসির অন্তরালে উড়াইয়া দিবার* আয়োজন দেখিয়া জগত্তারিণীর অন্তর যুগপৎ ক্রোধ ও ব্যথায় দমিয়া আসিল; পায়ের আঙ্গুল দিয়া মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে, তিনি অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উচ্চহাসি সম্বরণ করিয়া, জগৎকিশোর বলিলেন "দেখ বৌ! এক কাজ কর আজকের মতন কব্‌রেজদার স্ত্রীর ঠেঙে চেয়ে চারটে চা'ল নিয়ে এসোগে যাও!"

উদ্ধতা ফণিনীর ন্যায় জগত্তারিণী বলিলেন "রোজ রোজ আমি পরের দোরে চা'ল ভিক্ষে করতে যেতে পারিনে।"

"এতে আর দোষটা কি বল? আমরাত আর সত্যি সত্যি চা'লগুলো রেখে দি-ই না এবং দেবোও না। আজ আমাদের নেই বলেই তাঁদের কাছে চাইছি—কাল আমাদের এলে আবার দিয়ে দেবো।"

চাওয়াটা লজ্জার বিষয় হইলেও, চাহিয়া আনা বস্তুটা যখন আবার ফিরাইয়াই দেওয়া হইবে, তখন তাহাতে লজ্জা বা প্রত্যবায় কিছুই নাই, এই ধারণা জগৎকিশোরের মনে

বদ্ধমূল হওয়ায়, তাঁহার সাংসারিক এ প্রকার অনভিজ্ঞতায়, নিতান্ত দুঃখেও জগত্তারিণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল ; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "চাওয়াটা লজ্জার বিষয় নয়ই যদি, তবে চাইতে যাঁর লজ্জা করে না, তিনি গেলেইত পারেন। রোজ-রোজ আমি যেতে পার্‌বো না, তা'তে আমার লজ্জাই করে।"

"কুমার কোথায়? তুমি যেতে না পার তা'কে পাঠিয়ে দাও!"

বেশী কথা কাটাকাটি করার অভ্যাস জগত্তারিণীর কোনও কালে ছিল না, কিন্তু সংসারের নানা জঞ্জালে জ্বালাতন হওয়ায়, তাঁহার যেন আর বরদাস্ত হইতেছিল না ; তাই রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন "সকাল থেকে ওঠে অবধি সকলের ফায়-ফরমায়েসে যদি সারাটা দিনই তার কেটে যায়, তবে সে পড়্‌বে কখন আর পরীক্ষাই বা দেবে কি?"

"ছাই পরীক্ষায় কাজ নেই! চা'ল নিয়ে আস্‌তে বলগে!"

গলার স্বর দৃঢ় করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "আজ সেও যেতে পার্‌বে না।"

যাহারা নিতান্ত সাদা-সিধা প্রকৃতির লোক, এবং যাহাদের রাগ সহজে হয় না, তাহাদের রাগ উঠিলে প্রমাদের কারণ হইয়া থাকে! জগত্তারিণীর অদ্যকার এ কঠোরতায় জগৎ-

কিশোর ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাই ক্রুদ্ধ অভিমানে তিনি বলিয়া উঠিলেন "দু'দণ্ড ঠাকুরের নাম পর্য্যন্ত করবার অধিকার আমার নেই! এমনি হাত-পা বেঁধে আমায় তোমরা রাখতে চাও—বৌ!"

ক্রোধের তীব্রতায় তাঁহার চক্ষু জল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল! কে জগৎকিশোরের সরল প্রাণে এই ভাব উন্মেষিত করিয়া দিবে যে, তাঁহার এই মনোবেদনা অহৈতুক! পরিবারের *পরিপূর্ণ দায়িত্ব যাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে, তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে শ্লাঘা নাই; কিন্তু অপালনে অপরাধ আছে,—প্রত্যবায়* আছে। জগৎকিশোর এতকাল পরিবার পালন করিয়া এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আর কেন করিবেন এ কথা আলোচনার বিষয় হইবে না, পরিবারস্থ লোকজন অনশনে কিংবা অর্দ্ধাশনে থাকিলে তজ্জন্য তিনিই দায়ী হইবেন!

জগৎকিশোর ব্যর্থ আক্রোশে কাঁপিতে কাঁপিতে সহসা পূজার আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন; আর ঠাকুর দালান হইতে নামিয়া, শুধুপায়ে, ভিজিতে ভিজিতে দ্রুত 'কবিরাজ-দা'র' বাড়ীর পানে ছুটিলেন।

কবিরাজ-দা'র দুই সংসার ছিল। ঘরে ঢুকিয়াই সাম্‌নে ছোট গিন্নী সৌদামিনীকে দেখিয়া জগৎকিশোর বিনয়ের সহিত বলিলেন "এই যে ছোট্-ঠান্! এ'তে করে আমাদের এবেলার

মতন চার্‌টে চা'ল্ দাও না; আমাদের আজ্‌কে চা'ল্ আনা হয়নি।" বলিয়া ভাঁজকরা ভিজা গাম্‌ছাখানা কাঁধ হইতে খুলিয়া সৌদামিনীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

জগৎকিশোরকে আসিতে দেখিয়া, সৌদামিনীর বুঝিতে বাকি ছিল না, তিনি কি কারণে আসিতেছেন! তাই তাড়াতাড়ি আত্মগোপণ করিবার মানসে ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তখনই বড়গিন্নী ভবতারিণী হেঁসেল হইতে বাহির হইয়া কি একটা কথা লইয়া 'যুদ্ধং দেহি', করায়, তিনিও পূর্ব্ব সংকল্প বিস্মৃত হইয়া, যথাপূর্ব্বং "তথাস্তু" বলিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইবেন, ঠিক্ এমনই সময়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া জগৎকিশোর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আপাততঃ ক্ষণকালের জন্য ভবতারিণীর সহিত সমরাকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া, সৌদামিনী জগৎকিশোরকে বলিলেন "আপনাদের ত ফি-রোজই চা'ল আনা হয় না! আমি কিছুই জানিনে, দিদিকে জিজ্ঞেস্ করুন।"

যদিও এই মাত্রই উভয়ের মধ্যে যুদ্ধায়োজন চলিতেছিল, তথাপি, অকস্মাৎ এই বিপৎ-পাতে, উভয়ের মধ্যে চট্‌পট্ সন্ধি হইয়া গেল। ভবতারিণীর কাণে 'দিদি' শব্দটি যেন সঙ্গীতধ্বনিবৎ প্রবেশ করিল, তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া তিনি বাহির হইয়া বলিলেন "কি রে সুদাম্ ব্যাপার কি?"

মুখের ভঙ্গিমা করিয়া সৌদামিনী বলিলেন "ও বাড়ীর ভট্‌চায্‌ এসেছেন দিদি! তাঁদের চা'ল্‌ আনা হয়নি বলে, আজ্‌কের মতন চার্‌টে চা'ল দিতে।"

বিদ্রূপের বঙ্কিম স্বরে, ভবতারিণী বলিলেন "এদিকে যে ভট্‌চায্‌ নিজেই এসেছেন, গিন্নী তবে কোন্‌দিকে গেলেন?"

এই বক্রোক্তিতে যে অন্তর্নিহিত শেল ছিল, তাহা জগৎ-কিশোরের প্রশস্ত মনকে কিছুতেই আহত করিতে পারিল না, *ইহা গিয়া লাগিল উৎকর্ণা জগত্তারিণীর ব্যথিত বক্ষে!*

ভবতারিণীর কথার উত্তরে অম্লান বদনে জগৎকিশোর উত্তর করিলেন "বউত কোথাও যায়নি বট্‌-ঠান্‌, সে বাড়ীতেই আছে। রোজ-রোজ চাইতে তার লজ্জা করে বলে আমি-ই এসেছি।"

"চাইতে আপনার লজ্জা করে না?"

"তা'ক'রে, কিন্তু এ তো আর সত্যি-সত্যিই চাওয়া নয়?"

"এটা তবে কি?"

"আজ আমাদের চা'ল নেই বলে চার্‌টে ধার নিচ্ছি; কাল আমাদের আবার এলে দিয়ে দেবো। লোকে কি টাকা হাওলাত নেয় না?"

উত্তর শুনিয়া ভবতারিণী ও সৌদামিনী উভয়ে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তে হাসি সম্বরণ করিয়া

ভবতারিণী বলিলেন "আসল কথা কি ভট্‌চায্‌, এভাবে রোজ রোজ সদাব্রত কর্‌তে বাড়ীর কর্ত্তা মানা করে দিয়েছেন।"

জগৎকিশোরের স্বতঃপ্রফুল্ল মন, এই কথায় একেবারে দমিয়া গেল, ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া তিনি কাকুতির স্বরে বলিয়া উঠিলেন" "চা'ল্‌গুলোত আর ঠিক্‌ঠিক্‌ রেখে দেবো না বট-ঠান্‌! মাইরি বল্‌ছি!"

"মাইরি ত বুঝ্‌লাম! কিন্তু আপ্‌নার নাক কেটে পরের যাত্রা করার মতন মহানুভবতা আমাদের নেই!"

পরিপূর্ণ বিনয়ের সহিত জগৎকিশোর বলিলেন "ছেলে পিলে না খেয়ে আছে, দাওনা চার্‌টে চা'ল বট্‌-ঠান্‌? তোমরাও ত সন্তানের মা!"

জগৎকিশোরকে ফিরানো কিছুতেই সম্ভবপর নয় দেখিয়া সতীনদ্বয় যুক্তি করিয়া অল্প কিছুটা চাউল জগৎকিশোরের গাম্‌ছায় বাঁধিয়া দিলেন। চাউলের পরিমাণে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়াই জগৎকিশোর ফিরিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গাম্‌ছাখানা রান্নাঘরের দাওয়ায় একরকম ছুড়িয়া ফেলিয়াই ক্ষিপ্রপদে ঠাকুর-দালানে উঠিলেন।

---

(৭)

কাণ পাতিয়া জগত্তারিণী সমস্তই শুনিতেছিলেন; জগৎকিশোরের দেব-প্রকৃতিতে আজ যে ব্যথার চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, আর ফলে অবমাননার যে দারুণ কশাঘাত তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল, আর তজ্জন্য দায়ী যে জগত্তারিণী নিজেই, ইহা ভাবিতে ভাবিতেই জগত্তারিণীর মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। সাংসারিক জঞ্জাল হইতে আগলাইয়া রাখিয়া যতদূর সম্ভব তিনি জগৎকিশোরকে শান্তির আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; জগৎকিশোরের কর্ত্তব্যের নানা গুরুভার অম্লান বদনে লইতে তিনি কোনও দিন কুণ্ঠিত হন নাই। তবে আজ কেন জগৎকিশোরকে এমন ধারা বিব্রত করিতে পতিব্রতা রমণীর এ কঠোর দুরভিসন্ধি মনের মধ্যে জাগিলো! কিন্তু কে বুঝিবে, কতখানি জ্বালায় জ্বলিয়া তবে জগত্তারিণীকে জগৎকিশোরের উপর এমন কঠিন এমন নির্ম্মম হইতে হইয়াছিল।

সময় সময় জগত্তারিণী জগৎকিশোরের ব্যবহারে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতেন! ঘরে চা'ল বাড়ন্ত, ইহা অনবরত জগৎকিশোরকে নিবেদন করিলেও জগৎকিশোরের সাড়া

মোটেই মিলিত না। অনুরোধ-উপরোধে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া কোনও দিন তিনি বলিয়া উঠিতেন "আমার বাক্স তোরঙ্গ কিছুইত নেই, বৌ! যা পাই তোমার কাছেইত দিয়ে থাকি তবে আমায় বারবার বিরক্ত কর কেন?"

বাক্স এবং তোরঙ্গ যে জগৎকিশোরের নাই, তাহা জগত্তারিণী বিলক্ষণ জানিতেন; কিন্তু এ কৈফিয়ৎ ত যথেষ্ট নয়! ইহাতে পেটের ক্ষুধা যায় না বা সংসারের অশান্তির নিবৃত্তি হয় না! পরিবারের দায়িত্ব যাঁহার উপর, বাক্স তোরঙ্গ না থাকিলেও ব্যয়ানুরূপ সঙ্গতি যে তাঁহার অবশ্যকরণীয় এই সহজ সত্যটা জগত্তারিণী স্বামীকে বুঝাইতে বারবার চেষ্টা করিয়াও অপারগ হইতেন। অবশ্য যেদিন জগৎকিশোরের অর্থস্বাচ্ছন্দ্য থাকিত, সেদিন তাঁহার ব্যয়, আয়ের মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত; কিন্তু অর্থের অনটনকালে সংসারের কোনও অভাব-অভিযোগেই যে তিনি কাণ পাতিয়া শুনিতেন, এমন বোধ হইত না! জীবনকৃষ্ণ বাড়ী থাকিলে, জগত্তারিণী সংসারের অনটন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার ইষ্টারাধনার এক-নিবিষ্টাতাকে সহজে সন্ত্রস্ত হইতে দিতেন না! কিন্তু আজ কয়েক দিন ধরিয়া জীবনকৃষ্ণ বাড়ী নাই! মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেদিন আলোচনার পর হইতে, তাহার মনে নাকি আর্য্যদের প্রাচীন পুঁথি-ফলক ইত্যাদি লুপ্তরত্নোদ্ধার করিবার প্রবল প্রেরণা জাগিয়াছিল;

তাই, ভাস্কর বর্ম্মার দানসূচক এক তাম্রফলক কোথায় মাটীর নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া উহা উদ্ধার করিতে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন।

জীবনকৃষ্ণ চলিয়া গেলে, ধৈর্য্যশীলা জগত্তারিণী আপনার অসীম কর্ম্ম-তৎপরতায় কয়েকদিন কোনও রূপে চালাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু আজ দুই দিন ধরিয়া সংসার একেবারে অচল হইয়া উঠিয়াছে ! তিনি নিজে যে দুইবেলা পেটভরার সুযোগ পাইতেছেন না, সেইজন্য নয়, জগৎকিশোর আর তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগকে যে অনশনে থাকিতে হইবে—এই নিদারুণ কল্পনা তাঁহাকে আতঙ্কে শিহরিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই জগৎকিশোরের তপঃ-তৃপ্ত প্রশান্ত অন্তরকে বিব্রত করিয়া তুলিতে, পূজানিরত যোগীর যোগ সাধনে বাধা দিতে আজ এমন অসময়ে তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন।

সাংসারিক অনভিজ্ঞতা জগৎকিশোরের এমনি ছিল যে, একটি পোষ্যের জন্য কতটা চাউলের দরকার, ইহা পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল না। তাই আজিকার ভিক্ষা করিয়া আনা চাউলগুলি যে একজনের পক্ষেও যথেষ্ট নহে, সে দিকে দৃষ্টিই তাঁহার পড়িল না। ইহা জগত্তারিণীর অবসন্ন মনকে আরও বেশী করিয়া অথর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছিল।

দক্ষিণের একটা ছোট ঘরে বসিয়া কুমার পরীক্ষার পড়া পড়িতেছিল, ধীরপদবিক্ষেপে জগত্তারিণী তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর নিশ্বাস তাঁহার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া পরমেশ্বরকে নিবেদন করিল 'যদি উপযুক্ত ক্ষমতা না দাও দয়াময় তবে অক্ষমের স্কন্ধে এমন গুরুভার চাপাইয়া দাও কেন ?"

মাকে আসিতে দেখিয়া কুমার অধীর আগ্রহে বলিল "ভাত হয়েছে মা ? আমার যে একজামিনের সময় হয়ে এলো।"

জগত্তারিণীর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা পড়িল ; তাই করুণ হইতে গিয়া আরও কঠোর হইয়া বলিলেন "সকলেই যার যার ভাবনা নিয়ে আছেন ; সংসারটা যে চলে কেমন করে—তার, ত খবর আর কারো নেই ! বলি ঘরশুদ্ধ সবাই যদি না খেতে পেয়ে মরে, তবে পড়াশোনা করে কি আমার পিণ্ডদান হবে ?"

একান্ত অপ্রত্যাশিত বাক্য আজ সহসা স্নেহময়ী মায়ের মুখে শুনিয়া কুমার স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কাতরভাবে সে উত্তর করিল "আমায় কেন আজ এমন করে বক্‌ছো মা ! আমায় যখন যা' বল, আমিত তখনই তা' করে থাকি !"

কুমারের জলভারাক্রান্ত চক্ষুযুগলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, উচ্ছ্বসিত মনোভাব গোপন করিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "নে তোর আর আর সাফাই দিতে হবে না ; ওঠ্‌! দোকান

থেকে টাকাখানেকের চাল চট্ করে নিয়ে আয়! ততক্ষণ আমি উনুন ধরিয়ে ফেলি!"

মায়ের এই অপ্রত্যাশিত আদেশে কুমারের মন দমিয়া গেল। ব্যথিত স্বরে সে উত্তর করিল "দোকানে কেউ-ই আমাদের ধার দেয়না মা! তাছাড়া, আমাদের এক্জামিনের টাইম্ও যে হয়ে এসেছে!"

"রেখেদে তোর এক্জামিন!—আর ধারেই বা দেবেনা কেন? বলিস্, কালই দাম দিয়ে দিবি!"

"ধারে জিনিস এনে কথা রাখ্তে পারিনে বলে, দোকানীরা কেউ আমাদের বিশ্বাস কর্তে চায় না।" কুমারের অশ্রুযুগল জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল! কিন্তু, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়া মাতা বলিলেন

"পাবি – যা'ত!"

"কিন্তু আমার যে এক্জামিন মা"

"ফের্ ঐ কথা! যা বল্ছি!"

কাতর দৃষ্টি লইয়া, মায়ের মুখের দিকে তাকাইতেই, তাহাতে একটা শাসন-কঠোর ভাব দেখিয়া কুমার মাথা নীচু করিয়া লইল!

পিতামাতার কথার প্রত্যুত্তর করার অভ্যাস কুমারের কোনও কালে ছিল না; নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইলেও মায়ের অন্তকার এ আদেশ কুমার মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিল না; বই বন্ধ করিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল;—কিন্তু বড়কষ্টে! *কেননা, হয়তঃ আজ আর তা'র একজামিন দেওয়া হইবে না। কালও 'সার' বলিয়াছেন, এবারে জলপানি সে পাইবেই পাইবে!* চাউলের সন্ধানে যাওয়াতে যে তাহার আপত্তি, তা'ত নয়; তবে, এ আদেশটা কয়েকঘণ্টা আগে, কি বিকালে করিলে কি হইত না? সংসারের নানা অভাব অনাটনের কথা সে অল্প বয়সেই বুঝিতে শিখিয়াছিল! সময়ে অসময়ে আরও অনেক দিনই চাউলের বোঝা সে ঘাড়ে করিয়া বহিয়া আনিয়াছে—এবং বহুদিন দুঃখ-দারিদ্র্যের নির্য্যাতন, অন্যের অজ্ঞাতে অকুণ্ঠিতভাবে বুক পাতিয়া লইয়াছে। সেজন্য দুঃখ নহে; দুঃখ, তাহার, হয়ত আজ পরীক্ষা দেওয়া হইবেনা বলিয়া!

অবসাদের গুরু-পাষাণ বুকের উপর চাপাইয়া, কুমার ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। দোকানে দোকানে ঘুরিয়া সে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানকেই শুধু বোঝা বাঁধিয়া লইতেছিল, অবশেষে এটি নূতন মুদীর কাছে নিজের আলোয়ানখানা বাঁধা রাখিয়া সে টাকা খানেকের চাউল, আঁচলে করিয়া লইয়া

দ্রুত বাড়ীর দিকে ছুটিল। এবং বাড়ী ফিরিয়াই রান্নাঘরে ঢুকিয়া আঁচল হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া চাউলগুলি ফেলিয়া দিল। জগত্তারিণী জগৎকিশোরের চাহিয়া আনা চাউলগুলি ফুটাইয়া রাখিয়া পথের পানে অধীর উৎকণ্ঠায় চাহিতেছিলেন ; কুমারের এ আচরণে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়াই তিনি বলিলেন "চট্‌করে একটা ডুব দিয়ে আয় বাছা ! আমি ততক্ষণে ভাতটা বেড়ে ফেলি।"

হায় মাতৃস্নেহ ! অপমান মিশ্রিত চাউলগুলি ফিরাইয়া দিবার পরিপূর্ণ অভিপ্রায় থাকিলেও, তোমারই প্রভাবে জগত্তারিণীর সে দৃঢ়তা হয় নাই !—কেননা, কুমার ফিরিয়া আসিয়া তবে কি খাইয়া ইস্কুল যাইবে !

নদীর জলে বাঁধ পড়িলে, সেখানে জলের এক দুর্ব্বার শক্তির সূচনা হয়, এবং কোনও ক্রমে সেই বাঁধ ভাঙ্গিতে পারিলে স্রোতের বেগে যে অদম্যতা হয়, তাহাকে আট্‌কানো তখন কাহারও সামর্থ্যের মাঝে থাকে না। নিরুদ্ধ অভিমান কুমারের অন্তরে ক্রমে জমাট্ বাঁধিতেছিল, এখন মায়ের মমতায় আহত হইয়া অন্তরের সেই অবরোধ টুটিয়া গেল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে সে বলিয়া উঠিল "আমি খাবনা মা ; আমার খিদে নেই !" বলিয়া পরমুহূর্ত্তেই কাগজ-কলম-দোয়াত লইয়া ছুটিয়া পলাইল। জগত্তারিণী পুত্রকে আর

কিছুই বলিবার অবকাশ পাইলেন না ; শুধু কুমারের যে ক্ষুণ্ণ অভিমান তরলায়িত হইয়া রান্নাঘরের ভূমি চুম্বন করিতে-ছিল, জড়অবসন্নতায় অপলক নেত্রে তিনি ইহারই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন !

কর্ত্তব্যের তাড়না বড় কঠোর, বড় তীব্র ! মনোদুঃখের দীর্ঘশ্বাস মনেই গোপন রাখিয়া তিনি ঘরময় ছড়াইয়া-পড়া চাউলগুলি খুঁটিয়া তুলিয়া ঠাকুরের ভোগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগৎকিশোরের অনাবিল মন হইতে ইতি-মধ্যেই সকল আবর্জ্জনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। পূজা সাঙ্গ করিয়াই তিনি ঠাকুরের ভোগ লইয়া আসিতে হুকুম করিলেন।

বেশী আলাপের প্রবৃত্তি জগত্তারিণীর ছিল না ; মর্ম্মব্যথার দুঃসহতায় তাঁহার অশ্রুযুগল জলে ভরিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল ! ইহা স্বামীর নিকট হইতে গোপন করিবার জন্যই আজ তিনি অন্য দিনের অনভ্যস্ত লম্বা ঘোম্‌টা টানিয়া দিলেন ! এ অস্বাভা-বিকতাকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, জগৎকিশোর কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া, মদনমোহনের ভোগ লাগাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। Pica

---

আহারাদি সারিয়া জগৎকিশোর নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন, কিন্তু অভুক্ত জগত্তারিণী অক্ষুণ্ণ গাম্ভীর্য্যে সংসারের কাজ যথারীতি করিয়া যাইতেছিলেন! মাঝে মাঝে তাঁহার মন তাঁহার উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও, সংসারের কাজে এতটুকু ভুল তাঁহার হইতে ছিল না—এমনি তাঁহার স্বভাব সুলভ অচঞ্চল ধৃতি! এমনি তাঁহার অনন্যসুলভ সহনশীলতা; তবু সন্তানের বুভুক্ষার চিত্র কল্পনা-নেত্র দর্শন করিয়া তাঁহার চরমধৈর্য্যের বাঁধও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল! কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল, কেন সে এমন করিয়া নীরবে চলিয়া গেল! কাঁদিয়া কাটিয়া সে কেন জানাইয়া দিয়া গেলনা যে—মা তাহাকে খাইতে দেয় নাই! জীবনের এই অল্পপরিসরের মধ্যেই কুমার মায়ের সাথে অনেক দিন হরিবাসর করিয়া কাটাইয়া দিলেও অন্যদিন ত জগত্তারিণীর আজিকার মত বাধে নাই! আজিকার অপরাধ যে সম্পূর্ণ তাঁহারই

সমস্ত দিবসের বুভুক্ষা লইয়া শ্লথদেহে যখন কুমার বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন জগত্তারিণীর অধীর হৃদয় পুত্রকে জড়াইয়া চুম্বন করিবার জন্য ব্যগ্র হইল; কিন্তু আত্মসংযমের

প্রচুর ক্ষমতায়, তাঁহার সেই অতিমাত্র ব্যগ্রতা লোকলোচনের গোচর হইবার অবকাশ পাইল না; মনের বুদ্বুদ মনেই রহিল; ভগবান রহিলেন শুধু তাঁহার গোপন অভিপ্রায়ের সাক্ষী!

কুমারের অভিমান ইতিমধ্যেই লোপ পাইয়া গিয়াছিল। এবং পরীক্ষায় যদিও আশানুরূপ করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া মনটা একটু কাতর হইয়াছিল, তথাপি, কর্ত্তব্যপালনের পরিপূর্ণ সার্থকতায়, তাহার মনে এই বয়সেই একটা চমৎকার আত্মপ্রসাদ আসিয়াছিল!

ঘরে যেদিন কেরাসিন থাকিত না, সেদিন আলোর অভাবেই সন্ধ্যাকালে ভাই-ভগিনীতে মিলিয়া পিতার কাছে কত পুরাণের গল্প শুনিত! শুনিতে শুনিতে আর সকলেই নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইত, কুমার শুধু অবাক হইয়া ভাবিত, দাতাকর্ণের অপূর্ব্ব দান! বৈশ্বানরের তপ্ত কোলে কুশধ্বজের আত্মাহুতি, পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে গিয়া রামের বনগমন এবং আরো কত কি!

দুর্দ্দিন কখনও একা আসে না, অনেক অনর্থকেও সঙ্গে করিয়া নিয়া আসে! জগৎকিশোরের সাংসারিক অসচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে কুমারেরও জলপানি না পাওয়ায় এক অদৃষ্টহীনতার সূচনা হইয়া গেল; অধিকন্তু, জীবনকৃষ্ণ

ছুটি না লইয়া কোথায় এক তাম্রশাসনের অনুসন্ধানে চলিয়া যাওয়ায়, সেক্রেটারী রাগিয়া তাঁহার স্থানে নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। জীবনকৃষ্ণের অকস্মাৎ চাকুরিটি যাওয়া জগৎকিশোরের পারিবারিক দুর্দ্দিনের আরও একটা নির্দ্দেশ বই আর কিছুই নহে!

—দিন কতক পরে জীবনকৃষ্ণ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যখন জগত্তারিণীর মুখে তাঁহার চাকুরী যাওয়ার সংবাদ পাইলেন, তখন কাষ্ঠ হাসিয়া তিনি বলিলেন "এবার আর বিয়ের আব্দার কর্‌বেনা বৌ-দি?"

বিরক্ত হইয়া জগত্তারিণী উত্তর করিলেন "বিয়ের আব্দারেরই যত দোষ, নয়? নানা খামখেয়ালী নিয়ে যেখানে খুসী তুমি ঘুরে বেড়াবে—আর অপরে সেটা সইবে!"

হাসিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "ভাগ্যিস্ ছেলে পিলে আমার নেই।"

"তা'তে কি হলো শুনি?"

"তেমন কিছু নয়; তবে কথাটা কি জান বৌ-দি! ছেলে মেয়ে হয়েছে বলে সংসারের ভাবনা নিয়ে তোমরা যতটা বিব্রত, আমি ততটা বিব্রত সহজে হয়ে পড়্‌ব না।"

"ছেলে পিলে ছাড়াও কি আর কোনও ভাব্‌না নেই তোমার?"

"ভাবনা যদি কিছুর থেকে থাকে, তবে তা'ত তুমিই ঘাড় পেতে নিয়েছ বৌ-দি! সাধ করে আরও একটীর ভাব্‌নাও ত তুমি নিতে চেয়ে ছিলে!"

তার পরে চট্‌ করিয়া কথাটা উল্‌টাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "যাই বল বৌদি; অনুর ত কোনও রকম বিয়ে হয়ে গেল; এখন যে আরও একটি আছে, তাকে পার করার চিন্তা সময় সময় আমায় অস্থির করে তোলে বটে!"

সুযোগ পাইয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তবু যাহোক পরের ছেলে পিলেদের জন্যও কিছুটা দরদ্‌ আছে"!

জলভারাক্রান্ত চক্ষে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "তেমন কথা বলোনা বৌ-দি! এরাই আমার সব! ভগবান্‌ আমায় বঞ্চিত করেছেন বলে, তোমরা এমন করে নির্দ্দয় হয়োনা!"

এ ভাবটা চিরদিন থাকিলে হয়! জগত্তারিণীর মনে একটা কৌতুকের হাসি জাগিয়া উঠিল।

ক্ষিপ্রভাবে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "এ আন্তরিকতার ব্যত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমারও একটা কিছু ভালমন্দ হয়!"

এরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে কুমার আসিয়া বলিল "কাকাবাবু, বাবা আপনায় ডেকেছেন!"

সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্তভাবে ধীরে ধীরে জীবনকৃষ্ণ ঠাকুরদালানে উঠিলেন! মালা জপ করিতে করিতে জগৎকিশোর বলিলেন

"জীবন, ছেলে মেয়ে ক'টির জন্মদাতা বটে আমি, কিন্তু আমি এখন একান্ত অসমর্থ এবং সংসারের ভার তোমারই উপরে সম্পূর্ণ, তাই জানিয়ে দেবার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম !"

জীবনকৃষ্ণের চাকুরি যাওয়া সম্বন্ধে কোনও কথাই জগৎকিশোর উল্লেখ করিলেন না, একটা তিরস্কারের কথাও না ; কেবল নিজের অক্ষমতার কথাটা জানাইয়া, ভ্রাতৃবৎসল অনুজের সহায়তা যাচ্ঞা করিতেছিলেন মাত্র !—সেইজন্য আরও বেশী করিয়া তিনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

জপের মালাটা মাথার উপর হইতে নামাইয়া তামার পাত্রে রাখিতে রাখিতে জগৎকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাক্, যে কাজে তুমি গিয়েছিলে, তা'র কি হলো !"

কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "দু'খানা তাম্র ফলক উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি !"

"তা'তে কি লেখা আছে !"

"পাঠোদ্ধার এখনও রীতিমত হয় নি ; অল্পস্বল্প যা' হয়েছে, তা'ও প্রত্যয়যোগ্য নয় ! এটাকে নরওয়েতে ষ্টেন্‌কনোর কাছে পাঠানো স্থিরীকৃত হয়েছে !"

"ভারতের শাস্ত্রচর্চ্চাটা বুঝি এখন সাগর ডিঙ্গিয়ে আশ্রয়-ভিক্ষে করছে ?"

যথার্থই; আমরা প্রতিপদেই বড্ড পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি; তবে দেখা যায় এ পরনির্ভরশীলতার লজ্জাকে ঘুচাবার জন্যে একটা স্বাবলম্বনের প্রেরণা আমাদের মাঝে বর্ত্তমানে জাগ্‌ছে!"

উচ্চ-হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমারও, এ পরনির্ভরশীল ভাইটীর অবস্থাটা ভুলে যাওয়ার অসম্ভবরকম প্রেরণাটা এসে না পড়ে!

দাদার এ পবিত্র রহস্যে সহসা লজ্জা পাইয়া জীবনকৃষ্ণ সরিয়া পড়িলেন! কুণ্ঠার সহিত তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দাদার সাম্‌নে এমনভাবে মনটাকে রাস-ছাড়া করার প্রবৃত্তিটা আজ তাঁহার কেন হইল?

(৯)

সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ ক্রমে সুকঠিন হইয়া উঠায়, জীবনকৃষ্ণ অর্থাগমের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা মানুষের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে, মহৎকর্ম্মে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। জীবনকৃষ্ণেরও মহৎ প্রবৃত্তি দারিদ্র্যজনিত নানা দুশ্চিন্তার অন্তরালে চাপা-পড়িয়া গেল!

ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির বার্ত্তা পাইয়া বিদেশীরা যেমন এদেশে দলে দলে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল, আগেরকালে আসামের প্রতিও বাংলাদেশবাসীর একটা অনুরূপ মোহ ছিল। দারিদ্র্যের তাড়নায় অস্থির হইয়া, অর্থসঞ্চয় মানসে বাংলার বহু শ্রমিক একবার আসামে গিয়া, যখন বেশ সচ্ছল হইয়া উঠিত, তখন আর গতায়াতের দুর্গম পন্থা অতিক্রম করিবার কষ্ট তাহারা স্বীকার করিতে চাহিত না; কাজেই মায়ের কথা, ভায়ের কথা এমনকি দেশ-মাতৃকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনটাতে প্রত্যাবর্ত্তনের মায়া জাগাইতে সমর্থ হইত না! অধিকন্তু, আসামের গিরিতে গিরিতে, কন্দরে-কান্তারে-চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়া প্রকৃতিরাণীর যে গরিমাময় নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া

উঠিয়াছে, মানুষের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য ইহাও বড় একটা কম প্রলোভন নহে। বস্তুতঃ, আসামের সেই ভীতি-বিস্ময়-মিশ্রিত নির্জ্জন নিঃসঙ্গতার মধ্যে পর্ব্বতমালা, আর তার শ্বেত শুভ্র তুহীন মেখলার সন্তর্পন আলিঙ্গনকে চিরসঙ্গী করিয়া লইবার তরুণ আনন্দ মনকে একান্ত ভরপূর করিয়া তোলে! আর এই ওতঃপ্রোত সৌন্দর্য্যের মঙ্গলগীতি শ্রীর নির্ম্মল আসঙ্গ লাভ করিয়া, বর্ষণাভিষিক্ত মৃদু ধরণীর প্রায়, দারিদ্র্য-দীর্ণ ও আশাহত মানবমনকে মুঞ্জরিত করিয়া তোলে! এ মোহ টুটাইয়া যাওয়া কি সহজ?

দুপুরের আহারাদি সারিয়া জগত্তারিণী ঠাকুরদালানে মাদুর পাতিয়া একখানা মহাভারত নিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু বসিয়া, মহাভারতের পাতা উল্টানোই তাঁহার সার হইল; কেননা, জীবনকৃষ্ণ আজ আসাম রওনা হইয়াছেন বলিয়া, সে দেশ, সম্বন্ধে যে এক স্বভাবিক বিভীষিকাময় আতঙ্ক, তাহাই তাঁহার মনখানাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল!

জগত্তারিণী আন্‌মনে বসিয়া নানা দুর্ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময় কুমার আসিয়া ডাকিল 'মা!"

পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহের কোমলতায়, জগত্তারিণী তাহাকে কোলে জড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"কি বাবা?"

কুমার কিছুই বলিতে পারিলনা; শুধু অশ্রুদুইটি জল-ভারাক্রান্ত করিয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল!

মমতামণ্ডিত স্বরে জগত্তারিণী কুমারের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোর কি হয়েছে কুমার! এমন কচ্ছিস্ কেন বাবা?"

আর্দ্রকণ্ঠে কুমার উত্তর করিল "আমি পাশ করেছি মা, কিন্তু জলপানি পাই নি।"

"না পেয়েছিস্ নাই;—তা'তে কি হয়েছে?"

"বাবা আমায় বক্‌লেন, কেন জলপানি পাইনি মা আমি?—"আমি বলেছিলুম ঠিক্‌সময়ে যেতে পারিনি বলে ভালো পরীক্ষা দিতে পারিনি! তখন রাগ করে আমায় তিনি বল্‌লেন কেন দেরী করে ইস্কুলে গেলুম!"

"এর উত্তরে কিছুই তুই বলিস্ নি?"

"না মা, কেমন করে আমি জানাব যে ঘরে চা'ল বাড়ন্ত হওয়ায়, তুমি আমায় দোকানে পাঠিয়েছিলে এবং তাতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল!"

"এটা বুঝি তাঁর জানা ছিলনা"

"সেত আমি জানিনে, মা!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জগত্তারিণী মনে মনে বলিলেন "তুই জান্‌বি কেমন করে—কুমার! কব্‌রেজ গিন্নীর

শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, এক বেড়ালছানার উপযোগী চারটে চা'ল্ রান্নাঘরের দাওয়ায় ফেলেই খালাস্! কিন্তু বাড়ীতে এতটি লোকের পেট যে এক বিড়ালছানার পেটেরই সমান নয়, সে ধারণা করার ত ওঁর কোনও প্রয়োজন ছিলনা ?

কথা কয়টা ভাবিতে ভাবিতে জগত্তারিণীর মনটা দুঃখে ক্ষোভে ভরিয়া আসিতে লাগিল!—কেন এ নির্ব্বোধটা আসল কথাটা প্রকাশ করিয়া নিজেকে সমর্থন না করিয়া নীরবে ফিরিয়া আসিল! মায়ের এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কুমার বলিল "বাবা না জেনে একটা কথা বলেছেন; তাতে আমি কিছুই মনে করিনে।" দুর্ব্বার আক্রোশে জগত্তারিণী বলিলেন "না জানার অভ্যাসটাত ওঁর চিরকালেরই—এ নিরপেক্ষ-ভাব আর কি এজীবনে যাবে ?

"সে যাক্‌গে মা! কিন্তু বাবা বল্‌লেন আমার আর পড়া-শুনা করে কাজ নেই; পড়া শুনা করতে হলে এতগুলো করে টাকা চাই; সে গুলো আস্‌বে কোথেকে ?"

উত্যক্ত জগত্তারিণী বলিয়া উঠিলেন "তাহলে আর পড়ে কাজ কি ? আর মেলেচ্ছ পড়ার জন্যে তোরই বা এত রোখ কেন বাপু ? তার চাইতে ভটচায্ বামুণ হ'য়ে বস্; টাকাকড়ি খরচেরও বালাই নেই; দিব্যি বাজার-হাট করবে; নেমন্তন্ন খেয়ে ও দু'চার পয়সা রোজগার করতে পারবে!"

মায়ের এই কথাগুলিকে সরলভাবেই সত্য মনে করিয়া কুমারের মনটা বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল! মা তাহার হইয়াই পিতার কাছে ওকালতি করিবেন ইহা সে ভাবিয়াছিল; কিন্তু সহসা মায়ের এ মনোগতিতে আশাভঙ্গের এক গুরু দীর্ঘশ্বাস তাঁহার সারা অন্তর মথিত করিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া আসিল! কিছু কাল নীরবে দাঁড়াইয়া. হতোদ্যমের নিরাশা ভাঙ্গা বুকে চাপিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া গেল!

কুমার যে কখন চলিয়া গিয়াছিল, জগত্তারিণী তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; পূঞ্জীভূত দুর্ভাবনার মধ্যে যেন আজ তাঁহার ভাবনার পরিপূর্ণ-শূন্যতা! নানা দুশ্চিন্তা যখন রাশী-কৃত হইয়া মনোবিপ্লবের সৃষ্টি করে, তখন এই চাঞ্চল্যের মধ্যে কোনও প্রকার ভাবনাই, মনের মাঝে আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে চাহেনা; বায়স্কোপের ফিল্মের মতনই, এক এক করিয়া পরপর ভাসিয়া উঠিয়া তিরোহিত হইয়া যায়।

এইভাবে কিছুকাল চলিয়া যাওয়ার পর, সহসা জগত্তারিণীর চোখে পড়িল, কৃষ্ণপক্ষের ধরণীর তমসাবৃত আকাশের বুকে তারার দেওয়ালী! চকিতে, ছেড়া মহাভারতখানা মাথায় ঠেকা-ইয়া রাখিয়া তিনি দ্রুত ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন! সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবু ঘরে আলো জ্বলে নাই, লক্ষ্মীর আসন, শীতল কিছুই দেওয়া হয় নাই; ইহাতে জগত্তারিণী অবাক্ হইয়া

গেলেন! তাঁহার ধারণা ছিল, কল্যাণী যথাকালে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়াছেন! অন্যদিন হইলে তিনি এই কর্ত্তব্য ভ্রষ্টতায় নিজেই লজ্জিত হইতেন, কেননা আত্মনির্ভরশীল তাঁহার পর-মুখাপেক্ষী হইয়া চলার অভ্যাস কোনও কালেই ছিল না। কিন্তু নানা প্রতিকূল চিন্তায় জগত্তারিণীর মন আজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই প্রদীপ জ্বালাইতে জ্বালাইতে কল্যাণীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন "এ তোমার কেমন আক্কেল ছোট-বৌ! সাঁঝের বেলা, বাতিখানা পর্য্যন্ত না ধরিয়ে শুয়ে পড়েছ! আমি না হয় একটু আলিস্যিই করেছি, তা'বলে কি এটা তোমারও কর্ত্তব্যের বাহিরে!"

কল্যাণী শিয়রের বালিসটা সাম্‌নের দিকে টানিয়া আনিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। অন্যদিন হইলে, কল্যাণীর এই নীরবতায় চঞ্চল হইয়া হয়ত জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিতেন "এমন অসময়ে এম্‌নিভাবে বিছানায় শুয়ে কেন কল্যাণ! কোন অসুখ করেনিত?" কিন্তু আজ কল্যাণীর এ ভাব মোটেই তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল না।

কল্যাণীকে ছোটবেলা হইতে জগত্তারিণীই গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিবার ভার লইয়াছিলেন, তাই কতকটা মায়ের স্নেহেই তাঁহাকে তিনি দেখিতেন! কিন্তু এই কল্যাণীর চরিত্রটা

ছিল যেন এক অদ্ভুত রহস্য! কোনও কিছু মনের মতন না হইলেই, তাঁহার রোগ হইত, আর সেই রোগ তৎক্ষণাৎ দিন কতিপয় শয্যা আশ্রয় করিতেও তাহাকে প্ররোচিত করিত! শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় সর্ব্ব কনিষ্ঠা কল্যাণী বড় ভাইদের একান্ত আদরের পাত্রী হইয়া পড়িয়াছিলেন; সারাদিনের কর্ত্তব্যের মধ্যে তাঁহার ছিল, কোণাঠাসা করিয়া আহার আর অনবরত নিদ্রা। কাজেই, জীবনের ক্রমপরিসরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র মনুষ্যোচিত সৌজন্যে গঠিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই; তাই অষ্টমবর্ষের গৌরী-স্বরূপে যেদিন কল্যাণী জীবনকৃষ্ণের জীবনসঙ্গিনীরূপে নূতন ঘর আলো করিতে আসিলেন, তখন তাঁহার অস্থিসার শ্যাম দেহে যেমন লাবণ্যের অভাব ছিল, তেমনি তাঁহার অত্যধিক আহার হেতু স্ফীতোদরে, পুঞ্জীভূত-ক্রোধ-ঈর্ষা-হিংসা প্রভৃতির চির-স্থায়ী প্রভাবের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যাইত।

—যেদিন কল্যাণী জগৎকিশোরের পরিবারে প্রথম প্রবেশ করিলেন, সেদিন গ্রামের বুড়ী, যুবতী, বালিকা, প্রৌঢ়া, সুশ্রী, সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিল। অবশ্য গ্রামের সবাই কিছু অনিন্দ্য সুন্দরী নহে তা ঠিক্, তবু যেমন গান গাইতে না জানিলেও সঙ্গীতে রসানুভুতি যে হইবে না, এমন কিছু কথা নাই; সেই প্রচলিত নীতি অনুসরণ করিয়া গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা

দেবী

কুৎসিৎ-আখ্যা প্রাপ্ত 'শ্যামা-পিসি'ও বলিতে ছাড়িলেন না ও-মা! কি ঘেন্না গো! এ-কি বৌ ঘরে আন্‌লে ভট্‌চায্‌-গিন্নী!

অঙ্গসৌষ্ঠবেও তরলায়িত লাবণ্যের উচ্ছলতায় এ গ্রামে মুক্ত-কেশীরই একটা অনন্য-সুলভ সৌন্দর্য্য-গৌরব ছিল! যৌবন-নদীতে জোয়ার আসার আগেই স্বামীর আবাস হইতে তাঁহাকে চিরবিদায় লইয়া পিতৃ-গৃহে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল! এবং আজ প্রৌঢ়ত্বের সিংহদ্বারে আসিয়া অবধি সেখানেই বসবাস করিতেছেন! তাহার দৃষ্টিতে একটা চটুল মাদকতা ছিল, আর সচরাচর হিন্দুর বালবিধবার মত তাঁহার প্রকৃতিতে একটা অকাল-পক্বতাও আসিয়া পড়িয়াছিল! তাঁহার মুখের স্বর শরীরের রঙের মতন মোলায়েম ছিল না, আর বিশেষ পর্ব্বাদি ছাড়া পান ও দোক্তার রসে অহরহই তাঁহার ঠোঁট দুখানা রাঙা হইয়া থাকিত! এ-হেন মুক্তকেশী যখন রাজহংস গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সমবয়সীরা স-কৌতুকে গা-টেপা-টেপী করিয়া বলিয়া উঠিল "মুক্তা-দি! আজ তোমার এক জুড়ি এসেছেগা! এ গায়ে সুন্দরী বলে বড় যে তোমার দেমাক!"

মুক্তকেশী কোনও উত্তর করিলেন না, শুধু তাঁহার চটুল চাহনিতে কৌতুকের হাসি ব্যক্ত করিয়া বঙ্কিম ভঙ্গীতে অগ্রসর হইলেন। নববধুকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন

"চমৎকার! এ জিনিসটাকে কোথা হতে আমদানী করলে ভট্‌চায্‌-বৌ!" মন্তব্য শুনিতে শুনিতে জগত্তারিণী এমনই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, গায়ে পড়িয়া মানুষগুলির এ প্রকার অনর্থক দাম্ভিকতায়, তাঁহার স্বাভাবিক ধীরতার মধ্যে একটা কর্কশ অসহিষ্ণুতা আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই তিনি উত্তর করিলেন "ভগবানের সৃষ্টি-থেকেই, কিন্তু কেন বল দেখি বামুণ-গিন্নী!"

"ছোট একটা "এমনি" বলিয়া মুক্তকেশী বিষয়টা সুবিধার নয় ভাবিয়া ক্ষণেক নীরবতা অবলম্বন করিলেন, কেননা এই অতর্কিত উত্তরের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তর্কস্থলে শ্রেষ্ঠ আসনই তাঁহার জন্য সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকিত, সে দাবী তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্যে অবমানিত হওয়ায় মুক্তকেশী নিজকে বড়ই সঙ্কুচিত মনে করিলেন, তাই প্রতিহত দর্প চাপিয়া বিদ্রূপের স্বরে তিনি বলিলেন "যাক্, সুন্দরে আর কিই বা করে দিদি! হাড়্ ক'খানার দামও ত কম নয়!—দেশের সেরা কুলীন!',

জগত্তারিণী লক্ষ্য করিতেছিলেন, এই সকল শ্লেষের মধ্যে নববধূটি লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িতেছিল, তাই তীক্ষ্ণস্বরে তিনি বলিলেন 'তা নয়তো কি? তোমাদের মত ও-ত আর, গোষ্ঠী-গোত্রের পরিচয় ছাড়া হয়ে ভেসে আসেনি'। আভিজাত্যের গর্ব্ব সত্যি-ই ত আছে ওর!"

কুটিল হাসিয়া মুক্তকেশী বলিলেন "তা' বটেইত! তা গাড়া, শুনেছি, কোন্ এক রাজা না মহারাজা নাকি বৌয়ের াপের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন।"

তর্কটাকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে দিতে জগত্তারিণীর ত্তি হইল না, তাই গলার স্বর কোমল করিয়া তিনি লেন "ছোট বেলা থেকে মা-বাপ-হারা বলে; তা' হলে ওর গড়নটা কি এমন খারাপ দিদি? দিন কয়েক াজা ঘসা করেনি,' তখন দেখেনিয়ো, কেমন ওর প!"

"তখন এসে তোমার রাজলক্ষীকে দেখে যাবো; এখন তবে বিদায় হই!" বলিয়া মুক্তকেশী শুষ্ক হাসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন!

তর্কের সময় কল্যাণীর প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতিতে জগত্তারিণীর অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেও, বস্তুতঃই জগ-ত্তারিণী কল্যাণীকে দেখিয়া অবধি তৃপ্তি বোধ করেন াই! —তাই বলিয়া, মাতৃত্বের অনাবিল মমত্বে তাঁহাকে আদরে বরণ করিয়া লইতে কভু কার্পণ্যও করেন নাই! তাঁহার াতি-নিয়ত সস্নেহ পরিচর্য্যায় কল্যাণীর অবয়বের সৌষ্টব দিন ন বৃদ্ধি পাইতেছিল বটে—কিন্তু আবাল্য উচ্ছৃঙ্খলভাবে ড়িয়া উঠা মনের আবর্জ্জনা যেন কিছুতেই দূর হইতেছিল না।

স্নেহ যখন যথার্থ পথে না চলিয়া বিপথগামী হয়, তখন তাহার ফলও ভয়াবহ হয়; এবং ইহার দৃষ্টান্ত আবাল্য অন্ধ স্নেহে প্রতিপালিতা কল্যাণী। যে কোনও অজুহাতে কল্যাণী যখন শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেন, তখন তাহার কোনও রোগ হইয়াছে ভাবিয়া জগত্তারিণী কবিরাজ-বৈদ্য ডাকাইতেন; কিন্তু কোনওরূপ সেবা শুশ্রূষা-তেই কল্যাণীর রোগ সারিত না। অবশেষে সকলেরই ইহা নিরাকরণ করিতে বিলম্ব হইল না যে কল্যাণীর এ রোগ মনের,—দেহের নয়; সময় সময় জগৎকিশোরেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত, কিন্তু জগত্তারিণীর ভয়ে কিছুই উচ্চ-বাচ্য করিতেন না! তাঁহারই অস্বাভাবিক স্নেহেও অত্যধিক প্রশ্রয়ে কল্যাণী মাটি হইয়া যাইতেছেন, গ্রামের অনেকেই এ কথা বলিলেও জগত্তারিণী এই সব অনুযোগ নীরবে উদরস্থ করিতেন।

কিন্তু যে দিন জীবনকৃষ্ণ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য লইয়া 'আসাম' রওয়ানা হইয়াছিলেন, সেদিন রাত্রি-দণ্ড অবধি ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালানো হয় নাই দেখিয়া জগত্তারিণীর শান্তমনও সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন "মেয়েমানুষের এত বাড়াবাড়ি সয় না! বুকের পাটা-

খানাও কি কম ? বাড়ীতে যে আরও দুচারজন কেউ-কেটা আছে, তা যেন আর গেরাহ্যির মধ্যেই আসেনা !"

জগৎকিশোর ঠাকুরদালানে পায়চারি করিতেছিলেন ; এখন সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন "বুকের পাটাখানা তুমিইত তৈরী করেছ বৌ ? ওকে কেউ কিছু বল্‌লে, তুমিইত বাঘের মত চোখ দুটো রাঙ্গা করে তেড়ে আস্‌তে !"

মানুষ স্নেহাস্পদের উপরে বিরূপ হইলে, নিজে তাহাকে শাসন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু, তখন যদি আর কেহ সেই শাসনাধিকার ফলাইতে আসে তাহা হইলে, সে-টা তাহার অসহ্য হয়। উপেক্ষিত স্নেহনিলয়কে সে তখন বুকে জড়াইয়া লইতে অগ্রসর হয় ; তাই জগত্তারিণীও যদিবা কল্যাণীকে খুব কড়াকথা শুনাইতেছিলেন, তথাপি জগৎকিশোরের এ শ্লেষ তাহার সহ্য হইল না ; তিনি বলিলেন "হাঁ, এটা মস্ত ভুলই হয়েছে আমার ! যদি প্রথম থেকেই খুব করে কঠোর শাসন করতুম্ তা হলে বোধ করি ও এত বয়ে যেতোনা।"

হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "সে-টা তোমার আগেই বুঝা উচিত ছিল।" জগৎকিশোরের এ অযাচিত সমর্থন জগত্তারিণীর ভাল লাগিল না ; তাই তীক্ষ্ণভাবে তিনি বলি-লেন "হাঁ, একটা মারাত্মক অপরাধ আমি করে ফেলেছি বটে কেন না, এ পোড়া বাংলায় অনেক জা'-শাশুড়ী ঘরে

আনা নূতন বৌকে শাসন যন্ত্রে নিষ্পেশিত করে, আদব-কায়দা-দুরস্ত করে নিতে প্রয়াশ পান।" তারপরেই মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন "কিন্তু নিজেরও ত সন্ধ্যা-আহ্নিক হয়নি দেখ্‌তে পাচ্ছি! ঠাকুরপো আজ চলে গিয়েছেন বলে ওরও হয়তঃ মনের গতি ভাল নেই! এখান থেকে একটু চলে গেলে হয় না?"

চলিয়া যাইতে যাইতে—জগৎকিশোর বিস্ময়ে বলিলেন "তোমার বুকখানা যে ভগবান্ কি দিয়ে গড়েছেন বৌ! এত দিনেও আমি বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না! আর তোমাকে চেনার সুযোগ হারানোর মত নির্ব্বুদ্ধিতা ওর না হলে স্পর্শমণির সংস্পর্শে এসে অনায়াসে লোহা সোণা হয়ে যেতে পার্‌তো।"

একথা শুনিতে শুনিতে জগত্তারিণীর হাত দুটি অলক্ষ্যে যুগ্ম হইয়া আসিল; ভক্তিভরে তিনি স্বগত বলিলেন "তোমার মত জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে এসে মলিন অঙ্গারও আগের জ্যোতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছে! চাঁদের কি আর নিজের কিছু আছে?—সূর্য্যকে দিয়েইত তার যত আস্পর্দ্ধা! মহৎ আমি না তুমি!"

কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে জগত্তারিণী একটু অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ চমকিত হইয়া শুনিলেন

কল্যাণী ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে "এমন করে, তিল তিল করে না মেরে, একেবারেই গলাটিপে মেরে ফেল্লেইত আপদ চুকে যায়!"

বিস্ময়-স্তম্ভিতা জগত্তারিণীর মনে হইল যেন জগতের বক্ষের উপরে একটা বিরাট্-ভূমিকম্পের তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে —*একান্ত অভিভূতা তিনি ভাবিতে পারিলেন না, এ তাঁহার সুপ্তি না জাগরণ, স্বপ্ন না সত্য!*

এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি কল্যাণী বড় একটা কথাবার্ত্তা বলিত না; তাই আজ হঠাৎ এতবড় একটা অনুচিত অপ্রিয় কথা কেমন করিয়া সে বলিতে পারিল, জগত্তারিণী ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার দৃপ্তক্রোধ অনুশোচনায় পরিণত হইল। দুঃখের সুরে তিনি বল্লিলেন "কি বলিলি কল্যাণ! মেরে ফেল্‌লেই আপদচুকে যায়? তা'ত বল্‌বিই। কিন্তু মরার বাড়া হয়ে যখন এখানে এসেছিলি, তখন কে তোকে মরণের মুখ হতে বাঁচিয়ে এনেছিল?"

"একটুখানি যত্ন আত্তি করে রোজ রোজই সে কথা খোঁচা দেওয়াই যদি অভিপ্রায় ছিল, তা'হলে সেটুকু না কর্‌লেইত হতো।"

"হাঁ, উপকার করে সেটার বড়াই বারবার করার চাইতে, উপকার মোটেই করা যে ভাল নয় তা আমিও

জানি! কিন্তু আমার প্রতি সে ধারণা করার দুর্ম্মতি আজ তোর কোথা হতে হ'লো বোন্?"

"আমার দুর্ম্মতিই ভাল; যার যার সুমতি নিয়ে তাঁরা থাকুন! আমায় মিছামিছি জ্বালিয়ে কা'র কি লাভ হয় বুঝি না!"

কষ্টে হাসিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "তোর জ্বালাটা কিসে হয় জান্‌লে না হয়, একটু বুঝে সুঝে চল্‌তে পারি!" কল্যাণী কিছুই বলিল না, শুধু বালিসে মুখ গুজিয়া ফুঁপাইতে লাগিল! ক্ষণেক নীরব থাকিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "আজ তোর একটা অভিনব মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো কল্যাণ! যদিও এটা অনেকটা সত্যি যে, যারা সর্ব্বদা মুখ বুজে' থাকে, তারা ভিতরে ভিতরে নানাকথার জাল তৈরী করে, তবু তোকে কিন্তু তেমনটি ভাব্‌তে পারিনি!" তারপরে একটু থামিয়া তিনি স্বগতই বলিয়া যাইতে লাগিলেন "লোকে বলে, অকৃত্রিম স্নেহ মানুষকে যত সহজে বশে আন্‌তে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না—কিন্তু এত করেও তোকে বশে আন্‌তে পার্‌লুম না, এই যা দুঃখ!"

ক্রুদ্ধা ফণিণীর ন্যায় কল্যাণী বলিয়া উঠিল "কী এমন করেছেন শুনি? এক জনকে বাঘ ভালুকের মুখে পাহাড় পর্ব্বতের অগম্য জঙ্গলে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছেন, এই-ত?

কথাটার ইঙ্গিত বুঝিয়া সহসা জগত্তারিণী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; ঘৃণার বিতৃষ্ণায় তিনি বলিলেন "তোর স্বামীর পক্ষে তুই যে কত অনুপযুক্ত সে কথা আজ বল্‌তে বাধ্য হলুম কল্যাণ, যেন স্বর্গ আর নরক!"

এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্য জগত্তারিণী চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যাইতে যাইতে শুনিলেন, কল্যাণী বলিতেছে "কেননা, নিজকে সম্পূর্ণ উজাড় করে উচ্ছন্ন *যাওয়ার মতন সু-বুদ্ধি এক জনের ছাড়াত আর কারো দেখা যায় না।"*

জগৎকিশোর ঠাকুরের আরতি করিতে ছিলেন, আর হরিমোহিনী ঠাকুর দালানে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। শীতল দিয়া জগত্তারিণী চলিয়া গেলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া জগৎকিশোর নিজেই বলিতে লাগিলেন "দয়াময়! জানি না তোমার কি ইচ্ছা।"

—:০:—

জগত্তারিণী চলিয়া যাওয়ার পর জীবনকৃষ্ণ ও কল্যাণীর ব্যবহার কুমার ও যোগার প্রতি অস্বাভাবিক রূপে রূঢ় হইয়া পড়িতেছিল !

সকাল বেলা টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল ; যোগাকে মাছ আনিতে বলিয়া জীবনকৃষ্ণ যজমানের বাড়ীতে ৺অন্নপূর্ণা পূজা করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

যোগা বাজারে গিয়া একটা ইলিশ মাছ কিনিয়া ঠক্ করিয়া মাছের ডালার উপরে একটা টাকা ফেলিয়া দিল ! কিন্তু অনেক্ ভিড় হওয়ায় এই টাকার খবর মিলিলনা ; মাছওয়ালী যখন যোগার কাছে পুনরায় টাকা চাহিল, তখন যোগা বলিল টাকাত সে দিয়া দিয়াছে !—সে ফেরত পয়সা চায় !

মাছওয়ালী তখন যোগাকে চোর বদ্মায়েস্-বাট্পাড় ইত্যাদি বলিয়া, অকথ্য গালি দিল, আর হাত হইতে মাছ কাড়িয়া লইল !

ক্রোধে আত্মহারা যোগা, মাছওয়ালীর গালে জোরে এক চড় বসাইয়া দিল ! ইহাতে মাছওয়ালী ও তাহার দলের

লোক গুলো ক্ষেপিয়া যোগাকে মারিবার চেষ্টা করিতেই, প্রাণপণে যোগা ছুটিয়া পালাইল!

মাছ ও কেনা হইল না অথচ টাকাও গেল, এই ভয়ে সারাদিন যোগা কাকার দৃষ্টি এড়াইয়া বাহিরে বাহিরে পালাইয়া রহিল!

বিকালে যজমান হইতে ফিরিয়া আসিয়া, জীবনকৃষ্ণ যখন শুনিলেন—যোগা সেই যে মাছ আনিতে গিয়াছে, আর বাড়ীতে আসে নাই; তখন কতকটা চিন্তায় কতকটা রাগে জীবনকৃষ্ণ খবরে বাহির হইলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "ওগো, শুনেছ, বাছাধনের কীর্ত্তি! জুয়াখেলে, কি মদগাঁজা খেয়ে টাকাটি ত দিয়ে দিয়েছেন উড়িয়ে; তারপরে গিয়েছিলে চুরি কর্‌তে মাছ! ধরা পড়ে খুব উত্তম মধ্যম খেয়ে পালিয়ে আছেন।"

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কল্যাণী বলিলেন "কুলধর্ম্ম কি অত সহজে যায়! আমি কি সাধ করে বলি, তাড়িয়ে দাও ওদের শীগ্‌গির! আজ্‌কে যোগার এ কুক্রিয়াতে তোমার উঁচু মাথা কতখানা হেঁট্ হলো বলত?

দাঁত কড়্‌মড়্ করিতে করিতে জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "বাছাধনকে একবার, হাতের কাছে পেলে হয়; তখন দেখে

নেবো, ওর হাড় আর মাস আলাদা করতে কতক্ষণ লাগে !"

রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে জীবনকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন ; মাসকাবারের দোকানবাকী শোধ করার জন্য দুইখানা দশটাকার নোট খুলিয়াছিলেন, অন্যমনস্কভাবে সেই গুলি, সেই খানেই ফেলিয়া গেলেন !

জীবনকৃষ্ণ চলিয়া যাইবামাত্র, চট্করিয়া কল্যাণী সেই নোট দুইখানি সরাইয়া ফেলিলেন ।

সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া অনেক রাত্রে যখন যোগা চুপি চুপি পাকঘরে খাবার কিছু পাওয়া যায় কিনা এই প্রত্যাশায় ঢুকিল, তখন দেখিল সেখানে আহার্য্যের কণিকা মাত্রও নাই। রাগে-দুঃখে ও ক্ষোভে বাহির হইয়া আসিয়া সে, আপনার শিথিল অঙ্গ শয্যায় এলাইয়া দিল ।

পরদিন ইস্কুলে বসিয়া হঠাৎ নোটগুলির কথা জীবনকৃষ্ণের মনে পড়িল। ইস্কুল ছুটির পর তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া প্রথমে এদিক ওদিক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও নোটগুলি না পাইয়া তিনি কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দুখানা দশটাকার নোট এখানে ফেলে গিয়েছিলুম, তুমি দেখেছ কি ?"

আহত ফণিনীর ন্যায় ফোঁস্ করিয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিলেন "যত দোষ সব আমারই ! গুণধর ভাইপোরা, ধর্ম্মপুত্তুর

যুধিষ্ঠির! আমি কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই; তবু আমারই যত সব অপরাধ!"

এইরূপ একটা ভূমিকার আশঙ্কা করিয়াই জীবনকৃষ্ণ অতি সঙ্কোচের সহিত কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাই মানভঞ্জনের অভিনয় করিতে তাঁহার ক্রোধ শতগুণ হইয়া ধাবিত হইল—যোগার পানে! স্বর পঞ্চমে তুলিয়া তিনি বলিলেন "এ সেই যোগার কাজ, পাঁজিটা গেল কোথা?"

"এখনও বিছানায় পড়ে নাক ডাকানো হচ্ছে।"

দ্রুত ঘরে ঢুকিয়া জীবনকৃষ্ণ তীব্র স্বরে ডাকিলেন "যোগা"!

কাকাকে দেখিয়াই যোগা ভয়ে আধমরা হইয়া গিয়াছিল, কাজেই কোন উত্তর তাহার আড়ষ্ট মুখ দিয়া বাহির হইল না।

"কাল্‌কে যে দুখানা নোট হাত্‌ড়িয়েছ—সে দুখানা নোট দিয়ে দাও ত চাঁদ!"

বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যোগা বলিল "কিসের নোট কাকাবাবু, আমি ত নিই-নি।"

"নেবে কেন, আর পাঁচজন মিথ্যাবাদী, একা তুমিই সত্য-বাদী; দিয়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো নোট দুখানা।"

বলিয়াই হাতের ছড়িটা দিয়া জীবনকৃষ্ণ যোগার মুক্তপৃষ্ঠে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন; যতই যোগা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের নিরপরাধিতা প্রমাণ করিতে যায়, তত

জীবনকৃষ্ণের উন্মাদক্রোধ দ্বিগুণ আক্রোশে যোগার উপরে আসিয়া পড়ে!

ক্রোধে জীবনকৃষ্ণ এমনই দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, লাঠির আঘাতে যোগার সমস্ত দেহকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই যোগাকে ষ্টেশনে আনিয়া দেশের টিকিট করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন! পৌষের দারুণ শীতে, একবস্ত্রে, প্রহারজনিত রক্তরঞ্জিত দেহে—সারাদিনের বুভুক্ষায় কাতর নিরাশ্রয় যোগা বিড়ম্বিত জীবন লইয়া মায়ের বুকে আশ্রয়ের আশায় চলিল।

জগত্তারিণী দেশে ফিরিয়া নানা অবান্তর কথার ছলনায়, পাড়াপড়্‌শীর ঔৎসুক্য নিরসন করিলেন, কেবল, যথার্থ কথা জানিতে পারিলেন—হরিমোহিনী আর জগৎকিশোর।

হরিমোহিনী সব কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু জগৎ-কিশোরের প্রশান্ত মনে এই সকল ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা বিন্দুমাত্রও আঘাত করিতে পারিল না। নির্ব্বিকারভাবে তিনি বলিলেন "দুঃখ করোনা বউ! সংসারে সবদিনই কি আর সমান যায়? জীবনের এ পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য হবারও কিছুই নেই;—তার এখন ছেলেপিলে হতে আরম্ভ করেছে, এখন আর নিঃস্বার্থ ভাবে, আপনাকে বিলয়ে দিলে চল্‌বে কেন?" তাহার পর উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমরাই কি কম

স্বার্থপর? পরিবার শুদ্ধ সকলের দুর্ব্বহ জীবনভার, একজনের উপর চাপিয়ে দিয়েছি; আর তার একটু মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে কি, তাকে নীচ, হৃদয়হীন ইত্যাদি বলে গাল দিচ্ছি।"

জগত্তারিণী এই সব সান্ত্বনার কথা শুনিতেন বটে, কিন্তু সোয়াস্তি পাইতেন বলিয়া বোধ হইত না; কেননা ঘরে অহরহই "অন্নচিন্তা চমৎকার!"

আগে মাঝে মাঝে জীবনকৃষ্ণ দুইদশ টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু জগত্তারিণী ফিরিয়া আসিয়াছেন অবধি, ইহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া প্রথম প্রথম তিনি নিজে মিনতি করিয়া পত্র দিয়াছেন—উত্তর না পাইয়া স্বামীকে দিয়া দেওয়াইয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

মহেন্দ্রনাথ পায়ে একটা বাতের ব্যথায় দিন পাঁচ-সাত ভুগিয়া একটু ভাল হইয়া যখন, জগৎকিশোরের বাড়ীর সংবাদ লইতে আসিলেন, তখন দেখিলেন, সেদিন জগৎকিশোর পর্য্যন্ত নিরম্বু না হইলেও, নিরন্ন হরিবাসর করিতেছেন!

সে বছর ভয়ানক 'অজন্মা'। গ্রামের সকলেরই কষ্টে দিন কাটিতেছে। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া অনেক দিনই ঘুরিয়াছেন বলিয়া আজ সার্ব্বজনীন এই হরিবাসরের দিনে যাচ্ঞায় জগত্তারিণীর চরণ কিছুতেই চলিতে চাহিতেছিল না।

দুঃখে হৌক্, কষ্টে হৌক্, এতদিন অন্ততঃ রাধানাথের

ভোগ বাদ পড়ে নাই—অশীতি পর বৃদ্ধ. জগৎকিশোর অন্নলাভে বঞ্চিত হন নাই—কিন্তু তাঁহাদেরও আজ অনশনব্রত !

অনেকক্ষণ দিবা অবসান হইয়াছে, ধরণীর গায়ে শুক্লা তিথির শুভ্র জ্যোৎস্না তরলায়িত স্বর্ণের শ্রীতে আলিপনা আঁকিয়া দিয়াছে !

ঠাকুরের আরতি শেষ করিয়া, জগৎকিশোর অনুচ্চস্বরে স্তোত্র গান করিতে করিতে ডাকিলেন "চারু" !

সকাল থেকেই সকলকে নির্ব্বাক্-গম্ভীর লক্ষ্য করায়, চারুর কেমনতর ঠেকিতেছিল ! ইহার কারণ সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতে ছিল না ; তদুপরি, সারাদিনের মধ্যে কাহারও আহারাদি হয় নাই—দেখিয়া সে আরও বিস্মিত হইয়া ছিল !

সন্ধ্যা হয় হয় সময় ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সে মাকে বলিল "আজ খাবোনা মা ? বড্ড যে ক্ষুধা পেয়েছে !"

ঘরে এমন কিছুই ছিল না, যাহা দিয়া এই শিশুকন্যার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারেন ; তাই দৃঢ়ভাবে বুক চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন—

"না মা, আজ খেতে নেই ; কাল তোমার মানসিক, মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হবে কিনা, তাই আজ উপোস দিতে হয় !"

সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে মায়ের এ ছলনার বাণী চারু পরিপূর্ণ সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া যখন উপবাসের তীব্রতাকে দমন করিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাঁহার বাবার স্নেহময় ডাক শুনিয়া জবাব দিল "কেন বাবা" ?

"এদিকে আয় ত মা ; ঠাকুরের নৈবিদ্যি নিবি আয় ।"

"মা যে বল্‌লে আজ কিছুই খেতে নেই-বাবা ?"

"কেন রে ?"

"কাল নাকি আমার মানসিক পূজা হবে !"

শুধু গুড় দিয়া গোটাকয়েক চাউল মাখিতে মাখিতে জগৎ-কিশোর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি ভাবিলেন ; তারপর বলিলেন "তা ঠিক, তবে ঠাকুরের পেসাদ খেলে, কোনও পাপ হয়না-মা !"

অবাক্ হইয়া চারু বলিল "তাই নাকি বাবা, তবে দিন, বড্ড ক্ষিধেটাই পেয়েছে ।"

'কণিকামাত্র' প্রসাদ খাইতে খাইতে, চারু বলিল "কাকা-বাবু, কাকীমা কেন আসেনা বাবা ? কাল্‌কে পূজোতেও কি তারা আস্‌বে না ? বীণার কাকীমা ত ফিবছরেই পূজোর বাড়ী আসে !"

সরল বালিকার এ সরল প্রশ্নের জবাব দিতে ভাঙ্গাস্বরে জগৎকিশোর বলিলেন "তাদের আস্‌তে হলে যে অনেক

টাকার দরকার মা! আমাদের ত অত টাকা নেই। বীণার যে ধনী; তার বাবা অনেক টাকা পায়!"

"কত টাকার দরকার বাবা?"

"সে অনেক টাকার মা?"

"পাঠিয়ে দাও না; তা'হলেই ত তারা এসে যেতে পারেন সে জায়গা ভারি বিচ্ছিরি! সেখানে কাকীমার শরীর একদিনও ভাল থাকে না।"

সরলা বালিকার এসব ... য় ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয় যাইতেছিল, তাই জগৎকিশো... তাড়াতাড়ি বলিলেন "যাত মা, তোর হরিদি'কে পেসাদ নিতে ... ক দে?"

হরিমোহিনী আসিলে, জগ... শোর বলিলেন "আমাদের এ সংসারে এসে অবধি তোমার ... খের অবধি নেই, হরি-মোহিনি!"

"আপনি কেন অমন কথা বলছে... আপনার মত গুরুর শ্রীচরণ প্রান্তে নিরন্তর বাসের সুযো... চ্ছি; এছাড়া আমার ইহজগতে আর অধিক কি কামনার ... তে পারে?"

হাসিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "তা'ত জানি হরিমোহিনী! স্বামীর ভিটা ছেড়ে এসে আমার স্ত্রীপুত্র পরিবারের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হয়েছ—এর চেয়ে আর কামনার বস্তু কি থাকতে পারে তাকি আর জানি না?"

"আপনি মিছিমিছি-ভেবে ভেবে মনটাকে অবসন্ন করবেন না!"

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "এ জীবনের যত ক্লেশ, তা গত জীবনের কৃতকর্ম্মের ফল! আর এ জীবন ভরে যে স্তুপীকৃত স্বার্থপরতা—জন্মান্তরে তার জন্তে আমায় প্রস্তুত হয়েই থাক্‌তে হবে—হরিমোহিনি!"

এমন সময়ে জ্যোৎস্নায় অদূরে কাহার ছায়া লক্ষ্য করিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "দেখ্ ত, হরিমোহিনী, ঐ কে আস্‌ছে।"

অগ্রসর হইয়া হরিমোহিনী যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ে তিনি একেবারে কাঠ হইয়া গেলেন! এমন সময়ে যোগা-ঠাকুরকুমার আসাম হইতে কেমন করিয়া আসিলেন?

যোগা ত্রস্তে অগ্রসর হইয়া পিতার পায়ে প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল!

"কেরে যোগা তুই?"

"হ্যাঁ বাবা আমিই।"

স্বামী-কন্যাকে অভুক্ত রাখিয়া জগত্তারিণী অবসন্নমনে বারান্দায় মাটীর উপর শুইয়া রহিয়াছিলেন; যোগা আসিয়াছে শুনিয়া নিজের শ্লথদেহ খানা সবলে টানিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন; মাকে আসিতে দেখিয়াই, কাঁদিয়া যোগা তাঁহার কোলে ঝাপাইয়া পড়িল।

অধীর উৎকণ্ঠায় জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কল্যাণ-কুমার-তোর কাকা—সব ভাল ত রে? তুই হঠাৎ চলে এলি কেন রে?"

বাসার মঙ্গলাদি বিজ্ঞাপন করিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া যোগা সংক্ষেপে উত্তর করিল "কাকা, আমায় মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে মা!"

"কি-করেছিলি তুই?"

"কিছুই আমি করিনি মা; শুধু শুধু কাকা আমায় মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে!"

বাধা দিয়া হরিমোহিনী কহিলেন, "এখন ও সব কথা থাক, মা-ঠাকরুণ! ওঁর হয়ত দু'দিনের মধ্যে কিছুই পেটে পড়ে নাই!"

এই কথায় জগত্তারিণীর দেহ ভূমিকম্পের ধরণীর মতন কাঁপিয়া উঠিল; মাথাটাকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া, যোগার উপরে ভর করিয়া তিনি সহসা বসিয়া পড়িলেন।

ঘরে যে কিছুই ছিল না, এ খবরও হরিমোহিনী রাখিতেন, তবু অসতর্কে কথাটা তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল! জগত্তারিণী যখন এভাবে বসিয়া পড়িলেন, তখন লজ্জায় তাঁহার মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার অবস্থা হইল!

মাসেক কাল কবরেজী তৈল ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া তবে যোগার গায়ের মারের দাগ কতকটা কমিল! ব্যাপারটা যোগার নিকট হইতে শুনিতে পাইয়া, জগৎকিশোর অনুজের প্রতি কখনও কখনও কটু কাটব্য প্রয়োগ করিলেও, একদিনের তরেও জগত্তারিণীর চিত্তে অসহিষ্ণু ভাব প্রকাশ পাইল না!

চতুর্দ্দিক দিয়া ঘনীভূত নানা দুশ্চিন্তায় জগৎকিশেরারে বার্দ্ধক্য-জীর্ণ দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতদিন জগ-ত্তারিণীর সুপরিচর্য্যায়, আর অসীম যত্নে, জগৎকিশোর নিজে অর্থাভাব অনুভব করিলেও, অন্ততঃ অন্নাভাব অনুভব করেন নাই; কিন্তু জগত্তারিণী ও আর যে পারেন না!—তিনিও এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়!"

দুর্দ্দিন যখন আসে তখন একা আসে না! তাই জগৎ-কিশোরের পরিবারের দুর্ব্বার অন্নকৃচ্ছ্র তাকে উপলক্ষ্য করিয়া আরও নানা দুর্দ্দৈব দেখা দিল!

কৌলিন্যের মোহে ঃভ্রান্ত হইয়া জগৎকিশোর নিজের বড় মেয়ে অন্নপূর্ণাকে বিবাহ দিয়াছিলেন, এখন সে তাহার একমাত্র

শিশুকন্যাসহ কি যাতনা যে পাইতেছিল, ইহা পিতামাতার জ্ঞানের অগোচর না রহিলেও নিরুপায় তাঁহারা মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেন।

অনুর স্বামীর তিনকুলে আর কেউ ছিল না; এবং উচ্চ বংশে জন্মিলেও, সংসর্গ দোষে চরিত্র হইয়াছিল কলুষিত! যাত্রার দলে বাঁয়াতবলা ঠুকিয়া—গাঁজা-ভাঙ্গ-চরশে সারাদিন মশগুল হইয়া থাকাই ছিল তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম! এই সকল কু-প্রয়োজন সিদ্ধির অর্থের জন্য পত্নীর উপরে সে অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হইত না; নিরুপায় অন্নপূর্ণা নীরবে সমস্ত সহিয়া যাইত! দুঃখের অশ্রু তাহার ছিন্ন অঞ্চলের অন্তরালে আত্ম গোপন করিত।

যে রাত্রে কাকা কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া যোগা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল, ইহার দিন কয়েক পরে সন্ধ্যায় অন্নপূর্ণার স্বামী তাহার কাছে আসিয়া বায়না ধরিল "আমার একটা টাকার বড্ড দরকার! না হলেই নয়! ছত্রিশগড়ের জমীদার বসন্তবাবুর মেয়ের বিয়ে! কল্‌কাতা থেকে রাণী সুন্দরী এসেছে; ভারি সুন্দর নাচ গান!"

ব্যাকুল দৃষ্টি স্বামীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া অন্নপূর্ণা বলিল "আমি যে একেবারে রিক্তহস্ত, তাও কি তোমার জানা নেই?"

"ও সব কথা আমি শুন্‌ছিনে; একটা টাকা আমায় চাই-ই চাই!"

কাতরস্বরে অন্নপূর্ণা বলিল "স্বামী দেবতা-গুরু! তাঁর কাছে মিথ্যে বল্‌বো এও কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

অনেক অনুরোধ উপরোধেও যখন কোনও ফল হইল না, তখন মেয়েটার গলার সোণার কবচটা ছিনাইয়া লইয়া সীতানাথ ছুটিয়া পলাইয়া গেল! কবচটি হরিমোহিনী এক সন্ন্যাসীর কাছ হইতে—মেয়ের কল্যাণের জন্য গড়াইয়া দিয়াছিলেন; বহু বিপদে—যৎপরোনাস্তি যাতনায় পড়িয়াও অন্নপূর্ণা ইহা বিক্রয় বা বন্ধক রাখে নাই! আজ স্বামীর এই ব্যবহারে আর কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহার সমস্ত শরীর ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

—শেষরাত্রে ভয়ানক ঝড় উঠিল! ঝড়োহাওয়ায় ভাঙ্গা কুঁড়েখানি নৌকার মত দুলিতেছে দেখিয়া, ভীতা অন্নপূর্ণা একমাত্র ধন আপনার কন্যাকে বক্ষে জড়াইয়া বাহির হইয়া আসিবামাত্র ধপ্‌ করিয়া ঘরখানি ধরাশায়ী হইল। বাহিরের ঝড়-জলে অন্নপূর্ণার গায়ের রক্ত প্রায় জমাট্‌ বাঁধিয়া যাইতেছিল। সে পরিধেয় ছিন্নবস্ত্রের অর্দ্ধেক দিয়া মেয়েকে আবৃত করিয়া পতিত কুঠীরের এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনও মতে রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া জগত্তারিণী অন্নুর সংবাদ লইবার জন্য যোগাকে পাঠাইলেন। রাস্তায় আসিতে আসিতে যখন যোগা শুনিতে পাইল, মুসলমান পাড়ায়, কাল রাত্রে বজ্রাঘাতে দুইটি লোক মারা গিয়াছে, তখন অন্নপূর্ণার কথা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়া অদম্য উৎসাহে মুসলমান পাড়ার দিকে ধাবিত হইল!—বজ্রাঘাতে লোক কেমন করিয়া মরে সে দেখে নাই—আজ সেটা তার দেখা চাই-ই!

দুপুর অতীত প্রায় তবু যোগার কোনও খবর নাই; অন্নপূর্ণারই বা কি অবস্থা, ইহা জানিতে না পারায়, অধীর উৎকণ্ঠায় জগত্তারিণী কেবলই ঘর-বাহির করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন—ক্ষীণ মলিন-বসনা অন্নপূর্ণাকে পিছনে করিয়া মহেন্দ্র মন্থরগতিতে আসিতেছে!

"এই নাও বৌ-ঠান; তোমার মেয়েকে, আজ তোমাদের আভিজাত্য প্রিয়তার সাক্ষী দেওয়াবার জন্যে নিয়ে এলুম!"

"দোষারোপ বৃথাই করছো মহেন্দ্র—যার যার অদৃষ্ট খণ্ডন করে কে?—কিন্তু এখন বিষয়টি কি বলত? যোগা হতচ্ছড়াটাই বা গেল কোথায়?"

মহেন্দ্র পূর্ব্বদিনকার কথাগুলি বলিয়া যাইতে উদ্যত হইবা-মাত্র, চোখে পড়িল—অদূরে রোগশয্যায় শয়ান জগৎকিশোর মহেন্দ্রকে সে দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন!

মহেন্দ্র আসিলে ক্ষীণকণ্ঠে জগৎকিশোর বলিলেন "এখন উপায় কি মহেন্দ্র ?"

মহেন্দ্র উত্তর করিলেন "উপায় ? আপনিইত বলেছেন দাদা! উপায় ভগবান্।"

"তাত বুঝি ; কিন্তু আর যে বিশ্বাস রাখতে পারিনে ভাই! তরী যে ক্রমশঃ ভারী হয়ে মাঝ দরিয়াই ডুব্‌তে চল্‌ল!"

মহেন্দ্রের বাচাল স্বভাব ও আজ যে নিতান্ত পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল ; প্রবোধ দেওয়ার কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া, তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন! জগৎকিশোর বলিয়া যাইতে লাগিলেন "যত দিন নিজে অল্পবিস্তর উপার্জ্জন করেছি, ততদিন জীবন ও প্রাণ দিয়ে আমায় ভালবেসেছে—আজ অথর্ব্ব-বৃদ্ধ অক্ষম আমার প্রতি সে এমন নির্দ্দয় হয়েছে কেন বল্‌তে পার মহেন্দ্র ?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন "কাণা ছেলের পদ্মলোচন নাম! হায়রে! অন্নপূর্ণা মা আমার আজ, অন্নের কাঙ্গাল!—আর অন্নের আশায় ছুটে এসেছে কোথায় ? ততোধিক কাঙ্গাল তার পিতার কাছে!—একবার বৌকে ডাকত মহেন্দ্র ?"

জগত্তারিণী নিকটেই ছিলেন—বলিলেন "কেন ডাক্‌ছ ?"

"কেন ডাক্‌ছি ?—না, থাক্!"

"আজ তুমি ওমন কচ্চ্ছ কেন? কি হয়েছে বলই না!"

"বল্‌বো? তবে শোন; ঘরে যদি কিছু থাকে তবে অনুকে দাও; কালও হয়ত ওর পেটে কিছুই পড়েনি!—ঘরে যে নেই কিছুই তা কি আর জানিনে—তবু বল্‌ছি!"—না বলে পার্‌ছিনে! আহা-হা! মা আমার—ঐ ছেড়া কাপড়ের আব্রুর ভেতরে ওর গায়ের হাড় ক'খানা আমার মত বুড়োরও যে স্বচ্ছন্দে গুণে নিতে মোটে কষ্ট হচ্ছে না!"

পিতাকে বেশী রকম উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া, অন্নপূর্ণা বলিল "আপনি অত অধীর হবেন না বাবা! মা আমাদের জন্য ভাত চড়িয়েছেন।"

"ভাত চড়িয়েছে? চা'ল কোথায় পেল রে!"

"কি জানি বাবা, বোধ হয়, মহেন্দ্র কাকা এনে দিয়েছেন!"

'মহেন্দ্র? হাঁ, আমাদের বড় সৌভাগ্য অনু! যে ভগবান্ এ দেবতাকে স্বর্গে না রেখে মর্ত্ত্যে এনে দিয়েছেন!"

দুই দিনের দুঃসহ অন্নক্লেশ দেখিয়া মহেন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না; নিজের পত্নীর সোণার পাত মোড়া তামার চুড়ী জোড়া বাঁধা দিয়া, মাত্র পাঁচটী টাকা আনিয়া জগত্তারিণীর হাতে দিলেন; স্বামী-পুত্রসহ বুভুক্ষার তাড়নায় বিব্রতা জগত্তারিণী আজ মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসাও করিলেন না, এ টাকা কিসের

জন্য—হাত বাড়াইয়া নীরবে, ইহা গ্রহণ করিয়া লইলেন! কিন্তু এ যৎসামান্য অর্থ, সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ!

ইদানীং জগৎকিশোর প্রাতঃস্নান করিয়া ঠাকুর পূজা করিতে পারিতেন না; বার্দ্ধক্যের রুগ্নতা আর মানসিক বৈকল্য তাঁহাকে একেবারে অথর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছিল!

ভোরের সূর্য্যালোকে দেহ রাখিয়া তিনি বসিয়াছিলেন—অন্নপূর্ণা তাঁহার হাত-পা টিপিয়া দিতেছিল! ক্ষণকাল পরে ক্ষীণস্বরে জগৎকিশোর বলিলেন "অনু, তোর মাকে একটিবার ডেকেদে-তরে।"

জগত্তারিণীর বহু আদরের একখানা পাটের কাপড় ছিল, আজ নাত্‌নীটির দুধের যোগাড় করিবার জন্য, ঐ কাপড়খানা বিক্রী করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় স্বামীর আহবান আসিল!

জগৎকিশোর আস্তে আস্তে বলিলেন "তোমায় কত বল্‌লুম বৌ, যে জীবনকে একখানা পত্র দাও, অন্যায় আমার হলেও তার পায়ে ধর্‌ছি! আমি অগ্রজ তাহার; আমার ত দিন ফুরিয়ে এসেছে; আমায় খাবার না দিক, অন্ততঃ আমার স্ত্রী-পুত্রাদি যেন উপবাসে না মরে!

"তোমার-ত আর বিশ্বাস হয় না; চিঠি কি আমি কম দিয়েছি?"

"কুমারই বা কেমন ছেলে—পিতামাতার এ কষ্ট নিষ্ঠুরভাবে সয়ে যাচ্ছে!"

"তার কি এখনও অতশত বুদ্ধি হয়েছে! আর সে-ত পড়া-অন্ত প্রাণ; সারাদিন পড়া নিয়েই আছে!"

"একটা চাকুরীতে ঢুকে পড়ুক না; আর কেন?"

"আজ কাল্‌কার বাজারে চাকুরীর যে অবস্থা! চাকুরী দেবেই বা কে; আর ওপড়াতে কি চাকুরীই বা হবে?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জগৎকিশোর বলিলেন "অনু; দোয়াতকলমটা দেত মা; আমিই একখানা চিঠি জীবনকে দেই।"

পিতার কথায় অন্নপূর্ণা দোয়াত কলম লইয়া আসিল, কিন্তু হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া জগৎকিশোর বলিলেন "রেখে দে দোয়াত কলম; কিছু লিখ্‌তে হবে না!" তার পরেই ক্ষীণস্বরে বলিলেন "আমায় ধরতো বৌ, শরীরটা বড্ড কেমন-কেমন কর্চ্ছে!" বলিতে বলিতেই জগৎকিশোর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন! এই সংজ্ঞাহীনতাই তাহার ইহলীলার শেষ!

ভোরে ঠাকুর পূজা করিয়া যোগা খাবার কিছু না পাওয়ায় রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল; বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া এবাড়ীর লিচু ওবাড়ীর কাঁচা পেয়ারা চিবাইয়া দুপুরে যখন বাড়ী ফিরিল তখন মৃত্যুকালেও পিতাকে দেখিতে

পাইল না—এ আক্ষেপে সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল! হায়রে! যদি মায়ের উপর রাগ করিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া না যাইত!

(২৮)

কুমারের সেবার বি-এ পরীক্ষা! সকালে স্নানাহার করিয়া পরীক্ষা দিতে চলিয়াছে, এমন সময় তার পাইল, পিতা অন্তিম শয্যায়, দেখিবার ইচ্ছা হইলে অনতিবিলম্বে আসিতে।

কুমারের সমস্যা চরম হইল। এদিকে পরীক্ষা; ওদিকে কাকার মনের যা অবস্থা, তাতে ভাড়ার টাকার সংস্থান হওয়াও দুষ্কর।

যাহা হউক তার খানা কাকাকে দেখাইয়া অসঙ্কোচে বলিল "ভাড়ার দরুণ কয়েকটা টাকা না দিলে ত হবে না কাকা বাবু; বাবার শরীর বিশেষ অসুস্থ না হলে কিছুতেই তার আস্‌তো না!"

মুখ বিকৃত করিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "আমার কাছে ও আর টাকার গাছ নেই যে—পেড়ে নিলেই হবে?"

"কিন্তু—

বাধা দিয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন—"কিন্তু টিন্তু এতে নেই বাপু, সোজা কথা টাকা দিতে পারবো না—কেন, বাপের অসুখ—হেটে গেলেই ত পার!"

ব্যথাহত নির্ব্বাক কুমার ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। তারপর, দুঃখের অশ্রুজল সঙ্গোপনে মুছিয়া রওয়ানা হইল সে পদব্রজেই; কিন্তু পাহাড় পর্ব্বতের অগম্যতার ভিতর দিয়া সুদূরের পথ অতিক্রম করিয়া যখন অবসন্ন সে বাড়ী পৌঁছিল তাহার আগেই পিতার পূত অন্তরাত্মা দিবাধামে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।

মহেন্দ্রের পরামর্শ অনুসারে, কুমার কাকার কাছে চিঠি লিখিল "পিতার স্বর্গ হয়েছে; আপনি অবশ্য অবশ্য আসবেন। নিতান্ত আসতে না পারলে টাকা পাঠাবেন; নতুবা বাড়ী বাঁধা পড়্‌বে।"

উত্তরে জীবনকৃষ্ণ লিখিলেন "টাকা পয়সা আমার হাতে এখন নেই! বাড়ী বাঁধা দিতে হলে অর্দ্ধেক অংশ বাদ দিয়ে যেন দেওয়া হয়—ইত্যাদি!"

পত্র পড়িয়া ব্যথিত স্বরে কুমার বলিল, "মা!"

"কি বাবা?"

"কাকা লিখেছেন, টাকা তিনি পাঠাতে পারবেন না, আর বাড়ী বন্ধক দিতে হলে, তাঁর অংশ যেন বাদ দিয়ে হয়!"

"সে আমি আগে থেকেই জানি, এর জন্য আক্ষেপ কেন বাবা! তিনি স্বর্গে গেছেন; সেখান থেকে আমাদের অক্ষমতা দেখে নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা কর্‌বেন!"

কুমার আর কিছুই বলিল না, পিতার পারত্রিক কার্য্যটি কি করিয়া করিবে এই ভাবনাই তাহার মনকে অবসন্ন করিয়া তুলিল!

যাহা হউক, শিষ্য-সেবকের সহায় সহযোগিতায়, কোনরূপে পিতার শ্রাদ্ধাদি সংক্ষেপে সমাপন করিয়া একদিন সন্ধ্যা-বেলা কুমার মাকে বলিল "মা! আদমপুরের মাইনর ইস্কুলে একটা মাষ্টারী খালি হয়েছে—বেতন টাকা পঁচিশেক! তুমি যদি বলত দরখাস্ত করি!"

"সাংসারিক অবস্থা যেমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে একটা কিছু না কর্‌লে আর চলে কৈ? কিন্তু সেদিন তুই না বলে-ছিলি, এবারেও তোর এগ্‌জামিন দেওয়া হলোনা; আস্‌ছে বার, একজামিন দিলে বি-এ টা পাশ করে ফেল্‌বি! চাকুরিতে ঢুক্‌লে তা'ত আর হবে না!"

"থাক্‌গে মা; যা বরাতে আছে তাই হবে, তোমাদের কষ্ট আর সইতে পারি না!"

"তা হবেনা বাবা, উনি স্বর্গে গেছেন বলে, তোর লেখাপড়ার অদম্য উৎসাহে আমি কিছুতেই অন্তরায় হবনা।

আমি যেমন করে পারি চালিয়ে নেব—তুই ঐ গজামিনটা দিয়ে আয়।"

"কেমন করে তোমার চল্‌বে মা! তাইত ভাব্‌না; যোগা আছে' চারু আছে; অনুদির যা অবস্থা তাকেও না দেখ্‌লে চলে কৈ!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "সেদিন সুধাংশু বলে বেড়াচ্ছিল—একটা চর্‌কা চালাতে পার্‌লে, অন্ততঃ পরিবারের চার্‌টি প্রাণীর অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ঘুচে যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে আমাদের একটা চর্‌কা কিনে দে, আমি ত এখন সারাদিনই অবসর; আর অনুও এখানে আছে, দু'জনে মিলে বেশ বসে বসে সূতো কাট্‌বো।"

উৎসাহের সহিত কুমার বলিল "এ যদি করতে পার মা, তবে আর চিন্তা কি? দেশের নেতা যাঁরা, তাঁরা সবাই এক-বাক্যে বল্‌ছেন, ঘরে ঘরে চর্‌কা চল্‌লে, আর এ দুরবস্থা ভোগ করতে হবে না। বাস্তবিক নগ্নতার লজ্জা নিবারণের জন্যও যাদের পরের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে হয়, তাদের মতন অভিশপ্ত আর কে আছে মা!"

জগত্তারিণী কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর কুমার অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিল "ভারতবর্ষে কেবল

মেয়েরাই যদি সূতা কাটেন, মা ; তবেই কোটি কোটি টাকা বিদেশীর হাত থেকে অব্যাহতি পায় !"

হাসিয়া জগত্তারিণী বলিলেন "কোটী কোটী টাকা ছেড়ে দে, অন্ততঃ আমাদের পেটের ভাতটা কোনও মতে চলে গেলেই ঢের হলো।"

কুমার ধীরে ধীরে বলিল "যদি চরকাই চালাতে ইচ্ছে কর মা, তাহলে ধার করে একখানা তাঁতও কিনে দিই !

"তাই দিস্ বাবা ! কিন্তু তাঁত চালাতে পার্‌বো ত ? কোনও দিনও যে চালাই নি !"

"তা পারবে মা ; ও বিশেষ কিছু কঠিন নয় ; এক দু'দিন একটু দেখে নিলেই হবে !

কুমারের পড়াশুনা করিবার মনোবেগ এত প্রবল ছিল যে, এ বিষয়ে যখন সে হতাশ হইতেছিল, তখন সহসা এ নূতন পন্থা ভগবানেরই আশীর্ব্বাদ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহার একটা আত্মপ্রসাদ বোধ হইতেছিল।

কিন্তু একটু পরেই যখন কাকীমার কথা মনে হইল, তখন কুমার কাতর স্বরে বলিল "কিন্তু আমার যে গৌহাটী যাওয়ারও পথ বন্ধ মা !"

আশ্চর্য্যের সহিত জগত্তারিণী বলিলেন "কেন রে।"

আস্‌বার সময় কাকীমা বলেদিয়েছেন "আর যেন সেমুখো না হই !"

"ওর কথা কি ধরতে আছে ; কল্যাণ এখনও ছেলে মানুষ !"

"কিন্তু কাকা এখন সবকিছু কাকীমার যুক্তি নিয়েই ত করেন মা !"

"তা" করুন ! এখন ওসব কথা রেখে আয় ত খেতে— ভাত গুলো একেবারে হিম হতে চল্‌লো ।"

হাসিয়া কুমার বলিল "আমিত এসেই আছি মা ! দাওনা !"

(২৯)

সংসারের যথার্থ দায়িত্ব এই প্রথম নিজের উপরে পড়ায়— কুমার একটু বিব্রত হইয়াছিল ; দেশে উপার্জ্জনেরও অন্য কোন পন্থা ছিল না ; তাই, মায়ের পরামর্শে [illegible]র টার করিয়া একটা চরকা ও একখানা তাঁত কিনিয়া ফেলিল !

জগত্তারিণী ও অন্নপূর্ণা মাসেক কাল এক তাঁতীর কাছে খদ্দরের কাপড় বোনা শিখিয়া, এখন নিজেরাই বুনিতে

আরম্ভ করিলেন; কুমার সেই কাপড় বিক্রী করিবার জন্য হাটে বাজারে ঘুরিত! অনেকে দেখিয়া নাক সিঁটকাইতেন—অনেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু সরল কুমার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিত না!

সেদিন রবিবারের বড় বাজার! কুমার তাড়াতাড়ি কয়েক খানা কাপড় হাতে করিয়া দ্রুত যাইতেছিল; এমন সময় মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া—নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—আঁচাইতে আঁচাইতে ডাকিলেন—"ওহে কুমার, ও কুমার; ওহে ও কুমার বাবু!"

বিরক্তির ভাবটা মনে চাপিয়া রাখিয়া, কুমার ফিরিয়া বলিল "কেন ডাক্‌ছেন, ভট্‌চায মশায়?"

"আরে শোনোই না হে! আজকাল্‌কার ছেলেগুলোই এ রকম; কাউকে যদি মান্যতা মাত্র থাকে!"

বিনীতভাবে কুমার বলিল—

"তা' নয় ভট্‌চায মশায়! হাটের বেলা চলে যাচ্ছে বলেই তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, নইলে কাপড় বিকুবেনা, আর কাপড় না বিকুলে আমাদের উপোস কর্‌তে হবে!"

"তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি; ম্লেচ্ছ শিক্ষাটা তোমাদের একেবারে আত্মসম্মান জ্ঞানহীন করে তুলেছে কেন বলত?

"কিসে তার প্রমাণ পেলেন, ভট্‌চায মশায় ?"

"প্রমাণ কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় বাপু! কতবড় বংশের ছেলে তুমি!—আর আজ কিনা তুমি সুরু করেছ কাপড় বিক্রী!"

হাসিয়া কুমার বলিল "এ ব্যবসা ত কেবল আমি করছিনে, ভট্‌চায্ মশায়; দেশের বড় বড় লোক অনেকেই ত এ ব্যবসা সুরু করেছেন।"

চটিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন "কারা বড়লোক হে ছোক্‌রা? যারা চর্‌কা-তাঁত-খদ্দর করে চীৎকার করছে, তাদের কেউ বৈদ্য, কেউ বেণে, কেউ শূদ্র—কুলীন ব্রাহ্মণ তাদের মাঝে ক'টি আছে হে?"

"তিলকের নাম শুনেছেন বোধ করি!"

"হোক্ গে ওসব ওদের দেশের! আমাদের বাংলার স্মৃতিতে ওসব অনাছিষ্টির ব্যবস্থা নেই—বলে দিচ্ছি!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কুমার একটা উদ্ধত কথাকে চাপিয়া রাখিয়া বলিল "যাক্; এসব নিয়ে আপনার সাথে তর্ক করে কি ফল বলুন! ব্রাহ্মণ্য-কৌলিন্য এসব বজায় রাখ্‌তে গিয়ে আমি যদি ঘরশুদ্ধ উপবাস করি, তবু একমুষ্টি অন্ন নিয়েওত আপনি অগ্রসর হবেন না!"

"কিন্তু যাই বল না কেন, এটা ঠিক জেনো "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ—পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।"

"তা সত্যি বটে ভটচায্ মশায়; তবে, 'রাম নাটকের' হনুমান সাজা অপেক্ষা, বাজারে বাজারে খদ্দর ফেরী করা ঢের সম্মানের কাজ মনে করি!"

নলিনাক্ষের একমাত্র পুত্র সুরপতি গাঁজা-চরশ ইত্যাদির সদ্‌গতি করিয়া যাত্রার দলে হনুমানের ভূমিকা করিত—এই অতি বড় কঠোর সত্য কুমার বলিয়া ফেলায় স্মার্ত্তশিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না; দৃষ্টি ফিরাইয়া কুমার ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল।

কুমার যখন দেখিল, তাহার মা, সূতো কাটিয়া আর কাপড় বুনিয়া সংসারটা মোটামুটি ভাবে চালাইয়া নিতে পারিবেন, তখন, কোনও প্রকার অন্ততঃ বি-এ পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলিবার জন্য, সে শরতের এক শান্ত সন্ধ্যায়, শুভলগ্নে মায়ের পদধুলি মস্তকে ধারণ করিয়া, গৌহাটী রওয়ানা হইল, আপনার দর বিগলিত অশ্রুজলে জগত্তারিণী পুত্রের যাত্রায়, পরিপূর্ণ কল্যাণাভিষেক করিয়া দিলেন!

বাসায় পৌঁছিয়া কুমার দেখিল, কাকীমা, কতকগুলি আমের আচারে তৈল দিয়া তুলিয়া রাখিতেছিলেন, আর রান্নাঘরে

একটা বছর ষোল বয়সের ছেলে রান্না করিতেছে—কাকা বাড়ী নেই।

প্রণাম করিয়া কুমার জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ কাকীমা!"

কোনও উত্তর না দিয়া ঘৃণা-সূচক মুখের ভাব করিয়া, তিনি পা সরাইয়া লইলেন! কুমার এ ব্যবহারে পূর্ব্ব হইতেই আশা করিয়া রাখিয়াছিল, কাজেই সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল না। ধীরে ধীরে রান্নাঘরে আসিয়া পাকনিরত ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কর্ত্রীঠাকুরাণীর শরীর মোটেই ভাল থাকে না বলিয়া এবং কর্ত্তাবাবু নানা কাজে পাক করা, সংসার দেখা ইত্যাদির ফুরসৎ পান না বলিয়াই, তাহাকে আনিয়াছেন—সে ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে—তার পিতামাতা বড় গরীব!

জীবনকৃষ্ণ বাসায় আসিলে, কল্যাণী তাঁহার কাণে কাণে যাহা বলিলেন, কুমার তাহা শুনিতে না পারিলেও বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই আহারে বসিয়া জীবনকৃষ্ণ যখন কুমারকে বলিলেন "শোন কুমার, আজকাল আমার আর্থিক অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে তোমাকে আর পড়াবার সামর্থ্য আমার নেই! এখন একটা চাকুরী-টাকুরী দেখ!" তখন কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই কুমার উত্তর দিল "চাকুরী চাইলেই ত আর যোগাড় হয় না কাকাবাবু!"

উষ্ণ হইয়া জীবনকৃষ্ণ বলিলেন "বেশ, যোগাড় না হয় অন্য চেষ্টা দেখ !"

কাতর কণ্ঠে কুমার বলিল "মা বল্‌লেন কাকাবাবু ! এত দিন যখন দুঃখকষ্টে কুলিয়েছেন, তখন বি-এ পরীক্ষাটা, যাতে কোনও রকমে দিয়ে দিতে পারি তার উপায় করে দিন্ !"

ব্যঙ্গের স্বরে জীবনকৃষ্ণ বলিল "তোমার মাঁয়ের মায়াকান্নার কথা আর শুনিয়োনা যাদু ! তিনি আমার যা' করেছেন, সে আমি জানি আর ভগবান্ জানেন !"

কল্যাণী পান সাজিতেছিলেন, সুযোগ পাইয়া বলিলেন "দরদ ত কম নয়। পাড়া শুদ্ধ গেয়ে বেড়ানো হচ্ছে; ছেলেদের মারধর করা হয়; খেতে দেওয়া হয় না; বাঁশী, পঁচা খেতে খেতে প্রাণ যায় !—কাজকি বাপু, যেখানে ভালোটাট্‌কা খাবার পাওয়া যায়; মায়ের আদর যত্ন পাওয়া যায় সেখানে গেলেই ত হয় !"

মায়ের নির্ম্মল চরিত্রের উপর এ প্রকার নীচ ঘৃণিত কুৎসা শুনিতে শুনিতে কুমারের চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারে ব্যথার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; কোনও রকমে দুই চারি গ্রাস খাইয়া সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ঘরের পাশে জলের ঘটিটা হাতে করিয়াই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় কুমার আকাশ পাতাল নীরবে ভাবিতেছিল, এমন সময় চকিত

হইয়া সে শুনিতে পাইল, কল্যাণী স্বামীকে বলিতেছেন "দেখ, হাজার হোক, তবু তুমি কাকা, চোখের একটা পর্দ্দাও ত আছে ; বলত, তুমি ইস্কুলে চলে গেলে, আমিই না হয় কুমারকে কথাটা স্পষ্টকরে বলি।"

জীবনকৃষ্ণ "তোমার যা অভিরুচি করো।" বলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিতেছিলেন, এমন সময় কুমার ফিরিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ডাকিল "কাকা!"

"কেন?" জীবনকৃষ্ণের স্বর কিছু বিরক্তি-ব্যঞ্জক ; ওদিকে ইস্কুলের বেলাও প্রায় উত্তীর্ণ, কাজেই কেবলই পদে পদে দেরী তাঁহার আর সইছে না!

স্বাভাবিক স্বরে কুমার বলিল "আপনি ত চলে যাচ্ছেন ইস্কুলে, কাকা! আমি ভেবে দেখলুম কল্‌কাতায়ই যাই ; সেখানে গেলে কোনও মতে বি-এটা হয়তঃ দিয়ে আস্‌তে পার্‌বো!"

"খরচ চালাবে কে সেখানে?"

কুমার উত্তর করিল না, উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবানকে ইঙ্গিত করিল।

'আজই না গেলে হয় না?"

"বেশী দেরী হলে, পার্সেণ্টেজ থাক্‌বে না কাকাবাবু!"

"বেশ তাই যেও"! বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

কাকা ইস্কুলে চলিয়া গেলে, কুমার কয়েক খানা পাঠ্য পুস্তক ও খান দুই ধুতি ইত্যাদি দিয়া একটা পুঁটলি বগলে পুরিয়া কাকীকে প্রণাম করিতে ঘরে ঢুকিল।

প্রণাম করিতে উদ্যত হওয়া মাত্রই কল্যাণী পা সরাইয়া লইলেন! দুঃখে ও ক্ষোভে অসহিষ্ণু কুমার বলিল "তোমার নিষ্ঠুর আচরণেই কাকীমা, আমাদের দুর্দ্দশার অন্ত হচ্ছে না; তাই আজ যাবার বেলা বল্‌ছি, তোমার কুটিল ব্যবহারে কাকার যদি এমন ধারা মতি পরিবর্ত্তন না হতো, তা'হলে বাবাও হয়ত আরো দুচার বছর বেশী বাঁচতেন! যাক্‌, আশীর্ব্বাদ করো, যেন সফলকাম হই!

কল্যাণী উত্তর করিলেন না, কুমারও উত্তরের প্রত্যাশা না রাখিয়াই ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইল!

(৩০)

কলিকাতায় পৌঁছিয়া কুমার হতভম্ব হইয়া গেল! জুড়ি গাড়ি ট্রাম্ বাসে লোক-লস্করে জায়গাটা যেন থৈ থৈ করিতেছে। গৌহাটী ছাড়িবার কালে সে ভাবিয়াছিল, নবাবগঞ্জেরই মতন ভগবৎ কৃপায় তাঁহার একটা আশ্রয় মিলিয়া যাইবে, কিন্তু এ দুর্ব্বার মানবসমুদ্রের মাঝে কোথায় কি আছে, তাহা খুঁজিয়া লইবার সুযোগই বা কোথায়? কেনই বা তাহার কলিকাতায় আসার এমন দুর্ম্মতি হইয়াছিল!

সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় যখন সে একান্ত দমিয়া পড়িল, তখন সহসা তাহার মনে এক খেয়াল জাগিল! চাকুরী টিউসিনী ইত্যাদির চাহিদা অপেক্ষা বর্ত্তমান বাংলায় ঠাকুর-চাকরের কাজের চাহিদা বেশী! তাই কারো বাড়ী আপাততঃ একটা বামুনঠাকুরের কাজের সন্ধান করিলে, নিশ্চয়ই মিলিবে।

কুমার যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানেই দেখিল একটা বাড়ী, সাম্‌নে মার্ব্বেল পাথরে লেখা, "ডাঃ এস্, কে, রয়; হাউস্ সার্জ্জন, মেডিক্যাল কলেজ।" সৌভাগ্যবশতঃ ডাঃ রয় তখন কলেজ হইতে ফিরিতেছিলেন, সদর দরজায়

একটা ছেলেকে উৎসুক নেত্রে ভিতরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি চাই ?"

হঠাৎ পিছনের দিকে চাহিয়া কুমার একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল "আজ্ঞে না, দেখছিলুম, এ বাড়ীতে কোনও ঠাকুরের কাজ খালি আছে কি না !"

ডাঃ রায় সবে ছুটি হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার পুরাতন ঠাকুরটিও অসুস্থ হইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তাই, একটি সুঠাম বাঙ্গালী যুবককে ঠাকুর পাওয়ার সুযোগ তিনি হারাইলেন না ! কুমার সেই বাড়ীতেই বাহাল হইয়া গেল।

চরিত্রগুণে কুমার অল্পদিনেই সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এবং যদিও সে বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা কাহাকেও জানিতে দেয় নাই, তথাপি, ঠাকুরের অপেক্ষা অনেক অধিক মর্য্যাদাই সে লাভ করিল !

গৃহিণী শরৎসুন্দরী তাহাকে পুত্রপ্রতিম স্নেহ করিতেন; মেয়ে অপর্ণা তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত।

দিনের বেলা কর্ত্তব্যকর্ম্ম শেষ করিয়া, আর রাত্রে সকলের আহারাদি হইয়া গেলে রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট কোঠায় দরজা দিয়া কুমার গোপনে পরীক্ষার পড়া করিত।

কোনও দিন ঔৎসুক্যের আতিশয্যে যদি বা অপর্ণা

জিজ্ঞাসা করিত—"ঘরে দোর দিয়ে বসে বসে কি কর কুমার-দা ?"

হাসিয়া কুমার জবাব দিত "কোনও কাজ যখন থাকেনা তখন একটু ঘুমিয়ে নি-ই দিদি-মণি !"

অবাক্ হইয়া অপর্ণা বলিত "ইস্, বিকেল ভর ঘুমোতে মোটে খারাপ লাগে না ? আমরা রোজই-ত গাড়ী করে বেড়াই, তুমিও চলনা আমাদের সঙ্গে ইডেন্‌গার্ডেন, গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, আরও কত কি দেখবে !"

দীর্ঘনিঃনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কুমার বলিত "তাকি হয় দিদি-মণি, ঠাকুর-চাকরকে কি মনিবের সাথে গাড়ী চড়তে আছে ? তা'ছাড়া তোমরা আস রাত্তির করে, ততক্ষণ রান্না না চড়ালে মা যে বক্‌বে !"

অপর্ণা দৃঢ় স্বরে উত্তর করিল "ইস্ ! বক্‌বে ? মোটেই না। আচ্ছা আমি মাকে বল্‌বো'খন !"

ছেলেটার বুকে কি একটা বিরাট দুঃখের বোঝা চাপা রহিয়াছে শরৎসুন্দরী তাহার ভাবভঙ্গীতে অনুভব করিতেন। তাই একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বয়সেই এমন মনমরা হয়ে কেন থাকিস্ কুমার ? একটু খেলা-ধুলো, একটু হাসি খুসী করিস্ না কেন ?"

কুমার কাষ্ঠ হাসিয়া নীরবে মস্তক নত করিয়া থাকিত,

কোনও জবাব তাহার যোগাইত না! শরৎসুন্দরী ব্যথার সমবেদনায় একটা কাতর নিঃশ্বাস ফেলিতেন!

ক্রমে কুমারের পরীক্ষার দিন আসিল। তখন খুবই গরম বলিয়া বি, এ, পরীক্ষা সকালে সকালে হইত! কুমার কালীঘাটে মানসিকের ওজর করিয়া কয়েকদিন ছুটি লইয়া, কোনও রকমে বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতে পরীক্ষা দিয়া ফেলিল!

পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধতিথি পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই পড়িয়াছিল!

শ্রাদ্ধের মন্ত্র শেষ করিয়া, পিতার অক্ষরস্বর্গ কামনা করিয়া, স্নান-সিক্ত বসনে গঙ্গারতীরে দাঁড়াইয়া যখন সে উপরের দিকে তাকাইল, তখন চকিত হইয়া সে শুনিল, কে যেন তাহাকে পশ্চাৎ হইতে বলিতেছে "আমায় চিন্‌তে পার দাদা বাবু?"

পরিচিত করুণ কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া সে দেখিল—শুভ্রবসনা নিরালঙ্কারা যৌবনে যোগিনী এক নারী তাহাকে সম্ভাষণ করিতেছে আর তাহার মুখের বাহ্য হাসির অন্তরালে ব্যথার কারুণ্য স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে!

মুহূর্ত্তে বিস্ময় স্তম্ভিত কুমার বলিল "একি, মণি? তুই এখানে কেমন করে! এ তোর কি বেশ দিদি!"

"এ কি বেশ দাদা বাবু! আমার হাতে শাঁখা নেই;

কপালে সিঁদূর নেই—পরণে থানের ছেড়াধুতি এই ত? এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে, দাদা বাবু! এ বেশ কি বাংলার কোথাও তোমার চোখে পড়েনি'।

কাঁদ-কাঁদ স্বরে কুমার বলিল "পড়েছে বোন! কিন্তু, তোর এ বেশের দিকে আমি যে তাকাতে পাচ্ছিনে! তোর পরিপূর্ণ শ্রী, অকাল বৈধব্যের করুণ বেশের অন্তরাল হতে যে ফুকারিয়া কাঁদ্‌ছে; একি সইতে পারা যায় দিদি!"

"সত্তর বছরের বরের সঙ্গে এক বালিকা 'কন্যার মিলন অভিসার যদি বিষদৃশ হয়, তবে তার ফলটাই আর কোন্ সইবার মতন হতে পারে বল?"

"কালো দৈত্যের মতন কৃষ্ণপক্ষের এক বাদ্‌লারাতে প্রজাপতি আমার জন্য যাকে জুটিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বেই, শঙ্খসিঁদূর আর চেলির শাড়ী পরা বৌ আমি, যেই ঘরে ফিরে গেছি, অমনি সহৃদয়া প্রতিবাসিনী দু'চার জন এসে আমার সিঁথির সিঁদূর মুছে দিলেন হাতের শাঁখা খট্‌করে ভেঙ্গে দিলেন, আর বাবার বহু পুরাতন একখানা থান কাপড় এনে বল্‌লেন "এখানা পর!"

দেখে শুনে আমি ত অবাক্, কিন্তু পরে যখন ব্যাপারটা জান্‌তে পার্‌লুম, তখন আরো কিছু হয়েছিল কিনা বল্‌তে পারিনে, তবে একথাটা ঠিক মনে জেগেছিল যে, অথর্ব্ব বুড়োর

গায়ে আবির আর ফুলের তোড়া ছুড়ে আমিই তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ হইনিত ?"

"যাক্ সে কথা,—তারপর হলো অলক্ষুণে মেয়ের গৃহত্যাগের আদেশ। এ প্রত্যাদেশকে খণ্ডন করার সাহস বাবার হলো না ; সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে—বিজন পথ ধরে' উপেক্ষিতা অনাহুতা আমি—চলিলাম !

"তোমার মুখে শুনেছিলাম পশুপতিবাবুর ; নাম তাঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলাম ! দয়াল পশুপতিবাবু, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলেন ; এখন তিনি পেন্সন্ নিয়ে এখানে আছেন ; আমিও তাঁর সঙ্গে এসেছি ! আমি ভোরে গঙ্গাস্নান করে তাঁহার জন্য গঙ্গাজল আনি ; চন্দন ঘসে—নৈবিদ্যি করে পূজার আয়োজন করে দিই—তিনি পূজায় বসেন ; আমি রাঁধ্‌তে যাই ! এইত আমার ইতিহাস ! কিন্তু তুমি এখানে কেন দাদাবাবু ? কল্‌কাতায় কবে এসেছ ? এই গঙ্গার ঘাটে এমন ভাবে ভিজা কাপড়েই বা কেন দাঁড়িয়ে রয়েছ ?"

কুমার মণিদের বাড়ী হইতে আসা অবধি এযাবৎ যাহা-যাহা হইয়াছিল, সংক্ষেপে বলিয়া গেল ! তারপর, একটু নীরব থাকিয়া—জড়িত কণ্ঠে বলিল "তোমার আর আমার অবস্থাতে বড় তফাৎ নেই মণি ! —তবে, আমি পরের বাড়ীতে ঠাকুরের কাজ কর্চ্ছি—সংগোপনে, একটা ভবিষ্যৎ সুদিনের

আশায়। আর তুমি এই বৃত্তিটাকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছ!"

কথা শেষ হইতে না হইতেই সভয়ে কুমার দেখিল একখানা বড় ওয়ালফোর্ড বাস একটি বুড়ো লোককে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল!

"একটু দাঁড়া মণি!" বলিয়া কুমার দ্রুত লোকটার কাছে দৌড়াইয়া গেল!

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে আহত লোকটি বলিল "জল!"

কুমার তাড়াতাড়ি আপনার ভিজা কাপড়খানা নিংড়াইয়া লোকটির মুখে জল ঢালিয়া দিল!

জল খাইয়া একটু শান্ত হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল "সুখলাল —কুমারবাবু—ওঃ।"

বিস্ময়ে কুমার দেখিল এ যে শিউবরণ! সে বলিয়া উঠিল "এই যে আমি—কুমার!"

"ওঃ, তুমি কুমার?"

"হ্যাঁ, আমি কুমার; তুমি এতদিন কোথায় ছিলে তেওয়ারি জি?

শিউবরণের কথা বলিবার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল; সকল কথার সামঞ্জস্য না রাখিয়া সে যাহা বলিল, তাহাতে এই বুঝায়—কুমারের জন্যে তাহার যে

একটা অহৈতুক স্নেহ জন্মিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইবার জন্য সে নানাতীর্থে ঘুরিয়াছে—বহু সাধু সন্ন্যাসীর পদসেবা করিয়া তাহাদের সিদ্ধির কল্কি সাজাইয়া দিয়াছে—কেদার-বদ্রির যাত্রীদের মোট ও এক সরাই হইতে অপর সরাইয়ে বহিয়া লইয়া গিয়াছে—কিন্তু অহরহঃ সব কাজের মাঝেই সুখলালের স্মৃতি জড়াইয়া কুমারের সেই মাধুরীমাখা মুখখানা তাহার মনে জাগিয়া উঠিত—যতই সে ভুলিতে চেষ্টা করিত—ততই তাহা ফুটিয়া উঠিত মনোমুকুরে আরো দ্বিগুণ হইয়া। অবশেষে যখন মন আর কিছুতেই মানিতেছিল না, তখন কুমারকে শুধু চোখের দেখা দেখিবার জন্য আবার তীর্থাদি পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছিল নবাবগঞ্জের দিকে! আজই সে কলিকাতায় আসিয়াছিল—উদ্দেশ্য পথে গঙ্গা স্নানটা সারিয়া নিবে।

অবিন্যস্ত কথা কয়টি বলিয়া, পরিশ্রান্ত শিউবরণ কাহাকে যেন স্নেহে জড়াইয়া ধরিতেছে এইভাবে বুকে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল "আজ আমার বড় সুখের মরণ কুমারবাবু! আঃ—"

—শিউবরণের মুক্ত আত্মা নশ্বর দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল; কুমার উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল "তোমার বুকে আমার জন্যে যে এত স্নেহ ছিল, শিউবরণ, অকৃতজ্ঞ আমি তা' বুঝিনি! আমায় ক্ষমা করো।"

সারাদিন রৌদ্র মাথায় করিয়া, ভিজা কাপড়ে ও অনাহারে অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া কুমার যখন সন্ধ্যায় শিউবরণের দাহাদি সমাধা করিয়া, বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার গায়ের উত্তাপ নরম্যাল্‌এর অনেক উপরে, চক্ষু তাহার জবা ফুলের মত লাল এবং টলিতেছে সে মাতালের মত !

রাত্রি হইয়া আসিতেছে, এখনও কুমার ফিরিতেছেনা কেন, এ চিন্তায় উদ্‌গ্রীব হইয়া শরৎসুন্দরী বাহিরের দিকে চাহিতে ছিলেন, কুমারকে এ অবস্থায় আসিতে দেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বর ১০৪° ডিগ্রীর কম নয় !

ডাঃ রায় সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, ৫।৬ দিন ভুগিয়া, কুমারের প্রাণ বায়ু অনন্তের সহিত মিলাইয়া গেল, বামুন-ঠাকুর হইলেও শরৎসুন্দরী ইহাতে পুত্রশোক অনুভব করিলেন ; অপর্ণা কাঁদিয়া আকুল হইল !

ডাঃ রায়, কুমারের কোনও আত্মীয় পরিজনের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা, জানিবার জন্য কুমারের পুঁটলা-পুঁটলী অনুসন্ধান করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ে অভিভূত